কিরণধন
চট্টোপাধ্যায়ের
কাব্যসংগ্রহ



কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ

ড. তাপসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
-সম্পাদিত

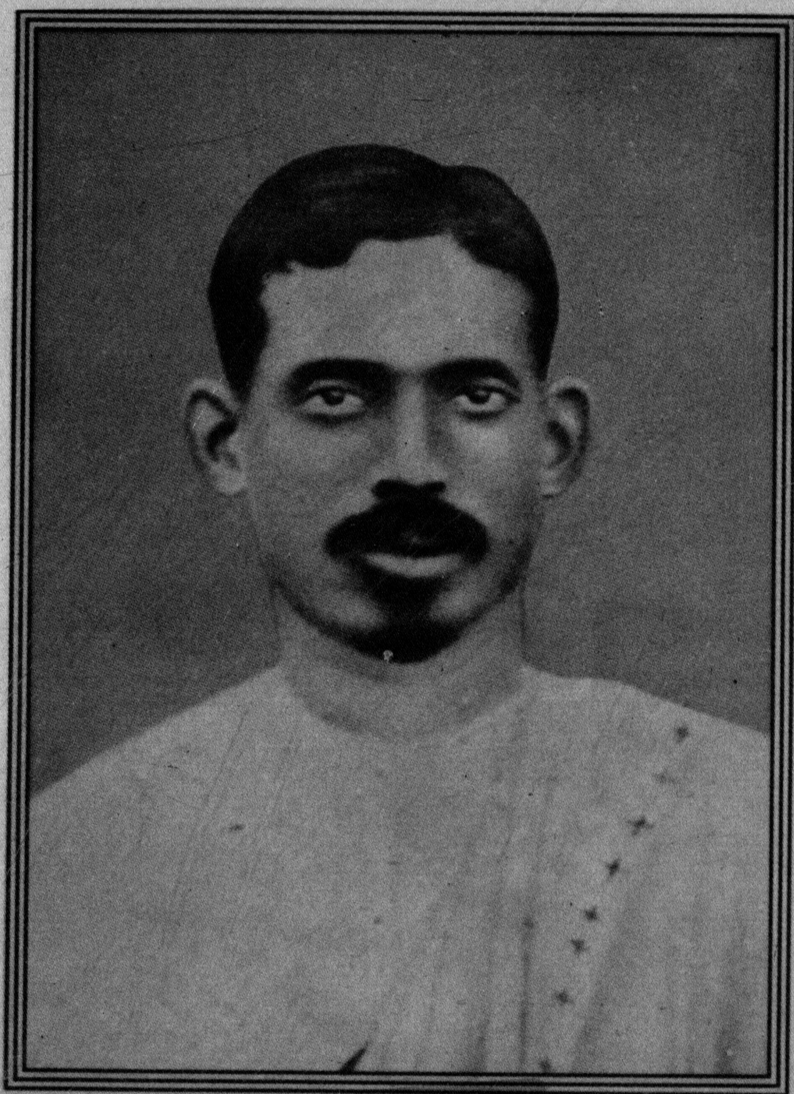
ভারবি
১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪০০

প্রচ্ছদশিল্পী :
পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য

রেখাঙ্কন :
রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষর-বিন্যাস : ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা ৭৩।
মুদ্রক : কল্যাণী প্রিন্টার্স। ১৭ কানাই ধর লেন। কলকাতা-১২।





কবি-জায়া বিভাবতী দেবী

সূচিপত্র

ভূমিকা

একদা সুপরিচিত ও সমাদৃত, অধুনা প্রায়-বিস্মৃত, উপেক্ষিত বলাও যেতে পারে, এমন একজন কবি হলেন কিরণধন চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মনে না-রাখার মতো ছোটো মাপের কবি তিনি নন। বরং তিনি একজন বড়ো-মাপের কবি। বাঙালি পাঠকের অবশ্য কিরণধনকে মনে না-রাখার একাধিক কারণ আছে। প্রথমত, আজ থেকে ৭০ বছর আগে তিনি প্রয়াত হন; দ্বিতীয়ত, তাঁর কবিতার সংখ্যা নিতান্ত অল্প—মাত্র ৯২টি এবং প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ মাত্র একটি (নতুন খাতা) —যা আজ থেকে ৭৮ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল। ওই গ্রন্থটির আরও দুটি সংস্করণ হলেও, বহুদিন তা আর বাজারে পাওয়া যায় না। তৃতীয়ত, অধিকাংশ ছাত্রপাঠ্যপুস্তকে তাঁর কবিতার অনুপস্থিতি।

কবি কিবণধন চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্র-মন্ডলের একজন কবি, যাঁর সম্বন্ধে বলা যায় "ভিনি-ভিডি-ভিসি"—তিনি এলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন। মাত্র ৪২টি কবিতা নিয়ে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'নতুন খাতা' প্রথম প্রকাশিত হল ১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে—আর সঙ্গে-সঙ্গে রবীন্দ্র-অনুসারী কবিদের মধ্যে তাঁর স্থান প্রতিষ্ঠিত হল।

উত্তরপাড়ায় তাঁর বাড়ি। জন্ম ৩ ফাল্গুন, ১২৯৩ বঙ্গাব্দে (১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৭) উত্তরপাড়ার প্রাচীনতম চট্টোপাধ্যায়-বংশে। পিতা কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়। মাতা সারদাময়ী দেবী। মাতুল বিখ্যাত 'ডন'-সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রাণ-পুরুষ আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কবির অকাল-প্রয়াণ ঘটে ১০ আশ্বিন, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে (২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১)।

কিরণধন ইংরিজি এবং দর্শন-শাস্ত্রে এম.এ এবং বি.এল পাস করে কিছুদিন শ্রীরামপুর কোর্টে আইন-ব্যবসা করেছিলেন। কিন্তু আইন-ব্যবসা তাঁর ধাতে সইলো না। পরে শ্রীরামপুর, হেতমপুর এবং হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজে অধ্যাপনা করেন। বিবাহ করেছিলেন ১৯১১ সালে। দুটি শিশু-পুত্র রেখে কবিজায়া বিভাবতী দেবী মাত্র ১৯ বছর বয়সে মারা যান। পত্নী-বিয়োগের গভীর বেদনায় কবি একেবারে ভেঙে পড়েন। 'মনের মুহ্যমানতা কালক্রমে একটু কমে এলে, মনের শোকাবিলতা জীবনের বর্ষা শেষে কেটে গেলে—অশ্রু-সরসীর স্বচ্ছতা যখন ফিরে এল—তখন তাতে কবিতার কমল-কুমুদ ফুটতে লাগল'।[১] প্রসঙ্গত, কিরণধন আগে কখনও কবিতা লেখেননি। পত্নী-বিয়োগের বেদনাই তাঁর হৃদয়-মন্থনকারী কবিতায় প্রকাশ পায়। দাম্পত্য-জীবনের স্মৃতি—তার সব মাধুর্য এবং বেদনা নিয়ে—তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর অনেকগুলি কবিতা প্রায় চোখের জলে লেখা। কবির স্মরণে কবিশেখর কালিদাস রায় লিখলেন, 'তুমিই সত্য প্রিয়ারে হারালে সখা,/চখী চলে গেল রহিল তাহার চখা।/কবিতা তোমার চখার আর্তনাদ/করুণ অথচ মধুর, তোমার প্রিয়ারে ধন্যবাদ'।[২] পত্নী-বিয়োগের শোক যেন শ্লোক হয়ে প্রকাশ পেল।

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে কিরণধনের আত্মপ্রকাশ আকস্মিক-ই বলা চলে। প্রাক্-যৌবনে তিনি কবিতা রচনা করেননি। কিন্তু তাঁর ভিতরে একটি খাঁটি কবিমন সুপ্ত ছিল যার বাঙ্ময় প্রকাশ ঘটে

একটি মর্মান্তিক আঘাতে। এ আঘাত তাঁর জীবন-সঙ্গিনীর অকাল-প্রয়াণ। এই আঘাত তাঁর অন্তরকে উদ্বেল করে তুলেছিল। মনের ভারকে লাঘব করবার জন্যে তখন থেকেই তিনি কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনে-মনে এক শোক-সরস্বতীকে লালন করে গিয়েছেন। একজনের মৃত্যু অপরজনেকে কবি করে তুললো। এরকম বড় দেখা যায় না। পত্নী-বিয়োগে কিরণধনের হৃদয় দীর্ণ হয়েছিল; তাঁর মর্মবেদন বাঁশি হয়ে বেজে উঠেছিল। তাঁর ক্ষেত্রে পত্নী-বিয়োগজনিত বেদনা কবিতার রঙিন গোলাপ হয়ে ফুটতে থাকে। হারানো প্রিয়ার উদ্দেশে লেখা তাঁর কবিতাগুলি ব্যথার স্মৃতির গোলাপি আতরে সিক্ত।

কিরণধন যে সময়ে কাব্যচর্চায় নেমেছিলেন, সে সময়কার পরিবেশ ও মানসিক আবহাওয়ার একটু পরিচয় প্রয়োজন। 'রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরবর্তীকালে, তাঁর প্রভাব-মন্ডলের মধ্যে থেকেও সত্যেন দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক-প্রভৃতি যে-কয়জন কবি কিছু স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, কিরণধন তাঁদেরই অন্যতম। সে যুগে কাব্যের তাৎপর্যই ছিল আলাদা। ছন্দের কারিকুরি, শব্দের ও কথার বিনুনি—সংক্ষেপে কবিতার যেটা লৌকিক রূপ—সেই দিকেই কবিদের প্রবণতা ছিল বেশি। বিষয়বস্তু ছিল মোটামুটি সীমাবদ্ধ—হয় প্রকৃতি, নয় প্রেম কিংবা স্বদেশপ্রীতি। ...কবি কিরণধন এই যুগেরই মানুষ ছিলেন। সুতরাং তাঁর কবিতাতেও সেই বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক-কৌশলের নিদর্শন আছে। ... তাঁর লেখায় ছন্দের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাঁর কাব্যে এমন-একটি অন্তরীণ সৌন্দর্য আছে, গৃহস্থ-সংসারের খুঁটিনাটি ও বাংলাদেশের ঘরোয়া ছবির এমন সরস-সরল ও নিরাভরণ প্রকাশ আছে যে ছন্দের শাসন সত্ত্বেও তার অনাড়ম্বর বর্ণনে পাঠকের মন আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। রবীন্দ্রনাথের এবং সত্যেন দত্তের আওতায় পুষ্ট ও লালিত হয়েও তাঁর কবিতার একটি নিজস্ব মাধুর্য ছিল। কিরণধনের ছন্দের হাত ছিল কোমল, নিপুণ। কিন্তু তাই নিয়ে বাড়াবাড়ি করে কাব্যলক্ষ্মীকে রেশমী সুতোর ফাঁসে জড়িয়ে ফেলার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।'[৩]

রবীন্দ্রনাথের ভাস্বর প্রতিভার ছায়াতলে থেকেও কিরণধন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গি নিয়ে তাঁর স্বক্ষেত্র বেছে নিয়েছিলেন। সেটি হল তাঁর একান্ত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ক্ষেত্র। সেই দাম্পত্য-প্রণয়ের ঘরোয়া চিত্র-চিত্রণে তিনি আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সেই ক্ষেত্রটি গভীর আন্তরিকতা ও অনুভূতি-দ্বারা উর্বর ও সফল হয়ে উঠেছিল। এই দাম্পত্য-প্রেমের নানা রূপ, কখনও মধুর, কখনও করুণ। তাতে আছে মিলন, বিরহ, আদর, আবদার, মান-অভিমান, সুখ-দুঃখের নানা কথা, নানা ছবি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতো ছন্দ-নৈপুণ্য ও বিষয়বৈচিত্র্য না থাকলেও তাঁর কবিতায় যথেষ্ট নৈপুণ্য ও বিষয়-নির্বাচনের নতুনত্ব লক্ষণীয়। স্ত্রী অকালে প্রয়াত হলে তিনি অন্তরের সকল আবেগ ও মাধুর্য নিয়ে কাব্যের পশরা ভরে তুলেছিলেন। ঘরোয়া রোমান্স, দাম্পত্য-জীবনের অনেক খুঁটিনাটি-চিত্র ও অন্তরাল-দৃশ্য তাঁর কাব্যে প্রাণ-সঞ্চার করেছিল। এই গূঢ়, অন্তর্নিহিত মাধুর্যই তাঁর কাব্যের উৎকর্ষ সাধন করেছে। তাই বলতে হয়, এই বৈশিষ্ট্যই তাঁর কবিতাকে করেছে সুস্পষ্ট ও উচ্চারিত, এনেছে একটি স্বতন্ত্র মাধুর্যমন্ডিত আবেদন। এতেই তাঁর কবিতা সার্থকভাবে দীপ্যমান। দাম্পত্য-প্রণয়ের কয়েকটি মুহূর্তকে তিনি চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন। এই ধরনের কয়েকটি কবিতার অংশ-বিশেষের এখানে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে :

বেল-ফুল চাই না,
জুঁই ফুল দাও।

ও গানটা গেও না
        এই গান গাও।
কেন ভালোবাসলে
        বল—বল না;
হাসলে কেন তুমি?
        —কথা কব না!
কালকের গল্প
        আজ কর শেষ
আজকের রাতটা
        লাগছে না বেশ?
                [আবদারের আধঘণ্টা]

... ...

দিয়েছে সে আড়ি করে—কথা কবে না।
ফেলে দে মালতী চাঁপা চামেলি হেনা।
        এ কি সই হলো বল?
        ফুলে নেই পরিমল,
        চোখে খালি আসে জল
                চোখে রবে না,
দিয়েছে সে আড়ি করে—কথা কবে না।

... ...

যাদু জানে সে কুহকী যাদু জানে লো!
ঘা মেরে আমারে ফিরে বুকে টানে লো!
        পাছে মোর ঘাম ঝরে,
        সারা রাত পাখা করে,
        বারণ করিলে পরে
                নাহি মানে লো!
যাদু জানে সে কুহকী যাদু মানে লো!
                [ফুলের ঘা]

... ...

সকল কথা সারা হলো—শেষ কথাটি কানে-কানে
কইব তারে মনে ছিল—রইল গাঁথা প্রাণে-প্রাণে;
চির-জীবন রইলো গোপন বুকের মাঝে প্রকাশ-ব্যথা
তারই রাঙা রক্ত-রেখা আঁকি আমার গানে-গানে।
                [ব্যথার ভুল]

... ...

কে পাঠালে উড়ো-চিঠি
        বসন্তের এই রঙিন হাওয়ায়—

ও ফুলেরা, জানিস তোরা
কোন্‌খানে সে কোন্ ঠিকানায়?
গোলাপ বলে—তার ঠিকানা
আমার ভালো আছে জানা।
বকুল বলে—না না না না
কাজ কি গোলাপ পরের কথায়?
[উড়ো চিঠি]

কিরণধনের কাব্যে একদিকে ছন্দের তরঙ্গ-দোলা, অপরদিকে মন-প্রাণ-হৃদয়ের দোলা। এই দুইয়ের অনায়াস সাবলীল-মিলন তিনি ঘটিয়েছেন তাঁর সূক্ষ্ম অনুভবের নিপুণ তুলিতে। ফলে যে-সব ছবি আমাদের চোখের সামনে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে, বেদনায়, রঙে-রসে ফুটে ওঠে সেগুলিই তাঁর কাব্যকে স্নাত-স্নিগ্ধ-অভিষিক্ত করে দিয়েছে। একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থের চূড়ায় ভর করে তিনি এমন-একটি কীর্তি অর্জন করেছেন যার মূল্য কোনোদিন অস্বীকার করা যাবে না। এ কৃতিত্ব সামান্য নয়—প্রায় বিরল, স্বতন্ত্র, আপন বৈশিষ্ট্যদ্যুতিতে প্রোজ্জ্বল।

যদিও কিরণধনের কবিকৃতির সার্থকতম ও উজ্জ্বলতম দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর দাম্পত্য-প্রেমের কবিতাগুলিতে, তবুও তাঁর কবিতার মধ্যে এমন আর-একটি দিক আছে যা মোটেই অবহেলার নয়। সে দিকটি হল তাঁর গভীর মানবপ্রেম এবং সমাজ ও রাজনীতিক চেতনাবোধ। নিছক কল্পনাবিলাসী ছিলেন না বলেই সমাজের যেখানে অবিচার, অত্যাচার, ভন্ডামি, ধাপ্পাবাজি, জুয়াচুরি দেখেছেন, সেখানেই তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন কটাক্ষ ও বিদ্রূপের মাধ্যমে। ভাষা কখনও শাণিত, কখনও মৃদু।

কিরণধনের জীবদ্দশায় ভারতবর্ষে কমিউনিজ্‌ম বা সোশ্যালিজ্‌ম বড়-একটা প্রচার হয়নি—হয়নি জনসাধারণের সমাজচেতনা। সমাজে যাদের একেবার পদস্খলন হয়েছে কোনো বিশেষ অবস্থায় বা বিশেষ কারণে, তাদের প্রতি ঘৃণা, লাঞ্ছনা আর অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে নিত সবাই—করে রাখত অস্পৃশ্য। তাদের প্রতি একটু সহানুভূতি, একটু স্নেহ-মমতা কেউ দেখাত না। কেউ কখনও ভাবতও না যে, দোষ যারা করে তারা শুধরেও নিতে পারে, ঠিকমতো পথনির্দেশ পেলে। সহসা ইচ্ছে করে কেউ বড়-একটা দোষ করে না—পরিবেশের চাপেই কেউ হয় চোর, কেউ ডাকাত, কেউ খুনে। পরিবেশের সু-কঠোর প্রভাবে অবনতির শেষ ধাপে যারা নেমে যেত, কেউ এগিয়ে আসত না তাদের তুলে আনতে—ব্যর্থ হয়ে যেত তাদের সারা-জীবনের আকাশ-কুসুম কল্পনা; মূল্যহীন হয়ে যেত তাদের আবেদন-নিবেদন; অর্থহীন হয়ে যেত তাদের হৃদয়ের আবেগ, অনুভূতি, আনন্দ।[৪] তখনকার দিনে কিরণধন চিন্তা করেছিলেন এই হতভাগ্যদের সম্বন্ধে, মাথা ঘামিয়েছিলেন এদের নিয়ে; স্নেহ দিয়ে, অন্তর দিয়ে তাদের স্থান দিয়েছিলেন তাঁর 'নতুন খাতা'-য়।

কেন একজন সাধারণ মানুষ থেকে ভিখারিতে পরিণত হল, কেন একজন দেনাদার হয়ে বাস্তুহারা হল, কেনই বা একজন যুবতী পতিতার জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হল, কিসের তাড়নায় একজন ডাকাত হয়ে উঠল, লক্ষ্যসাধনে জীবন উৎসর্গ করে এক তরুণ দীপান্তর-জীবন বা ফাঁসির মঞ্চ বরণ করল—এসবের মূল কারণ কিরণধন অতি নিপুণভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। এই শ্রেণীর ব্যক্তির অন্তর্লোকের আলোড়ন কবির অন্তরে যে তরঙ্গ-বিক্ষেপ তুলেছিল তারই অভিঘাতে সৃষ্টি

.'দেনাদার', 'ভিখিরি', 'ডাকাতের গান', 'বেশ্যা', 'দ্বীপান্তরে', 'ফাঁসির আগে' প্রভৃতি কবিতা। অন্তরের অকৃত্রিম দরদ ঢেলে কবি এইসব কবিতা রচনা করেছিলেন বলেই এগুলি হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী। কয়েকটি কবিতার অংশ তুলে ধরলে প্রসঙ্গটি সুস্পষ্ট হবে :

আজকে আমার নতুন-খাতা,—
তোদেরও ভাই নিমন্ত্রণ,
বুকে আমার আসন পাতা।
তোরা চামার? তোরা চাঁড়াল? জল খেতে নেই তোদের হাতে,
এমনি তোরা অস্পৃশ্য—
বলেন যে সব মহাপ্রভু, তাদের টোলের নইকো আমি শিষ্য।
সত্যিকারের চামার, চাঁড়াল তারাই, যারা এমন সোনার বিশ্ব
অত্যাচারে কালো করে, ভরিয়ে তোলে ক্রন্দনে
ছুঁই না সে সব শুদ্ধাচারী পৈতেধারী দুর্জনে—
তাদের বাতাস লাগাইনেকো গায়।
আয়, তোরা আয়, বুকের 'পরে আয়!
[নতুন খাতা]

... ...

বাগান-বাড়ি বিকিয়ে গেছে, টান পড়েছে বাস্তুতে,
পুঁজি-পাটা যা ছিল তা লুটে নিল পাঁচ ভূতে,
এবার জ্বালিয়ে দিয়ে নীল বাতি
গাছতলা সার করতে হবে পরতে হবে পাঁচ-হাতি,
পালিয়ে বেড়াই ধরবে কবে আদালতের যমদূতে।

বন্ধুজনে এড়িয়ে চলে, দেয় না আমল আর মোটে
দেখলে—'ভালো? কেমন! ভালো?'—শুকনো হাসি বয় ঠোঁটে,
তারা আদর-খাতির সব জানে,
মানুষ-বুঝে যত্ন-আদর-অবজ্ঞারই বাণ হানে,
ঘৃণার কাঁটা কোথাও—কোথাও আপ্যায়নের ফুল ফোটে!
[দেনদার]

... ...

ভাগ্যহীন ও লক্ষ্মীছাড়ার
শুনিবে কাহিনী? কী শুনিবে আর?
জেনে রেখো এই দুনিয়ার সার
রুপিয়া!
ও-চিজ্ তোমার থাকিলে প্রচুর,
হবে না অভাব কভু বন্ধুর,
লইবে তোমারে হাসিয়া মধুর
লুফিয়া!

নচেৎ তোমারে পায়ের তলায়,
থেঁতলাবে সবে দারুণ হেলায়,
এক ফোঁটা জল মরে যাও ঠায়
পাবে না,
আর জেনো এই মানব-প্রণয়
পুরোপুরি ঝুটো, খাঁটি অভিনয়!
কেউ তারে যার ভাগ্য নিদয়
চাবে না!

... . ..

কতবার মনে ভাবিয়াছি, চুরি
করি কারো টাকা বুকে মেরে ছুরি,
ধর্মাধর্ম নেইক কিছুরই
—ভিত্তি
নেই ঈশ্বর, নেই পরকাল,
প্রহেলিকা এই সৃষ্টির জাল,
অন্ধ জড়াণু-রচিত বিশাল—
পৃথ্বী!
[ভিখিরি]

... ...

হারে রে রে রে রে!
সোনার কেল্লা বানাবে তোমরা
রুপোর পাহাড় ঘেরে!
আঙুর বেদানা পেস্তা মেঠাই—
আতর গোলাপ তোমাদেরই চাই!
আমাদের খেতে-ছুঁতে-নিতে নাই—
ফাঁসি-কাঠে ফেল ফেঁড়ে!
হারে রে রে রে রে
করবো দুনিয়া সুরকির গুঁড়ো
নতুন বনেদ গেড়ে!
ধনী-মহাজন প্রাসাদের ইঁটে—
গরিবের হবে অসংখ্য ভিটে—
নিঃস্বও পাবে টাকাটা-সিকিটে
সিন্ধুক-ধুলো ঝেড়ে!
হারে রে রে রে রে
সংসার-মাঝে বহ্নির শিখা—
ক্রমে জ্বলে ওঠে বেড়ে।

আমাদের মিছে দাও অপবাদ—
—এ চির স্বর্ণ-লৌহ বিবাদ—
ছাপাছাপি নদী ভাঙবেই বাঁধ
যাও যত তাকে তেড়ে!

[ডাকাতের গান]

জ্বলচে স্মৃতির অনল-শিখা—খাক্ হল রে বুক জ্বলে!
আয় রে ডাকাত! আয় জালিয়াত! বুকে আমার আয় চলে!
আয় রে খুনী! জড়িয়ে তোরে বুকটা আমার ঠান্ডা হোক,
তোরা মানুষ, তোদের পরশ মুছবে আমার অনেক শোক;
তোদের ঘৃণা করিনেকো—তোদের সমান অবস্থায়
পড়লে পরে, তোদের মত খুন-ডাকাতি-জালের দায়
আমায়ও যে ঠেকতে হতো—ঠেকতে হতো আমায়-ও,
ঘোরাও ঘানি, পাকাও দড়ি, পাথর ভাঙ, হেঁইয়া হো!

ঘৃণা তোদের করবো কি বল? তোরা আমার আত্মীয়!
নির্বাসনের বন্ধু তোরা, নির্যাতনের সঙ্গীও!
ও খুনি ভাই, দাদা বলে ডাকবো তোমায় আজ থেকে,
ডাকাত বুড়ো তুমি খুড়ো,—গেছে তোমার চুল পেকে,
যুক্ত হয়ে তোদের সাথে মুক্ত হলো আমার প্রাণ,
ধন্য আজি চরণ-শিকল, ধন্য আজি আন্দামান।
যাঁর করুণায় নতুন জীবন তাঁহারই জয় গান গাহ!
ঘোরাও ঘানি, পাকাও দড়ি, পাথর ভাঙ হেঁইয়া হো!

[দ্বীপান্তরে]

... ...

রাজ-বিদ্বেষ করেছি প্রচার?—কে আবার কার রাজা?
করিনিকো খুন—দেশ-শত্রুরে দিয়েছি উচিত সাজা
রগ ঘেঁসে ঠিক গুলি মেরে তারে; আমি খুনি আমি পাপী?
কবুল করেছি ঠিক-ঠিক সব—কিছুই রাখিনি ছাপি,
আমি গড়ি বোমা গুপ্ত-সমিতি—মিটাতে পিপাসা মোর
দেশ-শত্রুর উষ্ণ শোণিতে; আমি নই হীন চোর!

... ...

আজ যে ঝুলন—আমার ঝুলন—খেতে হবে দোল দোলা!
শুভ দৃষ্টির হবে বিনিময়ে—মুখানি ঘোমটা-খোলা
দেখে নেবো আমি মরণ-বধূর—নিবিড় আলিঙ্গনে
করে দেবে নীল সর্ব শরীর—চুম্বন বরিষণে
করে দেবে মোর সংজ্ঞার লোপ—দে দোল দে দোল দোলা!
দেখবো আজিকে মরণ-বধূর মুখানি ঘোমটা-খোলা!

আমি প্রস্তুত—আয় জল্লাদ—ফাঁসি-কাঠে নিয়ে চড়া,
তুচ্ছ শরীর কৃমির ভোগ্য রক্ত-মাংসে গড়া!
[ফাঁসির আগে]

... ...

গুপ্ত ছিল হয়তো আমার সুপ্ত চেতনায়
লালসার এই বিষের চারা ফোটার অপেক্ষায়!

... ...

জমিদারের ছাওয়াল যিনি করলেন আমায় বার,
আজকে তিনি সমাজ-নেতা কাউন্সিলে-মেম্বার!
কন্যাদায়ে-বন্যাদায়ে মুক্ত তাঁহার হাত,
বলিহারি, সাবাস তাঁরে, ক্যাবাৎ! ক্যাবাৎ!
এক যাত্রায় পুরুষ-নারীর ফললো পৃথক ফল,
বেঁচে থাকো সমাজ তুমি—নাড়চো খাসা কল!
নরকের এই পিছিল পথে দৈবে যারা হায়,
পা দিয়েছে প্রলোভনের প্রবল তাড়নায়,
ভুল করেছে অসাবধানে—সুযোগ-অবসর
সমাজ কোথা দেবে তাদের, যাতে অতঃপর
আর না তারা করতে পারে তেমনতর ভুল—
তা নয় সমাজ তাদের বুকে হান্‌চে বজ্রশূল!
বন্ধ করে দিচ্চে তাদের শুধরে নেবার পথ!
বেঁচে থাকো সমাজ তুমি, তোমায় দন্ডবৎ!
[বেশ্যা]

এই ধরনের কবিতা-প্রসঙ্গে করঞ্জাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'কিরণধনের দ্বীপান্তরে কবিতাটি যে কেউ পড়বেন...চোখের জল আটকে রাখতে পারবেন না। ভাগ্য-বঞ্চিতদের অভিমুখে সকলের চোখ ফেরালেন কিরণধন।'[৪]

বিংশ শতাব্দীর জড়বাদী যন্ত্র-সভ্যতার যন্ত্রণার বিরুদ্ধে, সমসাময়িক বাঙালি-সমাজের ব্যাপক আন্তরিকতাহীনতার বিরুদ্ধে কবি অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন। এখানে দৃষ্টান্ত-হিসেবে কিছু-অংশ উদ্ধৃত করা যায় :

আদিম যুগের বর্বরতা ঘুচলো নাকো একটু আজও,
এখনও সেই হিংস্র পশুর মত,
পরস্পরের টুঁটি টিপে তেমনই করিস ছেঁড়াছিঁড়ি
নিষ্ঠুরতার চিহ্ন এঁকে শত।
বর্বরেরা রাগের মাথায় জ্বলে উঠে আগুন-সম
সটান ছুরি বসিয়ে দিত রুখে;
রাষ্ট্রনীতির-সমাজনীতির ধর্মকথা কয়ে তারা
শয়তানিটা পুষতো নাকো বুকে।

আকাশ থেকে টিপ করে ঠিক মাথার উপর ছুঁড়তে বোমা
কি করে হয় জানতো নাকো তারা,
শক্ত-ব্যাধির বীজানু সব মিশিয়ে দিয়ে নদীর জলে
জানতো নাকো কায়দা শত্রু-মারা।
[সভ্যতার প্রতি]

কবি তাঁর কাব্যে যে-সব বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তা প্রাণহীন আলোক-চিত্র নয়, রসবেত্তার তুলির টানে প্রাণবন্ত। আমাদের জীবনে এবং সংসারের আঙিনায় আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ কত যে কবিতার উপাদান ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে তা সবসময় আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। কিন্তু কিরণধন ছিলেন নিপুণ শিল্পী, তাঁর পর্যবেক্ষণ-শক্তি ছিল প্রখর; তাই কোনো তুচ্ছ বস্তুও তাঁর দৃষ্টির আড়ালে যায়নি। কাব্যরসে সিক্ত করে সেগুলিকে তিনি তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে তাঁর স্পর্শকাতর ও দরদী মনের আলোকসম্পাতে। 'একটি ধানের শীষের উপর একটি শিশিরবিন্দু' দেখবার মতো চোখ তাঁর অবশ্যই ছিল।

কিরণধনের কবিতা তত্ত্ব বা তথ্যভারে ভারাক্রান্ত নয়। দার্শনিকতার কোনো বালাই তাঁর কবিতায় নেই; পক্ষান্তরে, তাঁর কবিতা সহজ-সরল-হালকা চালের। অধিকাংশ কবিতাতেই স্বরাঘাত-প্রধান বা ছড়ার ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। লঘু ভাব ও হালকা সুরের কবিতার বাহন হিসেবে এই ছন্দই উপযুক্ত। কবির কবিতাগুলি নদীর স্রোতের মতো তর্‌তর্ করে বয়ে যায়—কোনো বাধা নেই, নেই কোনো আবিলতা—'নদী আপন বেগে পাগলপারা'। তাঁর কবিতার আবেদন মস্তিষ্কে নয়, অন্তরে। তাই তাঁর কবিতা বুদ্ধিদীপ্ত না হয়ে হৃদয়াবেগে স্পন্দিত। কয়েকটি কবিতায় আবেগের প্রাবল্য থাকলেও অধিকাংশ কবিতায় সে আবেগ শান্ত ও সংযত। কোনা গীতি-কবি-ই আবেগকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে পারেন না। কিরণধনও পারেননি সত্যিকার গীতি-কবি বলে।

কবির সব কবিতাই যে সার্থক হয়ে উঠেছে তা অবশ্য বলা চলে না। কোনো কবিরই সব রচনা সমানভাবে সার্থক হয় না। কিরণধনও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁর কয়েকটি কবিতা অসার্থক নিঃসন্দেহে। সেগুলিকে ঠিক কবিতা আখ্যা দেওয়া যায় না—বরং পদ্য বলা যেতে পারে। দৃষ্টান্ত: 'উকিলের কবুলতি', 'সমালোচকের প্রতি', 'বিরহিণী', 'বুড়ো', 'অক্ষম' ও 'ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর'। তবে তাঁর অধিকাংশ কবিতাই সার্থক ও রসোত্তীর্ণ।

কিরণধনের কবিতায় কথ্য-শব্দ বা বাংলা বুলির প্রচুর সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। এর জন্যেই তাঁর কবিতা এত প্রাণবন্ত। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কথা মনে রেখেও বলা যেতে পারে যে, তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে কথ্যভাষার যে অফুরন্ত সমাহার তেমনটি আর অন্য-কোনো সম-সাময়িক কবির কাব্যে পরিলক্ষিত হয় না।

ছোটোদের জন্যেও কিরণধন কলম চালিয়েছিলেন। যে স্বল্পসংখ্যক ছোটোদের কবিতা তিনি লিখেছিলেন সেগুলিকে এক-কথায় অনবদ্য বললে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। 'মায়ের বিপদ', 'কমলানেবুর দেশে', 'ভাই-বোনে', 'নাম-কাটা সেপাই', 'মর্নিং ইস্কুল', 'বনের পাখি', 'উড়ো জাহাজ', 'চক্-চকে এক রংমশাল', 'খোকার ব্যথা', 'পন্ডিত-মূর্খ' -প্রভৃতি কবিতার জুড়ি বাংলা শিশুসাহিত্যে মেলা ভার।

কবির কাছে শিশু ও কিশোরদের অন্তর্লোক উন্মুক্ত ছিল। সেখানে চলতো তাঁর অবাধ সঞ্চরণ। ছোটোদের মনের সঙ্গে তিনি নিজের মন মেলাতে পেরেছিলেন বলে তাঁর কাছে ধরা পড়েছিল

তাদের কল্পনা, ছেলেমানুষী, আনন্দ, বেদনা, দুষ্টুমি, ফন্দি-ফিকির-ইত্যাদি। এইগুলিকেই উপাদান করে তিনি ছোটোদের কবিতা লিখেছিলেন—যেগুলি সকল যুগের ছোটোদের মনোরঞ্জন করবে বলে মনে হয়।

কাব্যের প্রবাহ একই গতি-পথে আবহমান কাল সমভাবে প্রবাহিত হয় না। কিছুকাল অন্তর তার দিক-বদল হয়। ফলে কবিতার রূপান্তর ঘটে। বদলে যায় তার চাল, চলন ও অভ্যন্তরীণ রূপ। কিন্তু তাই বলে বিগতদিনের কবিতা মূল্যহীন হয়ে যায় না। অতীতের উপর ভর করেই তো বর্তমানের আধিপত্য। যে সকল কবিতা পুরনো দিনের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছিল সেগুলিকে সেই প্রেক্ষাপটে রেখে সেগুলির মূল্যায়ন ও বিচার-ই বিধেয়। নচেৎ বিচারের পরিবর্তে অবিচার-ই হয়ে যাবে। কিরণধনের কবিতার মূল্যায়নে সেটি মনে রাখা কর্তব্য।

কিরণধনের সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালের কবি-সাহিত্যিক ও সমালোচকদের মূল্যায়ন এ-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য :

'১৩২৬ সালেব কার্তিক সংখ্যায় 'ভারতী'-তে প্রকাশিত 'নিদ্রাহীনের স্বপ্ন' তাঁর প্রথম কবিতা হলেও তাতে নবাগতের ভীরু পদচারণা নেই, পরিণত কবিমনের এক বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটেছে।'[৫]

কবি যাপন করে গিয়েছেন নিভৃত জীবন—তাই তাঁর জীবন বাহ্যত ঘটনাবহুল নয়। কিন্তু সাহিত্যজগতে তিনি পেয়েছেন সমাদর। বাংলা ত্রয়োদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে 'ভারতী' ছিল একটি প্রগতিশীল মাসিক পত্র। ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটে (এখন কৈলাস বসু স্ট্রিট)-এর দোতলায় ছিল প্রেস আর অফিস; আর তেতলার একটি হলঘরে ছিল 'ভারতী'-র আড্ডা। 'ভারতী'-র সম্পাদক ছিলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। কিরণধন ছিলেন মণিলালের মাসতুতো ভাই। তাই ভারতী-গোষ্ঠীর সঙ্গে সহজেই তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল।

'সকাল-সন্ধ্যা দু-বেলাই 'ভারতী'-র আড্ডা বসতো। তবে রবিবারের সকালবেলার বৈঠকটি ছিল বেশ জমজমাট। সকাল সাতটা থেকে প্রায় দুপুর পর্যন্ত চলতো। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, নরেন্দ্র দেব, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজাকুমার বসু, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, সুধীরচন্দ্র সরকার, শিল্পী চারুচন্দ্র রায় ও আরও অনেকে আসতেন এই রবিবারের বৈঠকে। উত্তরপাড়া থেকে আসতেন কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, বৈদ্যবাটি থেকে আসতেন সাহিত্যানুরাগী হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়। মাঝে-মাঝে আসতেন সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচি, কবি নজরুল ইসলাম, রঙ্গ-রসিক চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি-প্রভৃতি।

'ভারতী'-র আড্ডায় কোনো-কোনো কবি তাঁর নতুন কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। একদিন কিরণধন চট্টোপাধ্যায় তাঁর সদ্যোরচিত 'দ্বীপান্তরে'-কবিতাটি পড়ে মুগ্ধ করে দিলেন সকলকে। এখনও চোখের সম্মুখে জাগে তাঁর নাটকীয় ভঙ্গিতে আবৃত্তির চিত্রটি—যখন তিনি পড়েছিলেন, 'ঘোরাও ঘানি, পাকাও দড়ি, পাথর ভাঙো, হেঁইয়া হো'। কিরণধনের কাছ থেকে কবিতাটি চেয়ে নিয়ে আমি (নলিনীকান্ত সরকার) 'বিজলী'তে বার করেছিলাম।'[৬]

"এই 'ভারতী'র আড্ডায় যে-সব সাহিত্যিক, কবি যেতেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের আওতার ভিতর থেকেই স্ব-স্ব বিভাগে অল্পবিস্তর নতুনত্ব সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করেছেন প্রাণপণে। বিচ্ছিন্নভাবে থাকলে তাঁদের ব্যক্তিগত ভঙ্গি হয়তো বিশেষভাবে সফল হতে পারত না, কিন্তু সংহতিব গুণে তাঁরা রবিমন্ডলের ভিতর থেকেও তখনকার বাংলা সাহিত্যের ধারাকে আধুনিক যুগের দিকে যে অনেকটা এগিয়ে আনতে পেরেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ নেই।"[৭]

'ভারতী'র এই আড্ডার ছবি ভারি সুন্দর করে এঁকেছেন একটি কবিতায় কবি নিজেই। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরলোকগমনে 'স্মরণে' কবিতায় তিনি লেখেন :

'আবার যদি যাই কোনোদিন কর্মশ্রান্ত সন্ধ্যেবেলা
'ভারতী'র সেই উপরতলার ঘরে,
হয়তো তোমায় দেখতে পাব, যেমনটি ঠিক ছিলে তেমন
হাসচো হাসি, কইচ মৃদু স্বরে!
বকচে 'বুড়ো' এটা-সেটা, হেমেন্দ্র সে পুরুফ নিয়ে
মণিলালের উড়চে ধোঁয়া মুখে,
সৌরীন্দ্র খাচ্ছে হাওয়া, তক্তপোষের উপর আমি
শুনছি কথা উপুড় হয়ে ঝুঁকে।[৮]

'কিরণধনের কবিতায় নতুনত্বের প্রধান অবলম্বন ঘরোয়া-অভিজ্ঞতার আটপৌরে চিত্রণে, বর্ণনায়, স্বাদে, স্মৃতিতে সুপরিস্ফুট, বিশেষত মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের দাম্পত্য সুখ-দুঃখের মধুকণ্ঠ কবি হিসেবেই তিনি বিশ-শতকের প্রথমার্ধের যুগসন্ধিতে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ... তিনি প্রধানত দাম্পত্য-প্রণয়ের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কবি। কতকগুলি কবিতায় প্রণয়িনীর স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে...কখনও-বা পতিপত্নীর সংলাপে...গার্হস্থ্য রস...শৃঙ্গার-মূর্তিতে ফুটেছে।...স্ত্রীর-বিয়োগের পরেই তাঁর এ কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল বলে এই শ্রেণীর অনেক কবিতাতেই মিলনের সুখস্মৃতি একটি স্থায়ী বিচ্ছেদ-বেদনায় যেন কারুণ্য-সচেতন হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রথমদিকের রচনায় যে ভোগ-চাঞ্চল্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, শেষ দিকের কয়েকটি কবিতায় সেই উদ্বেলতার পরিবর্তে দেখা দিয়েছে গভীর নশ্বরতা-বোধ। ...

'সেই সঙ্গে বিশ-শতকের জড়বাদী যন্ত্র-সভ্যতার আর্থিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় বিক্ষোভের যন্ত্রণা থেকে তিনি মুক্তি চেয়েছেন। ... সমসাময়িক বাঙালি-সমাজে ব্যাপক আন্তরিকতাহীনতার যে মনোভাব তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, সে বিষয়ে তাঁর কটাক্ষ উচ্চারিত হয়েছে একাধিক কবিতায়।'[৯]

কিরণধনের 'রচনার মধ্যে এমন-একটি অকপট অনুভূতি ও সহজ-সরল প্রকাশভঙ্গি আছে, যাহা তাঁহার কবিহৃদয় হইতে স্বতঃস্ফূর্ত বলিয়া স্বতন্ত্র।...এই কবিহৃদয়ের সততাই কিরণধনের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। . .কবি যেন কবিতা লিখিবার জন্য লিখিতে বসেন নাই, সে বিষয়ে কোনো ভান বা অভিমান নাই। শ্রোতা থাকুক বা না-থাকুক, লোকে যেমন আপন মনে গুনগুন করিয়া গান গায়, এ যেন ঠিক তেমনই। তাই তাঁহার ভাব যেমন স্পষ্ট ও স্বাভাবিক, ভাষাও তেমনি স্বচ্ছ ও অনাড়ম্বর। এরূপ অসংকোচ-সারল্য, আত্মকথা বলিতে গিয়া এরূপ আত্মবিস্মৃতি—এরূপ নিরহঙ্কার প্রকাশ' তাঁর 'রচনার মধ্যে সুস্থ ও সহজ মানুষটিকে বিকশিত করিয়াছে।...এই পরিদৃশ্যমান ধরণীর আকাশে-বাতাসে যে অতি-সহজ প্রীতির প্রেরণা রহিয়াছে, সমাজ-সংসার বা প্রকৃতির যে অতি-পরিচিত পরিবেশের প্রভাব আছে, তাহাতেই তাঁহার কবিহৃদয় বিকশিত হইয়াছিল। এই নিত্যপ্রাপ্ত জীবনের ছোটো-ছোটো ভালো-মন্দ-সুখ-দুঃখ, এই নিত্যদৃষ্ট বহির্জগৎ, ইহাকেই কবি পরম সন্তোষের সহিত অনুভব করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার কাব্যে আমরা ভাবনা অপেক্ষা ভাব, কল্পনা অপেক্ষা প্রীতি-বিভোরতা, যাহা নাই তাহার উদ্ভাবনা অপেক্ষা যাহা আছে তাহা হইতেই আনন্দ লাভ করিবার প্রসন্নতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি।...তিনি ছিলেন বাঙালির গৃহস্থ-জীবনের, বিশেষ করিয়া বাঙালির দাম্পত্য-জীবনের, অনাবিল মাধুর্যের উৎকৃষ্ট কবি। বাঙালির অকৃত্রিম

প্রাত্যহিক কর্ম ও চিন্তার সহিত তাঁহার মনের সাড়া ও রচনার ধারার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছিল।'[১০]

কিরণধনের কবিতা সম্পর্কে কবিশেখর কালিদাস রায় লিখেছেন, 'কিরণ কবিতা খুব কম লিখত, কিন্তু যা লিখত তাই অপূর্ব! আমি perfect diction-এর খুব পক্ষপাতী। তার রচনার চাতুর্য আমাকে মুগ্ধ করত, মুখস্থ করে রাখতে ইচ্ছা হত তার কবিতা। তাছাড়া, আসল কবিতার যে গুণ, মনের আবেগের গভীরতা ও আন্তরিকতা, তার কবিতায় তার অভাব ছিল না। নিখুঁত রচনা-পারিপাট্যের সঙ্গে সংযত হৃদয়াবেগের আন্তরিকতা—এর বেশি আর কি চাই আসল কবিতায়?...হৃদয়াবেগের সর্বাঙ্গসুন্দর অভিব্যক্তিকেই কিরণ শ্রেষ্ঠ কবিতা মনে করত। কিরণ মান-যশের ধার ধারত না—লিখলে তার হৃদয়ের ভার লঘু হতো তাই লিখতো। এই কিরণ কত বড়ো কবি তা একালের পাঠকরা জানেন না। এত বড়ো কবি ও শিল্পী কখনও চিরদিন অখ্যাত-অবজ্ঞাত হয়ে থাকতে পারে না। ...সত্যিকার ভালো কবিতার খোঁজ হবেই। তখন কিরণের কবিতার ডাক পড়বে।...'[১১]

'কালিদাস-কুমুদরঞ্জন-করুণানিধান-যতীন্দ্রমোহন যে-রকম পল্লীকবি, তিনি তা নন। তাঁর কাব্যপ্রেরণা উপরোক্ত কবি-চতুষ্টয়ের মতো প্রাচীন কাব্য-সংস্কার ও পল্লীগ্রামকে ভিত্তি করেনি। তিনি মুখ্যত নাগরিক কবি। তৃতীয় দশকের কর্মমুখর কল্লোলিত কলকাতার কবি। বরং তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের। কয়েকটি কবিতায় শব্দ-চিত্রণে ও লঘু-দ্রুত-লয়ের ছন্দ-প্রয়োগে কিরণধন নিশ্চিতভাবে সত্যেন্দ্রনাথের নিকট ঋণী।'[১২]

কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'রসচক্রে' কিরণধন মাঝে-মাঝে আসতেন। 'নীরব ধীর-প্রকৃতির লোকটি "রসচক্রের" হট্টগোলে হতবুদ্ধি হয়ে বসে-বসে পান খেতেন। আর ঘড়ির পানে ঘন-ঘন তাকাতেন—উত্তরপাড়ায় যাওয়ার ট্রেন-বিশেষ হট্টগোলে ফসকে না যায়। সংসারের সকল তরঙ্গের উপরই প্রসাদী করবী ফুলটির মতো তিনি ভেসেই বেড়িয়েছেন...।'[১৩]

'কিরণধন তাঁর কবিতায় বিরহ-মিলনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে উপলক্ষ করে দাম্পত্য-প্রণয়ের যে রসোজ্জ্বল রূপটি চিত্রিত করেছেন তাতে স্বামী-স্ত্রী-র দাম্পত্য জীবনের নানা খুঁটিনাটি বিষয়, যেমন উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি তা দুটি সখীর নিভৃত রসালাপ এবং কিশোর-কিশোরীর হৃদয়রাগে বিলসিত হয়েছে।...

'দাম্পত্য প্রণয়ের মধুর রসাবেশের সঙ্গে অপত্য-স্নেহের এক অপূর্ব বর্ণ-বৈভব তাঁর প্রেমের কবিতাকে যে কি বিচিত্র অভিব্যক্তি দিয়েছে, তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'আবদারের বেড়ি' কবিতাটিতেও। এই কবিতায় আমরা দেখি যে, স্বামী প্রবাসে তাঁর কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য সাজসজ্জা করে প্রস্তুত হয়েছেন। স্ত্রী নানা ছলছুতো করে তাঁকে আটকাতে চাইছে, পুরনো স্মৃতিকথার অবতারণা করে মান-অভিমান করছে।...

'বিরহ মিলনের যে অপরূপ আলেখ্য কবি তাঁর প্রেমের কবিতাগুলিতে এঁকেছেন তা যৌবনের মদির আবেশমাখা হলেও, কোনো-কোনো কবিতায় হৃদয়ের গভীর ব্যথাও স্পন্দিত হয়েছে। যেমন তাঁর 'উড়ো-চিঠি' কবিতাটি। ...প্রেমের সংরাগ কিরণধনকে কবি করেছে এবং প্রেমের উদ্দীপনেই তাঁর কবিতার বিশিষ্ট রূপটি অভিব্যক্ত হয়েছে সত্য, কিন্তু তাঁর কবিতায় বিষয়-বৈচিত্র্যও বড়ো কম নয়। সমাজসচেতন এক সংবেদনশীল কবি-মন তাঁকে সমাজের নানা অসঙ্গতি, দুর্নীতি, ভন্ডামি নিয়েও কাব্য-রচনায় ব্রতী করেছে। 'ডাকাতের গান', 'ভিখিরি', 'বেশ্যা'-

প্রভৃতি কবিতায় তাঁর এই প্রতিবাদী ভূমিকার প্রকাশ ঘটেছে। আবার স্বদেশ-প্রেমের পরিচয়ও প্রকাশিত হয়েছে 'দ্বীপান্তরে' কবিতায়। ... মানুষের প্রতি অকপট ভালোবাসা এবং অত্যাচারীর প্রতি নিদারুণ ঘৃণা ...তাঁর 'নতুন খাতা' কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে। ... ডাকাত, মাতাল, বেশ্যা-প্রভৃতির প্রতি মানুষের ঘৃণা থাকাই স্বাভাবিক—কিন্তু কেন-যে তারা সুস্থ স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তা নিয়ে ভাবে কজন! কিরণধনের কবিতায় সেই মৌলিক প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছে এবং প্রচলিত সমাজব্যবস্থা এবং সামাজিক অনুশাসনের মধ্যে যে সেই পাপের বীজ আছে, সেই সত্যটি সহজ-সরল-পুষ্ট ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'ডাকাতের গান' এবং 'বেশ্যা' কবিতা দুটিতে তাঁর কবিমানসের এই বিশেষ দিকটি ধরা পড়ে। ... কিরণধনের মধ্যে একটি দরদী, আবেগপ্রবণ, প্রীতিস্নিগ্ধ রসিক মন সর্বদাই জাগ্রত ছিল বলে রোমাণ্টিক শৃঙ্গাররসেরই হোক আর গার্হস্থ্য-জীবনরসেরই হোক কিংবা সমাজসচেতন প্রতিবাদী বিদ্রূপাত্মকই হোক—তাঁর প্রতিটি কবিতার মধ্যেই বিচ্ছুরিত হয়েছে জীবনের প্রতি প্রবল ও প্রগাঢ় অনুরাগ। তাই দেশের প্রতি অনুরাগের অপরাধে দ্বীপান্তর-দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত যে, তারও মর্মানুভূতির মধ্যে উচ্চতর আদর্শের জয়গানের পরিবর্তে তিনি লক্ষ্য করেছেন স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসা-প্রভৃতি সহজ-সাধারণ মানবিক বৃত্তিগুলির সংবেদনশীল অভিব্যক্তি।

'ছোটোদের জন্যও কবি অনেকগুলি কবিতা লিখে গেছেন।...সব দেশে সবকালে সচরাচর মায়েরাই শিশুকে শান্ত রাখার জন্য ভূত-প্রেত-দত্যি-দানো কিংবা ছেলেধরা বা জটেবুড়ির ভয় দেখায়। কিরণধনের একটি অবিস্মরণীয় ছোটোদের কবিতা 'মায়ের বিপদ'-এ আমরা দেখি যে, মা যদি ছেলেকে সারা দুপুর ঘুম পাড়াতে চায়, কিংবা রোদ্দুরে ঘুরতে মানা করে, অথবা বারে-বারে দুধ-খাওয়াতে চায় তাহলে মায়ের বড়ো বিপদ—'ছেলেধরার মেশো-বুড়ো' কিংবা 'জটেবুড়ির পিসী' এসে মাকে ধরে নিয়ে যাবে বলে মাকে ভয় দেখায়।'[১৪]

'কিরণধন একান্তভাবেই গার্হস্থ্য-জীবনের কবি। প্রাত্যহিক জীবনের সহজলব্ধ রসকে অস্বীকার করিয়া তিনি নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক সৌন্দর্যের সন্ধানে স্বপ্নলোকে বিভোর হইয়া থাকেন নাই;...যে দাম্পত্য-জীবনের অটুট বন্ধন অনেকের পক্ষেই দুঃসহ কারাগার মাত্র, কিরণধন তাহাকেই মধুর বৃন্দাবনে রূপান্তরিত করিয়াছেন। ...বৃন্দাবনের মধুর রসাস্বাদনে বিভোর হইয়াছেন।

... ...

'অতি সহজ ভাষায় বাঙালি-অন্তঃপুরের যে নিখুঁত চিত্রটি কবি অঙ্কন করিয়াছেন, মধুর সরসতার দিক দিয়া তাহার তুলনা বিরল। ছবি হিসাবে তাঁহার অনেকগুলি কবিতাই যেমন সার্থক, সুর-ব্যঞ্জনার দিক দিয়া তেমনি অতুলনীয়। তাঁহার 'আবদারের আধঘন্টা' কবিতাটি অনুরাগে গদগদ অস্ফুট আবদারের যে মঞ্জু-গুঞ্জনটুকু নিঃসঙ্গ নিরালাতেও কানে গুঞ্জরিত হইতে থাকে তাহারই ধ্বন্যাত্মক বাণীরূপ প্রকাশ করে। সরল নারীহৃদয়ের অনুরাগ-রঞ্জিত এই চির-অতৃপ্ত আবদারের ভাষা কিরণধন যেভাবে দিয়াছেন আধুনিককালে অন্য-কোনো কবিই তাহা পারেন নাই।'[১৫]

কিরণধনের 'রচনা-ভঙ্গির মাধুর্য্য, চাতুর্য্য, লালিত্য, সৌকুমার্য্য—ও অনায়াস-স্বাভাবিকতাই তাঁর কাব্যকে আমাদের অন্তরের ধন করে তুলেছে।' প্রাণের উত্তেজনা তিনি উদ্দীপক ভাষায় ব্যক্ত করতে পারতেন। তাঁর 'ছন্দের গতি-প্রবাহ' আপনার বেগে ও অনায়াসে চলত এবং 'ছন্দোধারার' অনায়াস এবং 'অবন্ধিত গতিই' তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য।[১৬]

বাংলা কবিতার একাধিক সংকলন গ্রন্থে কিরণধনের কবিতা নির্বাচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বাংলা কাব্য-পরিচয় তাদের অন্যতম। এই প্রসঙ্গে সমালোচক ও প্রাবন্ধিক কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় লেখেন, 'অনেকদিন আগেকার কথা মনে পড়ে। শান্তিনিকেতনে থাকার সময় দেখেছিলুম, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের মনে কিরণধনের জন্য একটি স্নেহের আসন ছিল। ...হঠাৎ একদিন তিনি আমাকে বললেন, কিরণধনের একটা কবিতা তো নিতে হবে। ...আমি 'পিতা-স্বর্গ'-এর নাম উল্লেখ করলুম। তিনি উত্তর দিলেন, না, কিরণধনের ভালোবাসার কবিতাগুলোই ওর সেরা রচনা। ওর বইখানা কাল সংগ্রহ করে নিয়ে এস। একটা বেছে নেব। ...আর বাঙালি কবিরা যা-কিছু কবিতার মতো কবিতা লিখেছে তা সবই ভালোবাসার বিষয়ে। ...পরের দিন তিনি 'উড়ো-চিঠি' কবিতাটি নির্বাচন করে দিলেন।'[১৭]

কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার তাঁর সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে কিরণধনের কয়েকটি কবিতা পুনর্মুদ্রিত করেন। কার্তিক, ১৩৫৫ সংখ্যায় বঙ্গদর্শনে কিরণধনের প্রতিকৃতিও প্রকাশিত হয়। চিত্র-পরিচয় প্রসঙ্গে মোহিতলাল কবির 'নতুন খাতা'-র উল্লেখ করে লেখেন, 'এই কাব্যের শব্দ-মুকুরে এক অতিশয় ভাব-বিহ্বল, বেদনা-কাতর, উদার ও মহৎ হৃদয়ের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে—কবিতার মধ্য দিয়া কবি-মানুষটির এমন পরিচয়-লাভ ক্বচিৎ ঘটিয়া থাকে। নতুন খাতার কয়েকটি কবিতায় পত্নী-বিয়োগবিধুর কবির স্মৃতি-শোক—বৃষ্টি সজল আকাশে ইন্দ্রধনুচ্ছটার মতো—যে একটি অপূর্ব সুন্দর করুণ-রসের সঞ্চার করিয়াছে, তাহা বাংলা কাব্যে অন্যত্র দুর্লভ।'

কিরণধনের আয়ুষ্কাল ১৮৮৭ থেকে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ। এর-মধ্যে ১৯২০ থেকে ১৯৩১-এর মধ্যে তিনি ৯২টি কবিতা লেখেন। তারমধ্যে ৪২টি কবিতা নিয়ে 'নতুন খাতা'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে—এতে প্রথম সংস্করণের সাতটি কবিতা বাদ দেওয়া হয় এবং তিনটি কবিতা যোগ করা হয়। ১৯৫২ সালে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে দ্বিতীয় সংস্করণের একটি কবিতা বাদ দেওয়া হয় এবং নতুন দশটি কবিতা সংযোজিত হয়। বর্তমান বইটি কবির কাব্য-সংগ্রহ—ফলে পূর্বের সংস্করণগুলির সবকটি কবিতা এবং আরও অগ্রন্থিত অনেক কবিতা যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, সবগুলিই একত্রে প্রকাশিত হল। প্রথমে দেওয়া হল প্রথম সংস্করণের কবিতাগুলি, তারপরে দ্বিতীয় সংস্করণের সংযোজিত কবিতাগুলি, তারপরে তৃতীয় সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত নতুন কবিতাগুলি এবং শেষকালে অগ্রন্থিত কবিতাগুলি।

১৯৪০ সালের ১১ এপ্রিল কবির চিত্র-উন্মোচন উপলক্ষে কবি-বন্ধু করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় একটি কবিতায় কবির উদ্দেশ্যে লেখেন :

'ভালোবেসেছিলে, ভালোবেসেছিনু
তুমি সহৃদয় কবি,
তোমার স্মৃতির পূজা-উৎসবে
প্রকাশিত তব ছবি।
'নতুন খাতা'য় নাম করে গেছ,
হইয়াছ বরণীয়,
সঞ্চিত মম প্রেমের অর্ঘ্য
ফুলহার তব প্রিয়!'

কবিশেখর কালিদাস রায় লিখেছেন, 'কিরণধনের নামটি বাংলার কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থেকে যাবে।'[১৮] কবি নরেন্দ্র দেব একটি কবিতায় কিরণধন সম্পর্কে লিখেছিলেন যে,

তাঁহার কিরণে কাব্যের অমৃতলোক আলোকিত হয়েছিল, সংসারের শান্ত আঙিনায়, গৃহের কোণে তাঁহার কাব্যের সৌরভ ফুটে উঠেছিল।[১৯] সজনীকান্ত দাসের মতে : কিরণধনের 'কাব্য চির-অমর, তাঁহার কাব্যের পিছনে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।'[২০]

অমর কবি কিরণধনের কবিতাগুলির একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রকাশ করতে পেরে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি। এই সংকলন সম্ভব হত না আমার অগ্রজপ্রতিম কবি-পুত্র শ্রী বিজন কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতা না-পেলে। প্রখ্যাত প্রকাশক 'ভারবি'র শ্রী গোপীমোহন সিংহ রায় এবং তাঁর পুত্র শ্রীমান গোরা এই সংকলন-গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আর প্রণাম জানাই প্রখ্যাত পন্ডিত ড. রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত এবং সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রী অলকচন্দ্র গুপ্তকে, যাঁরা আমাকে এই কাজে বিশেষ উৎসাহ দিয়েছেন।

পাঠক-পাঠিকারা বইটি পড়ে আনন্দ পেলে নিজেকে ধন্য মনে করব। পরিশেষে আর-একটি কথা বলে উপসংহাব টানি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

'সহজ করে লিখতে আমায় কহ যে
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।'

কিরণধন সহজ কথা সহজ করেই লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ-কৃতিত্ব বড়ো কম নয়।

১।১ দেওদার স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০১৯

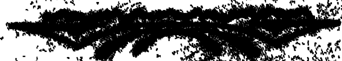
তাপসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১. কিরণধনের স্মৃতি। কালিদাস রায়। উপাসনা : কার্তিক, ১৩৩৮, পৃ. ৪৩৫।
২. কথা-সাহিত্য : ভাদ্র, ১৩৫৭।
৩. নতুন খাতা। বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। একক : কার্তিক-পৌষ, ১৩৯৩।
৪. মাসিক বসুমতী। করঞ্জাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জরাসন্ধের 'লৌহকপাট' সমালোচনা প্রসঙ্গে। পৌষ, ১৩৬৪।
৫. কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়। রবি রায়। একক : কার্তিক-পৌষ, ১৩৯৩।
৬. ভারতীর আড্ডা। নলিনীকান্ত সরকার। দেশ : সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮১।
৭. মণিলালের আসর। হেমেন্দ্রকুমার রায়। মানসী ও মর্মবাণী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬।
৮. ১৩২৯ শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতী'-তে প্রকাশিত। এই কবিতায় বুড়ো—প্রেমাঙ্কুর আতর্থী; সৌরীন্দ্র—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়; হেমেন্দ্র—হেমেন্দ্রকুমার রায়; মণিলাল—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়; আমি—কবি নিজে।
৯. কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়। ড. হরপ্রসাদ মিত্র (নতুন খাতা ও অন্যান্য কবিতার সম্পাদকের ভূমিকা)
১০. কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়। ড. সুশীল কুমার দে। কথাসাহিত্য : আষাঢ়, ১৩৬০, পৃ. ৫৪৯-৫০।
১১. স্মৃতিকথা। কালিদাস রায়। মন্দিরা : আষাঢ়, ১৩৬৫।
১২. কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ।

১৩. কিরণধনের স্মৃতি। কালিদাস রায়। উপাসনা : কার্তিক, ১৩৩৮।
১৪. কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়। রবি রায়। একক : কার্তিক-পৌষ, ১৩৯৩।
১৫. আধুনিক প্রেমের কবিতা। জগদীশ ভট্টাচার্য। নতুন জীবন : অগ্রহায়ণ, ১৩৫২।
১৬. কিরণধনের স্মৃতি। কালিদাস রায়। উপাসনা : কার্তিক, ১৩৩৮।
১৭. কিরণধনের জন্মশতবর্ষপূর্তি-উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত স্মরণ সভায় পঠিত।
১৮. কিরণধনের স্মৃতি। কালিদাস রায়। উপাসনা : কার্তিক, ১৩৩৮।
১৯. কবি নরেন্দ্র দেবের কবিতা। পূর্বাচল : ফাল্গুন, ১৩৫৭।
২০. সজনীকান্ত দাস। পূর্বাচল : তদেব।

নতুন খাতা

নতুন খাতা



নতুন খাতা প্রথম-সংস্করণের (১৯২৩) প্রচ্ছদপত্র

নতুন-খাতা

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়

১।০

নতুন খাতা প্রথম-সংস্করণের (১৯২৩) আখ্যাপত্র

প্রকাশক
শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়
উত্তরপাড়া।

কলিকাতা, ৯৩।১এ বহুবাজার ষ্ট্রীট
চেরী প্রেস লিমিটেড হইতে
আর, কে, রাণা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নতুন খাতা প্রথম-সংস্করণের (১৯২৩) মুদ্রণ-বিবরণ-পত্র

নিবেদন

আমার এ লেখাগুলি ভারতী, বঙ্গবাণী, বিজলী, মানসী ও মর্মবাণী প্রভৃতি পত্রিকায় এতদিন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল। সেগুলিকে একত্র করে বই-এর আকারে ছাপা কখনো হোত কিনা সন্দেহ—হল যে সে শুধু আমার প্রিয় বন্ধু ও আত্মীয় স্বদেশ-প্রাণ শ্রী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও আমার ছোট ভাই শ্রীমান প্রাণধন চট্টোপাধ্যায় এঁদের উৎসাহে ও আগ্রহে—

উত্তরপাড়া

১৫ই অগ্রান, ১৩৩০ শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়

ভাই, বন্ধু ও সহচর—

শ্রী মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়—

তোমার হাতে দিলেম তুলে নতুন-খাতা—
মনের যতো হিজিবিজি ছন্দে গাঁথা ;
তোমার হাতের কালির আঁচড় অনেক স্থলে
দেখতে পাবে অনেক লেখার তলে-তলে।

প্রথম যবে করি আমি লেখা শুরু,
কে সে হাতে দিল খড়ি? কে সে গুরু?
আজকে আমি সেই কথাটি স্মরণ করে
নতুন খাতা তোমার হাতে দিলেম ধরে।

কিরণ-

নতুন-খাতা

আজকে আমার নতুন-খাতা,—
তোমাদের ভাই নিমন্ত্রণ,
বুকে আমার আসন পাতা ;—

এসো বন্ধু! এসো, এসো—টল্‌তে-টল্‌তে মদের গেলাস হাতে করে নিয়ে ;
আর তুমি কে গো? তুমিই না সেই বাস্তু-ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে দিয়ে
শহরেতে বাঁধলে বাসা? ওড়াও, ওড়াও, ফুর্তি ওড়াও! লজ্জা কি হে?

নিজের কড়ি উড়িয়ে দিলে তুমি,
বাপের বাড়ি কল্লে শ্মশানভূমি ;—
মারোনি তো একটি পয়সা কারো!
লোকের কথার ধার তুমি কি ধারো?

আজকে আমার নতুন-খাতা,—
তোমাদেরও নিমন্ত্রণ,
বুকে আমার আসন পাতা,—
এসো, এসো—জেল-খালাসি, পকেট-মারা, চোর-ডাকাত আর খুনি-জনের সেরা

নির্বিচারে তোমারা সবাই সবান্ধবে! নাইকো হেথায় বিচার কিংবা জেরা ;
করুন সে সব কুঁচকে ভূরু চশমা চোখে দিয়ে—যে লোকেরা
নিজেরা সব এক-একটি ধর্মপুত্র যেন!
তোমরা তাতে লজ্জা পাবে কেন?
সুবিধে ও সুযোগ থাকলে পরে,
বিচারক যে, বন্ধ হয়তো থাকতো হাজত-ঘরে?

আজকে আমার নতুন-খাতা,—
সকলকারি নিমন্ত্রণ,
বুকে আমার আসন পাতা।
তোমরা কারা দাঁড়িয়ে আছ সরে?
জাত গিয়েছে মুরগি খেয়ে? বিলেত গিয়ে? বিধবা-বিয়ে করে?
ঝাড়ু মারো তাদের মাথায়, যারা তোমায় শাস্ত্র দেখায়,
বিধান দিয়ে করেছে এক-ঘরে।

মানুষকে যে পর করে দেয়, বলো গিয়ে সে সব চসম্-খোরে
—"আমরা তোদের তোয়াক্কাটা কি রাখি!
আমাদের সব ফাঁকে রেখে নিজেই তোরা পড়ে গেলি ফাঁকি!
তোদের অন্ন একশোগুণে ঘৃণ্য মুরগি চেয়ে,
প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা খেয়ে!"

আজকে আমার নতুন-খাতা,—
তোদেরও ভাই নিমন্ত্রণ,
বুকে আমার আসন পাতা।
তোরা চামার? তোরা চাঁড়াল? জল খেতে নেই তোদের হাতে,
এম্নি তোরা অস্পৃশ্য—
বলেন যে সব মহাপ্রভু, তাদের টোলের নইকো আমি শিষ্য।
সত্যিকারের চামার, চাঁড়াল তারাই, যারা এমন সোনার বিশ্ব
অত্যাচারে কালো করে, ভরিয়ে তোলে ক্রন্দনে!
ছুঁই না সে সব শুদ্ধাচারী পৈতে-ধারী দুর্জনে—
তাদের বাতাস লাগাইনেকো গায়।
আয়, তোরা আয়, বুকের পরে আয়!

আজকে আমার নতুন-খাতা,—
তোমাদের ভাই নিমন্ত্রণ,
বুকে আমার আসন পাতা,—
এসো, এসো, সবাই এসো জাতিধর্মনির্বিশেষে—আসতে বারণ তাদের
শুধু খালি,
যারা ভণ্ড, মিথ্যেচারী, বকধর্মী—পেশা যাদের গায়ে দেওয়া কালি।
আর, দিক্‌বিদেকে লাগিয়ে ধাঁধাঁ হু-হু কোরে হাঁকিয়ে হাওয়ার গাড়ি
দিন-দুপুরে মাঝ-শহরে মানুষ মারে যারা—
খুনির অধম সে সকল জন ধনমদে মত্ত-মাতোয়ারা—
তাদের তো বাদ দিতেই হবে আমার এ মজ্‌লিসে
হউন তিনি প্রিয় শ্যালক, মাতুল কিংবা পিসে!

আজকে আমার নতুন-খাতা,—
নিয়ে এসো নতুন প্রীতি,
নতুন গীতি-গল্প-গাথা ;
পরস্পরে জড়িয়ে বুকে সবাই মিলে করি এসো প্রাণের কোলাকুলি,
সুখ-দুঃখের নাগর-দোলায় সকল ভাইয়ে একসঙ্গে দুলি ;
মনের মাঝের গোপন-ব্যথা এসো সবাই বলি খোলাখুলি ;

হৃদকমলের পদ্মমধু হাতে-হাতে বিলাই সকলে
তুচ্ছ হিংসা, তুচ্ছ ঘৃণা, তুচ্ছ বিরোধ-বিষের বদলে ;
এসো, সবার বুকে আশার প্রদীপ একশো-মুখে দিই জ্বেলে,
ভয়ের মুখে তুড়ি মেরে এগিয়ে চলি পা-ফেলে!

উকিলের কবুলতি

ওক্‌লাতি পাশ করে মুশ্‌কিলে পড়লুম,
কেউ বলে যাও গয়া কেউ বলে মানভূম,
কেউ বলে হবে কিছু পাড়ি মারো বর্মা,
অকূলে পড়েছি তারা উদ্ধার কর্ মা!
দিন যায় আদালতে, রাত বিনা-নিদ্রে,
না দেখিনু পয়সার মুখ-অরবিন্দে!
ডাক্‌তারি পাশ হলে কোন্ মিঞা মারতো,
দিন গেলে দুটো টাকা আসতে তো পারতো!
অঙ্কেতে মাথা নেই লাগে পাক-চরকি,
তা না হলে পড়তুম শিবপুর-রুড়কি।
উপ্‌রিতে মাইনেতে চলে যেত বেশ গো,
হতনা এমনতর হোপ্‌লেস্ কেস্ গো।
পাটের ও-দালালিটা কোরবো কি ভাবচি,
নিয়ে ক্ষেত বুনবো কি শাক আর সব্‌জি?
ছেলে-মেয়ে একজাই বাড়তেই চল্লো,
এটা-সেটা ফরমাসে অস্থির করলো,
পান খেয়ে হাসিমুখে প্রিয়া কথা কন্‌না,
ক্ষয়ে চুণ হয়ে গেছে তাঁর নাকি গয়না।
আজকাল চাল-ডাল যে রকম মাগ্‌গি,
ওই আছে এই তোর মান্ বলে ভাগ্যি।
নোয়াটাই হচ্ছে তো এয়োতীর লক্ষণ ;
বাজে বাজু-বালা-চুড়ি ইত্যাদি রক্ষণ।
কেরানির কুলিগিরি করতেও ইচ্ছে,
'ভেক্যান্সি' নেই বলে ভাগিয়ে যে দিচ্চে!
ইস্‌কুল-মাস্‌টারি—তাও পাওয়া শক্ত,
ছুটে-ছুটে হেঁটে-হেঁটে মুখে ওঠে রক্ত।
কপালেও জুটেছেন গিন্নিটি তেম্‌নি,
ছেলে-নিতে চাই দাসী রেঁধে দিতে বাম্‌নি।

শুধু তাই? আছে বাত—ইঙ্গিত মাত্র
দিতে হয় আমাকেই টিপে পা ও গাত্র!
ঝন্‌ঝন্‌ খন্‌খন্‌ হরদম ঝগড়া,
বেচারাকে নিয়ে যেন ছক্‌ড়া-নক্‌ড়া!
অর্থাৎ মানে তার নেই মোর পয়সা!—
বাণিজ্যে ধন আসে,—করবো কি ব্যবসা?
সক্কলে বলে শুনি—"বাঃ বাঃ বেশ তো!"
কোত্থেকে আসবে গো অতগুলো রেস্তো?
বিস্‌কুট চা-পানের দোকান কি করবো?
দু-পয়সা আছে তাতে মোটা-গোছ লভ্য!
'বসুমতী' পথে ফিরি করলে কি হয় না?
না না তাতে একটুও ইজ্জত রয় না!
হয় ভালো লটারি কি রেশ খেলে দেখলে
হারি যদি মরব না—মেরে দেবো জিতলে।
বিজ্ঞেরা বল্‌চেন, মাথা নেড়ে, বাবু হে!
পড়ে থাক আইনেই খেয়ে জল-সাবু হে।
পরিবার বুঝেচেন হাড়ে-হাড়ে মর্মে,
যেথা যাই যাইই করি নই কোনো কর্মে।
হায়-হায় প্রাণ যায় কি ফাঁপরে পড়লুম!
আশার ছলনে ভুলে কি ফলটা লভলুম!
পঁচিশটে টাকা করে ফি বছর গুনচি,
মনে-মনে আকাশেতে আশা-ফুল বুনচি।
দিন যায় আদালতে রাত বিনা-নিদ্রে,
আনিটাও আসেনাকো কভু কোনো ছিদ্রে।
পটিমারা ছেঁড়া চটি শিকভাঙা ছাতিটা
ঘুচলো না, এ জীবন একেবারে মাটিটা।

এ মাটিতে ফল-ফুল নাই যেন ফল্‌লো,
কাঁটাগাছে বিল্‌কুল চারিদিক ভরলো,
সেজন্যে নিরাশায় হরদম কাঁদবো?
ভাগ্যদেবীর পায়ে মাথা খুঁড়ে সাধবো?
থেঁতলে সে দিক্‌ ছিঁড়ে নিয়তির চক্র,
দুনিয়ার লোক থাক্‌ করে মুখ বক্র,
কক্‌খনো চোখে জল উঠবে না চল্‌কে,
যদ্দিন ঘরে আছে ভাঙা হুঁকো-কল্কে!
আর আছে ঝাল-ঝাল টক্‌-টক্‌ মিষ্টি
প্রিয়া মোর বুকভরা—আলো-করা সৃষ্টি।

সভ্যতার প্রতি

তোরাই শ্রেষ্ঠ তোরাই সভ্য সৃষ্টি-সেরা তোরাই শুধু
  গর্ব করে বেড়াস্ ওরে মানুষ!
ক্রমোন্নতির শিরোভূষণ মাথার মণি তোরা সবাই
  তোদের অসীম দীপ্তি এবং জলুস্!
টুটিয়ে আঁধার মগজ তোদের রংমশালের জ্বাল্‌চে মালা,
  জগৎ-সভায় চুটিয়ে করিস্ দাবি ;
ওরে মানুষ, বলে থাকিস্ বাব করেচিস নিখিল-বিশ্বে
  সব রহস্যের কুলুপ-খোলা চাবি ;—
সাম্‌নে এনে প্রমাণ ধরিস্ বিজ্ঞানের ওই যন্ত্র-শালা,
  রাত্রি-দিবা কচ্চে প্রসব যেটা
সব্-মেরিন ও উড়ো-জাহাজ বেতার-বার্তা-বহন-যন্ত্র
  সংখ্যাতীত এটা-ওটা-সেটা।
ঘনিষ্ঠতা করবি স্থাপন শুন্‌চি অতি সত্বরেতেই
  দূর-আকাশের গ্রহবাসীর সাথে,
পরলোকেও চল্‌বে তোদের কথাবার্তার আদান-প্রদান
  এমন আশাও রাখিস্ মানুষ হাতে।
বুদ্ধদেবের ব্যর্থপ্রয়াস জরা-মৃত্যু-ব্যাধিব মুক্তি
  এতোদিনে সফল হলো বুদ্ধি ;
অণুবীক্ষণ লাগিয়ে চোখে বীজাণু সব তাদের নাকি
  হাতড়ে তোরা বার করেচিস্ খুঁজি।
অহংকারে মাটির পরে পড়ছে না পা তোদের কারো
  নীল-আকাশের বুক চিরে তাই তোরা,
সভ্যতার ওই উড়িয়ে নিশান উড়িস্ চড়ে উড়ো-জাহাজ,
  উর্ধ্বদৃষ্টি স্তব্ধ বসুন্ধরা!
এইবারেতে হয়তো কোনো নতুন-যুগের নতুন কলম্বাসে
  অসীম শূন্যে কর্‌বে আবিষ্কার
আকাশ-সাগর মথন করে নতুন কোনো আমেরিকা
  পরীরা সব বাসিন্দিয়া যার।
ধন্য তোরা ওরে মানুষ, ধন্য তোদের কীর্তি-কলাপ,
  সভ্যতার আর রাখ্‌লিনেকো বাকি ;
কিন্তু এ কি দেখছি চেয়ে এমন সবুজ সোনার বিশ্ব
  আগা-গোড়াই রক্তে মাখামাখি!
মস্ত একটা কসাইখানা বিপুল বৃহৎ হত্যাক্ষেত্র
  কাক-শকুনের লীলার ভূমি করে,

তুল্লি গড়ে হায় রে মানুষ এই পৃথিবীর সমস্তটা
শতাব্দীর পর শতাব্দীটা ধরে।
আদিম যুগের বর্বরতা ঘুচ্‌লোনাকো একটু আজো,
এখনো সেই হিংস্র পশুর মতো,
পরস্পরের টুঁটি টিপে তেমনি করিস্‌ ছেঁড়াছিঁড়ি
নিষ্ঠুরতার চিহ্ন এঁকে শত।
বর্বরেরা রাগের মাথায় জ্বলে উঠে আগুন-সম
সটান ছুরি বসিয়ে দিত রুখে ;
রাষ্ট্রনীতির-সমাজনীতির ধর্মকথা করে তারা
শয়তানিটা পুষ্‌তোনাকো বুকে।
আকাশ থেকে টিপ করে ঠিক মাথার উপর ছুঁড়তে বোমা
কি করে হয় জানতোনাকো তারা,
শক্ত ব্যাধির বীজাণু সব মিশিয়ে দিয়ে নদীর জলে
জান্‌তোনাকো কায়দা শত্রু-মারা।
ইতিহাসের পাতায়-পাতায় রক্তাক্ষরে স্পষ্ট লেখা
হত্যাকাণ্ড যুগ-যুগান্ত ধরে,
সভ্যতার এই ক্রমিক বিকাশ হত্যা-ব্যাপারটাকে শুধু
তুল্‌চে গড়ে সূক্ষ্মশিল্প করে।
যন্ত্রপাতি দিচ্চে জোগান বৈজ্ঞানিকের দলেরা সব
জ্ঞানীরা সব তত্ত্বকথা কয়ে,
মানুষ-মারার গাইছে সাফাই নির্লজ্জের মতন বসে
একশো মুখে বক্তৃতায় ও ব'য়ে।
যে সভ্যতার ইস্তনাগাৎ উচ্চৈঃস্বরে অষ্টপ্রহর
গর্ব কোরে বেড়াস্‌ ওরে মানুষ!
সে তো শুধু ছাই এ ভরাট্‌ নেহাত ভুয়ো ডেড্‌-সি-আপেল
সাবান-জলের ঠুন্‌কা-ফাঁপা ফানুস!
হাতে মেরেই এক-রকমে নিষ্কৃতিটা দিতিস্‌ যদি
বাঁচতো তাতে অনেক চোখের জল,
বিশ্বব্যাপী কান্না এ যে তুল্লি তোরা ভাতে মেরে,
ত্রাহি-ত্রাহি ডাক্‌চে ভূমণ্ডল!
চর্ব্য-চোষ্যে পূর্ণ উদর ঘূর্ণি-বায়ুর মতন তোরা
হাঁকিয়ে মোটর করিস্‌ ছুটোছুটি,
নিরীহ-প্রাণ অসংখ্য লোক চাকার তলায় পড়ে তোদের
দিবারাত্র খাচ্চে লুটাপুটি।
আয়ু যাদের ফুরিয়ে গেছে মরণ তাদের কে আটকাবে?
মর্‌বে এটায় না হয় আর-একটাতে,

পথ চল্‌তে অশিক্ষিত-অসাবধানী গ্রাম্য যারা
তাদের উচিত মৃত্যু অপঘাতে!
সে জন্য শোক মিথ্যে করা—হাঁকা জোরে হাওয়ার গাড়ি
বড় মানুষ, গরিব মানুষ মেরে ;
তোদের বিলাস-হাঁড়িকাঠে হয় তো রোজই নরবলি
একরকম না আর একরকম ফেরে!

এই যে নিত্য যাচ্ছে মারা অসংখ্য লোক অনাহারে,
কাড়চে মায়ে ছেলের মুখের গ্রাস,
এই যে নিত্য মর্‌চে রোগে একটি ফোঁটা ওষুধ বিনা
অসংখ্য লোক খাচ্চে নাভি-শ্বাস,
এই যে যত মুটে-মজুর-দর্জি-ধোপা-চাষা-তাঁতি
কামার-কুমোর-শ্রমজীবীর দল,
আহার-বিহার বিলাস-দ্রব্য জোগায় তোদের ভারে-ভারে
বুকের কাঁচা রক্ত করে জল,
নিজেরা হায় পায় না খেতে দুটি বেলা পেট-ভরা ভাত
ভগবানে ডাক্‌ছে ত্রাহি-ত্রাহি—
সভ্যতার এই শতাব্দীতে এই যে ভীষণ অত্যাচারটা
ইহার জন্য নয় কি তোরা দায়ী?
ক্রমোন্নতির প্রথম সূত্র দুর্বলেরা হট্‌বে পিছু
যোগ্যতমের হবে উদ্বর্তন ;—
সব দেশেরই ইতিহাসে এই কথারি দিচ্চে সাক্ষ্য
এই কথারি কর্‌ছে সমর্থন ;
সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার অলীক স্বপন দেখ্‌ছে যত
কাব্যপ্রিয়-অন্ধ-কাল্পনিক ;
আসমান-জমি রইছে ফারাক কল্পনা ও বাস্তবেতে
কালও যেমন আজ্‌ও তেম্‌নি ঠিক।
অতএব এ মিথ্যে বিলাপ—পৈশাচিকী নৃত্যলীলা
জগৎ জুড়ে হউক অভিনয়,
অত্যাচারে-উৎপীড়নে যাক্ এ বিশ্ব ছারেখারে
হউক দুষ্ট সয়তানেরি জয়!
ভণ্ডামি আর বুজ্‌রুকিটা বুকের ভিতর থাকুক পোষা
মুখে থাকুক্ লেগে কপট হাসি,
ধার চাইতে একটি পয়সা তোমার গৃহে বন্ধু যদি
দ্বারস্থ হয়—দুহাত পাতে আসি,
ফিরিয়ে দিও দু-চার কথা সদুপদেশ দিয়ে বরং
সেই সুযোগে এম্‌নি সুকৌশলে,

দ্বিতীয়বার আর যেন সে তোমার বাড়ির ত্রিসীমানা
মাড়ায়নাকো আবার কোনো ছলে।
দল বেঁধে আর কোমর বেঁধে উঠে-পড়ে সবাই লাগো
দেশের কাজে সমাজ-হিতের ব্রতে,
ধর্মে বেজায় গ্লানির মাত্রা উঠ্‌ছে বেড়ে দিনে-দিনে,
রহিত কর্‌তে সেইটে কোনো মতে—
গলাবাজি-কলমবাজি এই দুটো কাজ মিলে-মিশে
চালাও কসে আচ্ছা করে জোরে ;
নেপথ্যে ও অন্তরালে যা প্রাণে চায় করে যেও
কে আর দেখ্‌ছে আগল ঠেলে ঘরে!
উন্নতি আর সভ্যতা কি একেই বলে ওরে মানুষ
যুগ-যুগান্তের পরিশ্রমের ফল,
ষোল আনাই ভেজাল-মেকি—গোয়ালিনীর দুধের মতো
সেরেফ খাঁটি সাদা রঙের জল।
সভ্যতার এই খাঁচার ভিতর হাঁপিয়ে ওঠে পরান-পাখি
বর্বরতার মুক্ত বায়ুর তরে,
বিষিয়ে ওঠে সমস্ত প্রাণ কলের যত ধুলোয়-ধোঁয়ায়
কৃত্রিমতায় জ্যান্ত মানুষ মরে।
দূর করে দে ইলেক্‌ট্রিকের পাখা-আলো-মোটর-ফেটিন্‌
সভ্যতার সব বিলাস-বাবুয়ানা।
সময়-সময় ইচ্ছেটা যায় পালিয়ে যাই সেই বন্য দেশে
বর্বরতা দিচ্চে যেথা হানা!
আফ্রিকা কি আমেরিকার আদিম অধিবাসীর সাথে
নগ্ন বেশে বেড়াই বনে-বনে,
সভ্যতার এই বিলাস-সজ্জা ধুলোর মতো ফেলি ঝেড়ে
মিথ্যা জ্ঞানের কাজল বোলাই মনে।
সাহিত্য ও বিজ্ঞানের এই র‍্যাবিস্‌-পোরা মগজটাকে
উপুড় করে উজোড় করে ফেলি,
মিল-ডারুইন-স্পেনসার-আদির ভুলি ঝুটো বুক্‌নিগুলো
কি বায়রন কি টেনিসন শেলি ;
রং-বেরঙের উল্কি আঁকি, নক্‌সা কাটি গায়ের উপর
বনের পশু বেড়াই শিকার করে,
সাপের সঙ্গে বাঘের সঙ্গে লড়াই করে অষ্টপ্রহর
ঘুরে বেড়াই বনে-বনান্তরে।
মহুয়া ফুলের মধুর সুরা পান করে নে মহোল্লাসে
পাহাড়-পাহাড় বেড়াই নেচে-নেচে,

অসুখ হলে ভূত ঝাড়াতে ডেকে আনাই রোজা-গুনিন্
　না হয় তো খাই গাছের পাতা ছেঁচে ;
ডাক্তারির সব ফক্কিকারি উড়িয়ে দিয়ে একটি ফুঁয়ে
　আবার সুস্থ-সবল হয়ে উঠি
হাত ধরে মোর বন্য-প্রিয়ার চাঁদের আলোয় নদীর তীরে
　চাঁদের আলো দুহাত দিয়ে লুটি ;
গাছ-পাথর আর নোড়া-নুড়ির করি ফেটিস উপাসনা
　আচার-ব্যাভার তাদের গ্রহণ করি,
তাদের রীতি তাদের নীতি তাদের প্রথা-কুসংস্কার
　বুকের ভিতর আঁক্‌ড়ে নিয়ে ধরি!

গির্জে-গৃহে-মন্দিরেতে সকল আচার-অনুষ্ঠানে
　সর্বনাশী এই যে কৃত্রিমতা,—
ইহার চেয়ে অনেক ভালো সুস্থ-সবল-সহজ জীবন
　বন্য-জাতির নগ্ন বর্বরতা!

ব্যথার স্মৃতি

প্রতি নিশিদিন ফিরি উদাসীন সঙ্গী-বিহীন প্রবাসে
লোকে ভালোবাসে, কত খেলে-হাসে ; দিন যায়-আসে হতাশে!
মনে পড়ে যায় দুধে-আল্‌তায় রেখে দুটি পায় সেই যে—
অবনীর সার তনু সুকুমার নেই সে আমার নেই যে।
উড়ে আসে খালি শ্মশানের কালি চিতাধূম বালি পবনে,
যতো কিছু আলো করে দেয় কালো, লাগেনাকো ভালো জীবনে!
এ কি অবসাদ! যত সুখ-সাধ লাগে বিস্বাদ যেন গো,
আর পাপিয়ায় দখিনে হাওয়ায় তনু না কাঁপায় কেন গো!

জীবনের মতো বসন্ত গত ;— কাঙালের মতো সরিয়া
পড়ে পথ-পাশে মিশে থাকি ঘাসে, চোখ জলে আসে ভরিয়া।
চুড়িওলা হাঁকে ; জানালার ফাঁকে কতজনা ডাকে—'এ বাড়ি!'
আধ-ঘোম্‌টায় মুখ দেখা যায়, মন চন্‌কায় ফি-বারই।
বাসন্তী-রং কাঁচের বাসন আরো কি-রকম কত কি—
পথে হেঁকে-হেঁকে যায় ডেকে-ডেকে কে তাদের দেখে নিরখি?
ভেল্‌ভেট-পাড় জরি-বুটিদার পড়েনাকো আর নয়নে ;
ফিরি আর কই পছন্দসই এটা-ওটা ওই চয়নে!

চিঠি-বিলি-করা ডাক-হরকরা চলে যায় সরাসর ওই ;—
উদ্বেগ-মাখা পথ-চেয়ে-থাকা বুকে-করে রাখা চিঠি কই?
মরণের পর নেই ডাকঘর, নইলে খবর নিত সে ;
এটি-উটি-সেটি লিখে চার-পিঠই একখানা চিঠি দিত সে ;—
সেই এক সুর—আমি নিষ্ঠুর, বিদেশি বঁধুর লাগিয়া,
তার মতো কই ভেবে সারা হই, নিশিদিন রই জাগিয়া?
এ কি জাল-বোনা হায় কল্পনা! মনে আল্‌পনা আঁকা গো ;
মরি কত ছলে স্মৃতি-শতদলে ধুয়ে আঁখিজলে রাখা গো!

সাগরে-সলিলে আকাশে-অনিলে বিশ্বনিখিলে দেওয়ালি ;—
চম্‌কায় দিল্‌ আলো বঙ্গিল—সবুজ-সুনীল-সোনালি!
ছোটে তর্‌-তর্‌ হাসি-নির্ঝর—মণি-মুক্তোর ঝরনা
টুটি আবরণ—রেশমি বাঁধন আস্‌মানি-রং ওড়না।
হেনা-চামেলির মিঠে সুরভির মদিরে সমীর মত্ত
আনন্দ-গান ভরে তোলে প্রাণ নাচে আন্‌চান রক্ত।
এত আলো-গান হাসি অফুরান সবই ম্রিয়মাণ লাগে যে—
কুটির আঁধার, নিবিড় ব্যথার স্মৃতি শুধু তার জাগে যে!

তাই নিশিদিন ফিরি উদাসীন উৎসাহহীন আলসে,
ফেলি আঁখি-লোর, কোথা মনচোর—নয়নের মোর আলো সে?
সেই একদিন প্রথম-নবীন স্বপ্ন-বিলীন শ্রাবণে—
লোপ সৃষ্টির শুভদৃষ্টির সুধাবৃষ্টির প্লাবনে!
আর-একদিন বিদায়-মলিন চেতনা-বিহীন চক্ষে
হইল ধরণী পাণ্ডুবরনী হানিল অশনি বক্ষে!—
বকুলের বনে পবনে-পবনে এই-সব মনে পড়ে গো,
যে ছিল সে নাই, হয়ে গেছে ছাই, জলে আঁখি তাই ভরে গো।

কবে সে ডাক্‌লো কোকিল

কবে সে ডাকলো কোকিল,
ফুটলো বকুল,
হৃদয়ে ছুটলো তুফান,
ভাস্‌লো দুকূল!
কে এসে বাসিয়ে ভালো,
বাস্‌লে ভালো,

আদরে রাখ্‌লে বুকে,
বুক জুড়াল।
আকাশে লক্ষ চাঁদের
লক্ষ বাতি
দিল গো জ্বালিয়ে দিল
বাসর-রাতি!
বাতাসে ঘোম্‌টা খসে
পড়ল কখন
হলো সে চারটি চোখের
চকিত মিলন!

কত না চাঁদনি রাতি
চাঁদের সনে
কেটেছে জাগিয়ে-জেগে
সঙ্গোপনে!
কত সে প্রণয়-লীলা,
প্রেম-অভিনয়!
হৃদয়ে হৃদয় রেখে
প্রাণ-বিনিময়!
তবুও মিট্‌তো সে কই—
প্রণয়-তৃষা?
পিপাসা জ্বল্‌তো বুকে
দিবস-নিশা!
বিরহে পথটি চেয়ে
মিলন-আশে,
কত না দাঁড়িয়ে থাকা—
পথের পাশে!

কোকিলে দেয় না সাড়া
আর তো এখন,
ঝরেছে বকুল-গোলাপ
হায় গো কখন!
দেখে সে ফুলের স্বপন
মনের ভুলে
কাননে ধায় ভ্রমরে
কান্না তুলে।
আকাশে সোনার চাঁদে
নিব্‌লো আলো,

ঢেকেছে মুখটি মেঘে
নিবিড় কালো,
পরীরা আর নামে না
স্নানের তরে,
জোছ্না অমল-ধবল
শ্বেত-সায়রে!
ছোটে না হৃদয়-নদী
তুফান বুকে,
খোলে না ঝর্‌না মধুর,
মিষ্টি মুখে।
ভেঙেছে সোনার স্বপন—
প্রেম-অভিনয়
জীবনে আর কভু নয়
আর কভু নয়!

মেটেনি মিট্‌বে না আর
প্রণয়-তৃষা—
পিপাসা জ্বল্‌চে বুকে
দিবস-নিশা।
বিরহে পথটি চেয়ে
মিলন-আশে
কাতরে দাঁড়িয়ে আজো
পথের পাশে।

সুখের সাহারা

স্বর্গে সেদিন উৎসব-দিন আসন্ন ঘন সন্ধ্যা,
শহরের পথে ছোটে লাখো লোক,—ফুল্ল-অলকনন্দা ;
ইন্দ্র-সভায় করিবে নৃত্য উর্বশী চারু-অঙ্গী,
সোনার-নূপুর-ঝুমুর-ঝুমুর চরণে ললিত ভঙ্গি ;
বিজলি-বরনী অপ্সরী নানা মন্দার-মালা বক্ষে,
মেনকা-রম্ভা গান গাবে নীল মেঘের কাজল চক্ষে ;
মন্দাকিনীর কূলে এসে নামে তরণী-বোঝাই যাত্রী,
চিরবসন্ত বারোমাস সেথা জোছ্না-প্লাবিত রাত্রি।

প্রতি বনে-বনে পারিজাত-ফুল করে মন-প্রাণ ফুল্ল,
ভিড়ে-জনতায় সব রাস্তায় পুষ্প-পরাগ উড়্‌লো ;
ফুলে-মোড়া পথ ভেলভেটবৎ নাইকো ধূলির চিহ্ন,
কল্পনাতীত অন্যের কারো স্বর্গের-বাসী ভিন্ন ;
চিরযৌবন বাঁধিয়া যাহারা রেখেছে আপন অঙ্গে,
ভুলেছ জন্ম-মৃত্যুর স্বাদ রোগ-শোক সেইসঙ্গে,
যাদের স্বচ্ছ নয়নে ঝলকে কী এক অতুল দীপ্তি,
বুক-ভরা খাঁটি সন্তোষ-মধু অন্তর-ভরা তৃপ্তি।

তোরণ-তোরণ উড়িল কেতন রচিত দিয়া সে স্বর্ণ ;
নহবত বাজে মধুর-মধুর শ্রবণে জুড়ায় কর্ণ ;
নর-নারী যতো ধায় অবিরত করিয়া রত্ন-সজ্জা,
যার কাছে হায় ম্লান হয়ে যায় কোহিনুর পায় লজ্জা,
এতো উৎসব উল্লাস-মাঝে একাকী চিন্তামগ্না,
মন্দাকিনীর নির্জন তীরে মণি-শিলা-তট-লগ্না,
হরিণ-নয়নী কে ওই তরুণী সজল-আনত দৃষ্টি?
—কান্ত-কোমল পারিজাত-সম অমৃত-সমান মিষ্টি!

সহচরী কয়—কম মেয়ে নয়!—এইখানে কিনা শেষটা?
এ-পাড়া ও-পাড়া খুঁজে দিশেহারা হনু আমি সারা দেশটা!
কার 'পরে রোষে একলাটি বসে? দেখে জ্বলে ওঠে অঙ্গ,
বাঁধিস্‌নি চুল পরিস্‌নি দুল্ কত না জানিস রঙ্গ,
বেলা বয়ে যায় ইন্দ্রসভায় নাচগান শুরু হয়তো,
যাবি যদি চল্ না যাবি তো বল্ একা আমি যাই নয়তো ;
কস্‌নেকো কথা কেন ওলো সখি? কেনলো মেজাজ রুক্ষ?
একি! একি! তোর চোখে কেন জল? স্বর্গে কিসের দুঃখ?

"স্বর্গে আবার দুঃখ কিসের? সুখেরি ঘূর্ণাবর্তে
পড়িয়া সখিলো সাধ যায় পুনঃ ফিরে যেতে সেই মর্ত্যে!
—আলোর পিছনে ছায়া খেলে যেথা সুখের পিছনে দুঃখ ;
স্বর্গ-ভোগের বিষম শাস্তি চায় যে ভীষণ মূর্খ!
এ তো সুখ নয়, সুখের সাহারা—তপ্ত হাসির দীপ্তি,
অশ্রু-বিহীন মরু-প্রান্তর—সীমাহীন ধু-ধু তৃপ্তি!
এর চেয়ে ঢের ভালো সে আমার হাসি-অশ্রুর তৈরি—
অতীত-প্রাচীন মর্ত্য-জীবন—যে সুখে দেবতা বৈরী!

সখি লো, মোদের ঘরখানি ছিল কী সুখের যদি জান্‌তে!
হাটতলা ফেলে পশ্চিমে হেলে গাঁয়ের একটি প্রান্তে,

সাম্‌নেই এক মস্ত পুকুর—মুখ দেখা যেন আরশি,
জল সরতুম সেই পুকুরের আট-ঘর পাড়া-পড়শি ;
কামিনী-মালতী-আমি তিনজন দেখে লোকজন অল্প,
জল তোলবার মিছে ছল করে জুড়তুম সেথা গল্প ;
ডাইনে একটু ছোট্ট বাগান, পিছনে জামের বন লো,
ফাঁক্-ফাঁক্ মোরা পড়্‌শি ক-ঘর ছিনু এক-প্রাণ-মন লো।

সদর উঠানে আমলকী গাছ কত্‌বেল গাছ ঝাঁকড়া,
করবী ফুলের ঝোপটির পাশে ফল্‌তো বিলেতি আম্‌ড়া ;
ভিতর-উঠানে ধানের মরাই নেবুগাছ—চিনে কাগ্‌জি,
ফল্‌তো সেখানে নাউ ও কুম্‌ড়ো নানাবিধ শাক-সবজি ;
গোয়াল-ঘরের একটু পাশেই ছিল তুলসীর মঞ্চ,—
মোর অতীতের প্রাচীন কাহিনী মন দিয়ে সখি শুন্‌চো?
খিড়কির ধারে পুকুরটি ছিল ছোটখাট একরতি
চক্‌চকে যেন রুপোর দু-আনি মৌরলা মাছে ভর্তি।

পাঠশালা আর পোস্টো আপিস ছিল গ্রামটির মধ্যে,
ছেলেরা পড়তে যেত পাঠশালে মোদের বাড়ির পথ দে ;
তাদেরি হাত দে ফেল্‌তে দিতেম চিঠি-ভরা মোর কান্না—
বিধবা মায়ের প্রবাসী মেয়ের হাজারো রকম বায়না ;
কাছ-ছাড়া এই একটি মেয়ের বিরহ তাঁহারে বাজ্‌তো,
এত-বড় এই বুড়ো মেয়েটার আব্দার কি লো সাজ্‌তো?
ফুলকপি আর কড়াই-সুঁটিটি উঠ্‌তো প্রথম যাই লো,
লুভি মেয়েটার জন্যে তাঁহার পাঠিয়ে দেওয়াই চাই লো!

সুদূর প্রবাসে পল্লীজীবন কাহার প্রণযস্পর্শে
হয়েছিল রাঙা এত মনোরম? সখি লো আমার বর সে!
সখি লো সে মোর প্রিয় প্রিয়তম দেবতা আমার স্বর্গ—
হৃদয়-কানন-কুসুম চয়নে রচেছিনু তার অর্ঘ্য!
পূজারিণী মোর পূজা সারা শেষ হলোনা হলোনা জন্মে,
ব্যর্থতা শুধু বিঁধিয়া রহিল চিরতরে প্রাণে-মর্মে ;
বিদ্রোহী প্রাণ ছাড়া পেতে চায় ছিঁড়ে দে সুখের শিক্‌লি,
ঢের ভালো ছিল সে মোর জীবন সুখে-দুখে পাঁচ-মিশ্‌লি!

সখি লো, সে আজ কেঁদে-কেঁদে পথে শিরে কর তার হান্‌চে
আমি যে এখনো ভুলিনি তাহারে ভালোবাসি সে কি জান্‌চে?
সে ছিল কে জানে কেমন মানুষ কাঁদিয়ে আমায় হাস্‌তো!
বলে ছল করে রূঢ় কথা মোরে মনে-মনে ভালোবাস্‌তো!

আমার গায়ের একটু আঁচড়ও সইত না তার বক্ষে,
সারারাত ধরে পাখা করে-করে ঘুম নাই তার চক্ষে ;
ফরমাস্ তার মিনিট মিনিট একটা না হয় একটা—
—এই ছিল নেই পানের ডিপেটা, এই কোথা মনি-ব্যাগটা?

সখি লো, সে মোরে করেছিল দান দু-খানি হীরের টুক্‌রো—
এতটুকু কচি তিল একরতি ফাউ-পাওয়া যেন খুচ্‌রো!
সমস্ত প্রাণ আলো করে তারা ভরেছিল মোর চিত্ত,
হয়েছিল মোর জীবনে যা-কিছু নীরস যা কিছু তিক্ত ;
—মিটিমিটি হাসি কালো-কালো চুল কোলে ছুটে আসা ঝাঁপিয়ে,
মা-মা করে সেই আদুরে কান্না ঠোঁটটি ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে!
এখনো দেখি লো স্বপ্নে তাদের কোলে শুয়ে ঠিক তেম্‌নি,
ভুল করে যাই চুমু খেতে চাই জেগে উঠি ভাই অম্‌নি!

ওথ্‌লানো দুধ উপ্‌চে উঠে লো তোলপাড় করে বক্ষে,
টন্‌টন্ করে প্রত্যেক শির ;—অশ্রু বহে দু-চক্ষে ;
অভিশাপ দিই বিধাতার 'পর—এ কি নিষ্ঠুর শাস্তি!
সুখের খেলনা হাতে দিয়ে তুলে কাড়েন মুখের গ্রাসটি!
সখি লো তোরা তো দিব্যি আছিস্—নাহিকো দুঃখ্-ভাবনা,
আমারি এ পোড়া চক্ষে কেন লো জমে আছ যত কান্না?
সঙ্গিনী মম, বন্দিনী-সম কাটাই দিবস-রাত্রি,
হায় লো আমার মাটির মানুষ অমৃত-লোকের প্রার্থী!

সোনার কাঠি

সোনার কাঠির পরশে সখি লো,
কে আমারে আজি জাগালো!
নিমীলিত আঁখি নিলীন শয়নে,
মগ্ন স্বপন-কুসুম চয়নে,
নীল অঞ্জন কে আসি নয়নে
লাগালো!
কে আমারে সখি জাগালো!

বকুল মালার কুসুম কণ্ঠে
কে আমার সখি দোলালো!

সে ফুলগন্ধ সুরভি-সুবাস
গায়ে লাগে যেন তারি নিশ্বাস,
সখি লো আমারে আকাশ-বাতাস
ভোলালো!
কণ্ঠে কুসুম দোলালো!

এলো কোথা থেকে পাগলা বাতাস,
আমারে বুঝি সে ক্ষ্যাপালো!
উথলে শোণিতে একি তরঙ্গ,
লাগে প্রাণে ঢেউ কত রকম গো,
সে কি হিল্লোল সকল অঙ্গ
কাঁপালো!
কে আমারে সখি ক্ষ্যাপালো!

ঘর-ছাড়া বাঁশি কে সখি লো আসি
বলে ভালোবাসি বাজালো!
শুনি কান পেতে ওই সে বাজায়,
'আয়-আয়-আয় বুকে চলে আয়,'
সখি লো মধুর সে সুর আমায়
মজালো!
কে সখি বাঁশরি বাজালো!

মাথায় আমার রত্ন-কিরীট
বুঝি বা কে সখি পরালো!
সে আমি তো নেই আজ আমি আর,
বিজয়িনী যেন রানী কোথাকার,
ঝলকে তীক্ষ্ণ-খর-তলোয়ার
ধারালো!
রত্ন-কিরীট পরালো!

আবিরের রাগে কুঙ্কুমে-ফাগে
কে মোর পরান রাঙালো!
অযুত ইন্দু সহস্র রবি
কিরণে উজল চোখে লাগে সবই,
কে আনি শূন্যে নন্দন ছবি
টাঙালো!
কে মোর পরান রাঙালো!

মোর যৌবন-বন পুষ্পে-পাতায়
সখি লো কে আজ ফোটালো!
নুয়ে পড়ি সেই সৌরভ-ভারে,
লুব্ধ ভ্রমর কানে ঝঙ্কারে,
এসে দুটি পায়ে বারে-বারে-বারে
লোটালো!
যৌবন মম ফোটালো!

মায়ের বিপদ

ফুটবলের ওই মাঠের দিকে
যাচ্ছি যখন ট্রাইসিকিলে চড়ে,
ঝট্‌কা হাওয়া এমনি উড়ে এলো,
উল্টে মা'গো গেলেম আমি পড়ে!
খপ্ করে না সাম্‌লে নিয়ে উঠে
পালিয়ে যেমন আস্‌তে যাব ছুটে
সাম্‌নে দেখি আসচে চেপে উটে
একটা কালো মস্ত বড় বুড়ো!
দেখেই তো সেই চওড়া সাদা ভুরু
বুকটা কেঁপে উঠলো গুরু-গুরু,
ঠোঁট দুটো পাঁউরুটির মতো পুরু
লম্বা দাড়ি যেন শনের নুড়ো।
বল্লে—আরে ভয় পেও না খোকা,
আমার দেখে পালায় কিরে বোকা!
চিনিসনে তাই লাগচে মনে ধোঁকা,
আমি হচ্চি ছেলে-ধরার মেশো!
যে সব মায়ে দুষ্টুপনা করে,
নে যাই ধরে ঝুলির ভিতর ভরে,
বন্ধ রাখি অন্ধকারের ঘরে,
মিলবেনাকো খুঁজলে নানা দেশও!
তাই বলি মা সাবা দুপুর ধরে
চাসনেকো আর ঘুম পাড়াতে মোরে,
রোদ্দুরে তোব খোকা যদি ঘোরে
বকে-ঝকে করিসনেকো মানা ;

দৈবে যদি টের পেয়ে সেই বুড়ো
নে যায় তোরে ধরে চুলের চুড়ো
হামান-দিস্তেয় হাড় করে দ্যায় গুঁড়ো,
হাত ভেঙে দে চোখ করে দ্যায় কানা!

আর একদিনে ঠিক দুপুরের বেলা
একলা ছাতে ওড়াচ্চি মা ঘুড়ি,
বাড়িখানা ঘুমিয়ে পড়ে আছে,
যাচ্চে হেঁকে বেলোয়ারি চুড়ি,
এমন সময় কালো মেঘের থেকে
নামলো কে এক চম্‌কে গেলুম দেখে,
কোমরটা তার পড়চে নুয়ে বেঁকে,
যাচ্চে দেখা দাঁতে কালো মিশি ;
পরনে তার একটা ছেঁড়া কাঁথা,
ধুঁতরো ফুলের মতন সাদা মাথা,
গলাতে তার হাড়ের মালা গাঁথা
বল্লে—"আমি জটে-বুড়ির পিসি!
একটা কথা বলচি কানে-কানে
ভয় পেও না কেউ যেন না জানে,
দুষ্টু মাদের ছোঁ মেরে একটানে
নে যাই আমি উড়িয়ে কালো মেঘে ;
সেথায় তাদের শুইয়ে কোলের পরে
খাইয়ে দি দুধ ঝিনুক ভরে-ভরে,
কাজল দিয়ে চোখ দি কালো করে,
কাঁদলে পরে বোকতে থাকি রেগে।"
তাই বলি মা অমন করে আর
দুধ খাওয়াতে চাসনে বারে-বার,
একলা যদি যাইও পুকুরধার
বকে-ঝকে আসিসনেকো তেড়ে ;
দৈবে যদি টের পেয়ে সেই বুড়ি
উড়িয়ে তোরে নেযায় মেবে তুড়ি,
চুরি করে হাতের সোনার চুড়ি,
জব্দ করে হাজার রকম ফেরে!

দস্যি

অস্থির-চঞ্চল,
একটুতে চোখে জল,
মাধুরীর শতদল
বুক-জুড়ানো!
চুম্বন-উৎসুক
ঠোঁট লাল টুক্-টুক্,
দুষ্টমি-মাখা মুখ
হাসি-ছড়ানো!

কান্ত ও কমনীয় ;
চিরদিন স্মরণীয়,
সে অনির্বচনীয়,
স্বপ্নময়ী!
আগুনের ফিনকুটি
ছিট্‌কায় চোখদুটি,
ছোট্ট সে বাহুমুঠি
বিশ্ব-জয়ী!

কী স্নিগ্ধ-শীতলতা—
বেষ্টিত তনু-লতা,
লাবণ্য-কোমলতা
ঝরে অঙ্গে!
অদ্‌ভুত পড়ে গায়
মজ্‌বুত ঝগড়ায়,
বিদ্যুৎ চমকায়
ভুরু-ভঙ্গে!

রেগে রাঙা গন্-গন্,
ঘর-দোর ঝন্-ঝন্,
চুড়ি বাজে খন্-খন্,
কাঁপিয়ে ভিটে!
পলকেই রাগ ছোটে,
সে মানুষ নয় মোটে,
একগাল্ হাসি ফোটে
এক মিনিটে!

এই ভাব এই আড়ি,
চুমু নিয়ে কাড়াকাড়ি,
তাড়াতাড়ি-বাড়াবাড়ি,
সব জিনিসে!
রাতদিন অবিরল
কৌতুক-লীলাছল,
অভিমানে রসাতল
প্রতি নিমিষে!

বেমালুম্ বুক ঠুকে
মিছে কথা কয় রুখে,
জবাবটি মুখে-মুখে
গাঁথা তৈরি!
অবুঝ্ সে নিষ্ঠুর,
নেই বোধ কিচ্ছুর,
ঘুমের সে দস্তুর-
মতো বৈরী!

এ-রকম দস্যিকে
সাম্লাবে কোন্দিকে?
লুটে নিলে মনটিকে
জোরসে এসে!
তবু সেই মন্-চোরে
ভালোবাসি অন্তরে,
জানিনে কি মন্তরে
ভোলালো যে সে!

নন্দন-বন থেকে
চুরি করে আন্লে কে?—
পারিজাত ফুল একে—
রাখবো কোথা?
এ হাওয়ায় বাঁচবে কি?
আলো-জলে নাচবে কি?
বুকে রেখে চেয়ে দেখি—
লেগেছে ব্যথা!

ভাই-বোনে

ও নলিনি, এইদিকে আয়, একটা কথা শোন্,
তুই যদি মোর ভাইটি হতিস আর আমি তোর বোন্,
তার মানে—তুই হতিস আমি, আমি হতুম তুই—
আধ-ফুটন্ত শিশির-ধোয়া একটি সাদা জুঁই ;
হোঃ-হোঃ-হোঃ কেমন মজা হতো ও ভাই বল্,
আলতা-পায়ে বাজিয়ে যেতুম ঝম্-ঝমা-ঝম্ মল!

থাকতোনাকো লেখাপড়ার এত কড়াক্কড়,
নিত্যি-নিত্যি ইস্কুলে গে কানমলা-বেত-চড়,
কেপ কমোরিন কোনখানেতে কেই বা সাজাহান,
অতো খপর রাখতো কে ভাই? রাখতো কে সন্ধান?
এতো মাথার বুদ্ধি ধরি তবুও সেদিন স্যার
বল্লে আমি একটা গাধা—আস্ত জানোয়ার!

ভাবচিস্ তুই কেমন করে সাজতুম আমি পান?
চুন-সুপুরি-এলাচ দিয়ে ; নেই কি আমার জ্ঞান?
বলতে খয়ের ভুল করেছি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা ভুল,
বলতে কথা এদিক্-ওদিক্ হয় অমন একচুল,
জল-নুন-ঘি পরিবেশন, করতে আসন ঠাঁই
খুব পারতুম খুব পারতুম খুব পারতুম ভাই।

ঠাকুরমায়ের পুজোর জোগাড়, মার দুটো ফরমাস,
ওই যে কি তুই ব্রত করিস দিস গরুকে ঘাস,
জলের মতন সহজ সে তো ; অঙ্ক কসা নয়—
দেখলে পরে বুকের ভেতর আঁতকে ওঠে ভয়!
সকাল হলে তুলতে যেতুম শিবের পূজার ফুল,
বিকেল বেলা বাঁধতুম বসে আরশি নিয়ে চুল।

ভাঁড়ার থেকে মা আমারে বল্লে কিছু—আন্,
সেই সুযোগে আমের আচার নিয়ে না সট্‌কান!
তুই হতিস মোর দাদা কি না—তোরেও কিছু ভাগ
দিতুম আমি, নইলে পরে হয়তো করে রাগ
মার সুমুখে বামাল সমেত ধরিয়ে দিতিস চোর,
এখন যেমন দিই এই আমি ধরিয়ে চুরি তোর।

তুই যদি মোর ভাইটি হতিস আর আমি তোর বোন্,
হোঃ-হোঃ-হোঃ হতো মজা হতো বিলক্ষণ ;

"দুদিন গেলেই বিয়ে হবে যাবে পরের ঘর,
ওরে কিছু বলিস্‌নিকো সবাই আদর কর"—
এই বলে না মা আমারে রেহাই দিত খুন,
খড়্গাহস্ত তোর উপরে খসলে পানে চুন!

সাড়ে দশটার হাজিরে তোরে দিতেই হতো রোজ,
হোক্ খাওয়া চাই না হোক্ খাওয়া—কেমন মজা বোঝ্!
দুপুর বেলা দিব্যি করে খেতুম মাছ আর ভাত,
নিত্যি-নিত্যি গরম খেয়ে পুড়তো না জিভ-হাত ;
একটুখানি ঘুমিয়ে নিয়ে উঠতুম আবার ফের,
চলতো ফিরে ফেলে-রাখা পুতুল খেলার জের।

তুই পড়তিস রয়্যাল-রিডার আমি বুনতুম উল,
তুই চড়তিস ট্রাইসিকিলে আমি পরতুম দুল ;
কাজল চোখে দিতুম আমি, ভুরুর মাঝে টিপ ;
তুই খুঁজিতিস্ কোথায় ম্যাপে মালয় উপদ্বীপ!
আমি সবার আদর খেতুম তুই বকুনি-গাল,
ভুল্লে বানান কানটি মলে করে দিত লাল।

শারদোৎসব

এসো-এসো-এসো হে উৎসব!
নিয়ে হাসি বাঁশরির রব,
শরতের সুবর্ণ অঞ্চলে
ভরে নিয়ে এসো শেফালিকা সূর্যমুখী কুন্দ শতদলে
সে পুষ্পসম্ভার
হউক অক্ষয় পুণ্য নির্মাল্য তোমার,
বিশ্বমাতা ত্রিলোক পালিকা!
দেবী অম্বালিকা!

মেঘমুক্ত নীলাম্বর হতে
ভেসে আসে বাধাহীন দুর্নিবার স্রোতে
স্নিগ্ধ-শান্ত আলোকের ধারা ;
চন্দ্র আর লক্ষ-লক্ষ তারা
বুক চিরে দিতে চায় যতো পারে আলো ;
সেই মাগো ভালো,

সে যে অন্তরের মধু—জ্যোতির্ময় রক্ত-হৃদয়ের,
উপযুক্ত অর্ঘ্য মাগো দুটি তব রক্ত-চরণের।

কি দেবে মা মানবের প্রাণ? কিবা আছে তার?
কলঙ্কে মলিন সে যে অবিশ্বাসে দুষ্ট—দুরাচার,
বকলমে সারে কাজ
নাহি লাজ!
পুরাহিত ডাকি
আপনারে দেয় শুধু ফাঁকি?
তোমারেও করে অপমান,
সেই কালো অবিশ্বাস কপট অর্চনা—মানুষের প্রাণহীন দান
নাও স্বামী-সোহাগিনী! নীলকণ্ঠ করেছিল পান
কালকূট—সেই কথা স্মরি,
দশদিক যাক ভরি
পূজা-ছলে শঙ্খ-ঘণ্টা আরতির রোলে,
আনন্দ-হিল্লোলে
মধুময় হোক এ উৎসব,
ছুটুক-ফুটুক হাসি বাজুক-বাজুক বাঁশিরব।

বিশ্বের অন্তরে সদা বাজিতেছে যে মঙ্গল-গান
সেই সুরে আজ মাগো বেঁধে দাও প্রাণ,
রোগ-শোক-দারিদ্র্যের মাঝে
যে মঙ্গল-সুন্দর বিরাজে
তারি দিব্য আলো
জ্বালো মাগো জ্বালো
নিভ-নিভ মানুষের লক্ষ মুখ জীবন-প্রদীপে,
সে আলোক নাহি যেন নিভে
ঝড়-ঝঞ্ঝায়, কর আশীর্বাদ,
পূর্ণ হোক এ উৎসব পুণ্য হোক মনস্কাম-সাধ।

দেনদার

বাগান-বাড়ি বিকিয়ে গেছে—টান পড়েছে বাস্তুতে,
পুঁজি-পাটা যা ছিল তা লুটে নিল পাঁচভূতে,
এবার জ্বালিয়ে দিয়ে নীল বাতি
গাছতলা সার করতে হবে পরতে হবে পাঁচ-হাতি,
পালিয়ে বেড়াই ধরবে কবে আদালতের যমদূতে।

পাওনাদারে দিই না গালি, তার যেন না কেউ মরে,
পুত্র-পৌত্র তস্য পুত্র মনের সুখে ভোগ করে,
ওসে করলে বটে দিগ্‌দারি,
পাওনা-গণ্ডা কেইবা ছাড়ে? তারেই কেন গাল পাড়ি?
কেউ-বা আসল বাড়ায় সুদে কেউ-বা সুদের সুদ ধরে!

বাবার নিজের হাতের-পোঁতা উঠোনে কৎবেলগাছে,
নতুন মালিক এসে যদি ভয় হয় কোপ দ্যায় পাছে!
মার লক্ষ্মীপুজোর ভোগ-ঘরে
নিত্য-ধোয়া গঙ্গাজলে ম্লেচ্ছয়ানী কেউ করে!
দেউলে যে জন তার কেন মন হয় গো এমন সাত-পাঁচে?

পরিবারের গয়নাগাঁটি দিয়েছি তো সব ফুঁকে,
একরতি তিল নেইকো সোনা চাইব যে ধার কোন্ মুখে?
ওমা কেমন করে দিন চলে!
ময়রা-মুদি-গয়লা এদের ঠেকিয়ে রাখি কোন্ ছলে?
সাতশো কথা অপমানের মুখ ফুটে কয় বুক ঠুকে।

বন্ধুজনে এড়িয়ে চলে, দ্যায়না আমল আর মোটে,
দেখলে—ভালো? কেমন! ভালো?—শুক্‌নো হাসি বয় ঠোঁটে,
তারা আদর-খাতির সব জানে,
মানুষ বুঝে যত্ন-আদর অবজ্ঞারি বাণ হানে,
ঘৃণার কাঁটা কোথাও,—কোথাও আপ্যায়ণের ফুল ফোটে!

মেয়েটা এই ভুগছে জ্বরে ভিজিট দেবো কোত্থেকে?
ডাক্তারে চায় নগদ-নগদ বাজার-খাতির নাই দেখে!
ওসে যায় যদি সে যাক্ মরে,
কাঠের পয়সা না জোটে তোর মাটি খুঁড়েই দিস্ গোরে,
ষাট্-ষাট্-ষাট্, বাছা আমার, অদৃষ্টে তোর এই লেখে?

দুবেলা পেট চলতো যাদের ঠাকুরদাদার পায় ধরে,
তাদের বংশধরেরা আজ কথবে আমায় একঘরে!
আমার এই দুনিয়ায় ঠাঁই কোথা?
ঘড়া-ঘড়া সোনার মোহর মাটিতে আর নেই পোঁতা,
থাক্‌লে পরে বুঝে নিতুম ; লড়বো এখন কার জোরে?

নেই কোন দোষ ভাগ্যদেবীর, লক্ষ্মী বড় চুলবুলে,
এই ছিল এই পালিয়ে গেল খিড়্‌কি-দোরের খিল খুলে,
ওমা এমনি সে এক ছুট্ দিলে,
মিথ্যে তার আর পিছু ধাওয়া ; ফেল্লে বিষম মুশকিলে!
দুষ্টু মেয়ে ফিরবে কি আর? চাইবে ফিরে মুখ তুলে?

গিন্নি

এই দেবী-পক্ষে থাকবে না রক্ষে
বউয়েরে না আনলে ছেলে হবে খ্যাপ্পা,
ভাবি যাই তীর্থে, সংসার মিথ্যে,
নড়বো যে নড়বার জো আছে কি এক পা?

ঠাকুরের রান্না কর্তা যে খান্ না,
বুড়ো হলে বায়নার থাকে না সে অন্ত ;
জ্বলে যায় পিত্তি শুনে-শুনে নিত্যি
রকমারি ফরমাস, তবু নেই দন্ত!

জামায়েরে তত্ত্ব মুখে তুলে রক্ত
হবেই তো করতে, চুপচাপ কর্তা—
খোঁচা দিলে ভিমরুল- সম বিঁধে দ্যান হুল,
আক্কারা সব চিজ, বুঝবে কি পর তা?

নাতনীর জন্যে খুঁজে-খুঁজে হন্যে
মিল্‌চে না তবু কোনো মনোমত পাত্র,
লেখা যা তা ভাগ্যে হবে সে তা, থাক্‌গে
ওই নিয়ে ভাবনা খালি দিনরাত্র।

ফুরিয়েছে কয়লা, বড়িগুলো ময়লা
হয়ে গেল ন-বউয়ের দোষে খালি সুদ্ধু ;
বলি যদি অম্‌নি রেগে রাঙা অগ্নি
চুপচাপ্ আছি বাপ, কে করবে যুদ্ধু?

ঝি—বেটিরে তাড়িয়ে দিতে হবে নাড়িয়ে
ছিরি-ছাঁদ নেই তার কোনো কাজ-কর্মে
কোটে মুখে তুব্‌ড়ি, চারিদিকে সক্‌ড়ি
করে দিলে এক্‌শা—খেলে জাত-জন্মে।

বড় মেয়ে শৈল ছ-ছ মাস রইল
শ্বশুরের বাড়ি, এবে হবে তারে আনতে,
এলে হয় রোস্‌কে দিই হরি ঘোষকে
ধার-পড়া বঁটিখানা ভালো করে শান্‌তে।

লিখে-পড়ে মুখ্যু হয় এ কি দুঃখু
বড় নাতি নাস্তিক মারে রোজ মুরগি,

যত অনাছিষ্টি লাগেনাকো মিষ্টি
সোজাসুজি মাছ-ভাত-ডাল-রুটি-দুধ-ঘি!

যাবে যুগ উল্টে নেই তার ভুলটে,
মালতীর বোন দ্যায় দু-আঙুল ঘোমটা—
ভাশুরের সামনে, আবার সে খাম্ নে
ইংরিজি চিঠি লেখে, মারে মুখ-ঝাম্‌টা!

ধোপা-বউ কালকে চলে গেল সাল্‌কে,
ছিঁড়ে দিলে মশারিটা—এলে পরে বুঝবো,
পাথরের বাট্‌টে ঘটি তিন-চারটে
হারালে সে ছোট বউ, আমি মরে খুঁজবো!

দেহ আর বয় না, খাটুনিও সয় না,
একটু হেঁটেছি যাই পা-দুখানি ফুল্‌লো,
দু-দণ্ড বসবো তার্‌পিন্ ঘসবো
অমনি সে বাড়িময় হৈ-চৈ উঠলো!

খুকি বড় কাশ্‌চে ; স্যাকরা না আসচে
বালা ভেঙে করোগেট চুড়ি দেবো গড়তে,
উঃ এ কি বাত গো! কাল সারা রাত গো
ঘুমুইনি, বাঁচি পেলে বিছানায় পড়তে।

ভালো লাগে বলে

ভালোবাসি—
মিছে কথা সখি ;
কাছে আসি
ভালো লাগে বলে,

কি নিরখি
ভুলিল এ চোখ,
রে কুহকী!
বোঝাব কি ছলে?

ও কনক—
কান্ত তনু তোর—
কী আলোক
করে বিকিরণ!

লাগে ঘোর,
গোলাপি নেশায়
মুদে মোর
আসে দুনয়ন!

আঁখি ছায় ;
বরিষার সম
বেদনায়
ঘন সুনিবিড়,

প্রাণ মম
কাঁপে থর-থর
অনুপম—
লাবণ্য-অধীর!

দুটি কর—
কমল পরশে,
ফুল-শর
লাখে লাখ ছোটে!

মধুর সে
কুসুম-আঘাত,
নিঠুর সে
বুকে এসে ফোটে।

ভালোবাসি—
কে বলিল সখি?
কাছে আসি
ভালো লাগে বলে,

কি নিরখি
ভুলিল এ প্রাণ?
রে কুহকী
বোঝাব কি ছলে!

পেতে কান,
শুনি যবে তব
ছোটে গান
কাঁপিয়া কাঁপিয়া,

অভিনব
হরষ উছলে—
অনুভব
করি শিরা দিয়া!

লীলাছলে
বাজাও কাঁকন,
খেল জলে
লইয়া গাগরি,

মোর মন
নেচে বেজে ওঠে
সেইখন
শিহরি-শিহরি!

গালে ফোটে
বসোরা গোলাপ,
রাঙা ঠোঁটে
পড়ে সুধা ঝরি,

কালো ছাপ
এঁকে দিয়ে সেথা
অনুতাপ
লজ্জাতে মরি!

ভালোবাসা—
কারে সখি কয়?
আমি চাষা—
জানিনে সোয়াদ,

মনে হয়—
এই হবে বুঝি,
পাই ভয়
ঘটিল প্রমাদ!

সোজাসুজি
ভালো লাগে জানি,
যোঝাযুঝি
করিতে না চাই

ওগো রানী!
বড় কথা তুলে
হাসিখানি
মুখে যদি পাই!

যদি ভুলে
কভু কয়ে থাকি
শ্রুতি-মূলে
ভালোবাসি তোরে,

বুকে রাখি
নিবিড় সোহাগে
দিই ঢাকি
একান্ত আদরে,

ভাল লাগে
বুকে শুধু সখি,
অনুরাগে
কাছে আসো বলে,

কী নিরখি
ভুলিল এ আঁখি
রে কুহকী!
বোঝাব কি ছলে?

আব্দারের আধঘণ্টা

বেল-ফুল চাই না,
জুঁই-ফুল দাও!
ও গানটা গেও না,
এই গান গাও!
কেন ভালোবাসলে
বল—বল না ;
হাসলে কেন তুমি?
—কথা কব না!
কাল্‌কের গল্প
আজ কর শেষ ;

আজকের রাতটা
    লাগচে না বেশ?
সারাটা বেলা ধরে
    বাঁধলুম চুল,
দেখলে না চেয়ে তা
    এম্‌নিই ভুল!
জুঁই-ফুল চাই না
    বেল-ফুল দাও ;
এ গানটা গেও না,
    ওই গান গাও!

জুঁই-ফুল নেবো না,
    দাও বেল-ফুল।
গোলাপকে পার্শীরা
    বলে না কি গুল্‌?
ও দিকেতে চেও না,
    চাও এই-দিক ;
আলোটা নিভে আসে
    দাও করে ঠিক ;
লাগচে চোখে আলো
    করে দাও কম ;
ওই যা, বাতি গেল
    নিভে একদম!
হবেনাকো জ্বাল্‌তে
    খুব বাহাদুর,
জানা গেছে বুদ্ধি
    যায় কতদূর!
বেল-ফুল চাই না,
    দাও জুঁই-ফুল ;
পার্শীরা গোলাপকে
    বলে নাকি গুল?

জুঁই-বেল চাই না,
    চাঁপা এনে দাও ;
আমি কি তা জানি, তুমি
    পাও কি না পাও?
কাকাতুয়া কিনে দেবে—
    কিনে দিলে খুব!

কথা কেন নেই মুখে
 হয়ে গেল চুপ?
ভালোবাস কি না বাস—
 ঠিক বলো না!
চাঁদ ওই উঠছে,
 ছাদে চলো না।
মুখে চুন লাগলো,
 ফিরে নাও পান ;
মাথা-ঘুরে পড়লো—
 গেওনাকো গান ;
চাই না জুঁই-বেল,
 চাঁপা এনে দাও ;
আমি কি তা জানি, তুমি
 পাও কি না পাও?

চাঁপা-ফুল চাই না,
 চাই চামেলি ;
সব-তাতে হবে-হবে
 খালি গাফেলি!
আজ রাতে দুজনাতে
 জেগে থাকবো,
কে হারে কে জেতে
 আমি তাই দেখবো!
ছোট বলে করবে কি
 তুই-তোকারি?
তাতে যে গো অপমান
 হয় আমারি!
না বলে না কয়ে তুমি
 কেন চুমা খাও?
বলিনাকো যত-কিছু
 আশকারা পাও।
চামেলি সে চাই না,
 দাও চাঁপা-ফুল ;—
মিঠে তার গন্ধ
 গা তুল্‌তুল্‌।

চাঁপা-ফুল চাই না,
 দাও বেল-ফুল ,

খোঁপা থেকে ঝরে পড়ে
গেল বিল্‌কুল্‌!
কুড়িয়ে সব ক'টা
পরিয়ে দাও ;
আবার না বলে তুমি
গালে চুমা খাও!
আমি মরে গেলে তুমি
খুব কাঁদবে?
তখন এ বাহু-ডোরে
কারে বাঁধবে?
ওকি, ওকি, চোখ থেকে
পড়ে কেন জল?
মরে কেন যাব আমি—
মিছে করি ছল্‌।
জুঁই, বেল, চামেলি—
যা খুশি তা দাও,
ও-গালেতে চুমা খেলে
এ-গালেতে খাও!

নাম-কাটা সেপাই

বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ির পাশে বোসেদের ওই আটচালায়
পাঠিয়ে দিলে বাবা আমায় মেরে-ধরে পাঠশালায়।
হাতে-খড়ি নয় সে আমার, পড়লো হাতে দড়ি গো!
সকাল-বিকেল ঘানি-টানা দিয়ে ঘরের কড়ি গো!
রক্ত-আঁখি গুরুমশাই শক্ত বেজায় কাট-গোঁয়ার,
গাঁট্টা মেরে দু-কান মলে কল্লে হাড় আর মাস খোয়ার!
কড়ানে আর বুড়্‌কে তবু হয় না আমার মুখস্থ ;
ভাবচেন মোরে গুরুমশাই করবেন কিসে দুরস্ত ;
আমিও ঠিক তক্কে-তক্কে জব্দ করার মতলবে
ফিরতেছিলুম ; জলবিছুটি বেশিদিন কে সয় কবে?
লেখা-পড়ায় রইলুম কাঁচা তামাক সাজায় পাকলো হাত,
দেখে-শুনে গুরুমশাই দিতেন আমায় সেই বরাত,
একদিন ডেকে বল্লেন—ওরে হুঁকোটার জল ফিরিয়ে আন,
এমনি সে জল ফিরিয়ে দিলুম বাপরে বলে মূর্চ্ছা যান!

সেদিন থেকে পাঠশালার ওই পড়াশুনোয় ইস্তফা,
ইস্কুলেতে ভর্তি হলুম সাঙ্গ পালা একদফা।

ইস্কুলেতে গিয়ে দেখি ভিন্ন রকম ধরন-ধাঁচ—
চেয়ার-বেঞ্চি-টানাপাখা-খড়খড়ি আর সার্সি-কাঁচ।
পাত্‌তাড়িটার বালাই গেছে ছেলেরা সব বেঞ্চিতে ;
লিখ্‌তে সেখা হয়নাকো আর কলম বেড়ে কঞ্চিতে।
ঘড়ি ধরে হাজরেটা ঠিক দেওয়া কিন্তু চাইই-চাই,
নচেৎ দাঁড়াও বেঞ্চির উপর মরি-মরি কি প্রথাই!
বাড়িতে আজ ভাতের দেরি মায়ের অসুখ, বোনের জ্বর,
এমনি কশাই মাস্টারমশাই শুনবেনাকো সে ওজর।
চারটে বাজলে দিনের ছুটি ; পাঁচটি ঘণ্টা ধরে গো,
আটকে থাকতে হয় সেখানে মোরে-মোরে-মোরে গো!
তামাক সাজতে হয় না বটে হয় না তুলতে পাকা চুল,
গাঁট্টা কিন্তু একই রকম হলে পরে আঁকে ভুল!
সেইখানেতেই শুনতে পেলুম আজগুবি সব কতোই বোল,
এমন চ্যাপ্টা পৃথিবীটা কমলালেবুর মতন গোল ;
লাট্টুর মতো ঘুরছে আবার বন্‌বনিয়ে রাত্রিদিন ;
সূর্যদেবকে করেন তিনি এক বছরে প্রদক্ষিণ।
এমন সাদা দিনের আলো সাতটা রঙের সমন্বয় ;
তারারা সব রাত্রিদেবীর কালো-চুলের গয়না নয়।
সম্প্রদানে চতুর্থী আর 'অলম্' যোগে তৃতীয়া,
'প্লুরাল' করতে হয় 'নাউনের' শব্দ-শেষে 'এস' দিয়া।
এম্‌নিতর কতরকম শুন্‌তুম, মনে রাখতুম না—
পাশের ছেলের অঙ্ক টুকে ধরা পড়লে মানতুম না,
গাধার টুপি মাথায় দিয়ে ঘুরিয়ে আনতো চারিদিকে ;
একজামিনে আসতুম কি যে মাথা-মুণ্ডু ছাই লিখে!
এক কেলাসে দুটো বছর পড়ে, পিছলে উঠতুম শেষ ;
বল্‌তো সবাই নেইকো আমার বিদ্যে-বুদ্ধি-লজ্জা-লেশ!

মন্দ ছেলে বলে আমার রটলো পাড়ায় অখ্যাতি ;
নিজের খেয়াল-ফন্দি নিয়ে থাকতুম মেতে দিন-রাতই।
হয়ে গেলুম মার্কা-মারা তর্কবাগীশ ডান্‌পিটে ;
সবার আগে এগিয়ে যেতুম গুণ্ডামি ও মারপিটে।
এপার-ওপার হতুম দিঘি সাঁতার দিয়ে একদমে ;
চলতুম পথে শুধু-মাথায় বিষ্টি যখন ঝম্‌ঝমে।
বোশেখ মাসে দুপুরবেলায় রোদে যখন কাট ফাটে
রক্ত-মুখে ঘুরচি তখন এ-মাঠ থেকে ও-মাঠে।

জিমন্যাস্‌টিক, ফুটবলেতে আমিই ছিলুম আগুয়ান ;
সন্ধেবেলা বাজিয়ে বাঁশি গাইতুম রবিবাবুর গান।
দেখতুম চেয়ে জেলের ডিঙি হলুদ-বরন পাল তুলে
চাঁদের আলোয় যাচ্চে ভেসে, উঠ্‌তো আমার বুক দুলে!
আলো-হাওয়া বন্ধ করে ঘরের কোণে দোর দিয়ে
ভালো-ছেলে পড়ছে তখন শুকনো-পাতা বই নিয়ে!
একদিন হটাৎ পড়ল ধরা মাস্টার মেরে রতন শেঠ,
বাঁচিয়ে আমি দিলুম তাকে, আপনি হয়ে রাস্টিকেট।

এখন আমি ঘুরে বেড়াই যেন সেপাই নাম-কাটা,
সঙ্গে নিয়ে চওড়া বুক আর শক্ত আমার হাত-পা-টা।
অঙ্ক কসিস্ ভালো ছেলে, গাঁট্টা কষাবি আয় দেখি!
অতো বোঝাই করলে মাথা হাত-পা তোদের খেলবে কি!
আকাশ-বাতাস ডাক দিয়েছে, বুকের ভিতর বইছে ঝড়,
আমার বুকে বুক মিলিয়ে বই ছেড়ে আয় বেরিয়ে পড়।
রূপে-রসে-গন্ধে ভরা বিশ্বময়ই আনন্দ,
পাঠশালাতে রইলি কয়েদ? হা দুর্ভাগ্য! হা অন্ধ!
হয়ে থাক্‌বো আমি, করবি তোরা 'এম. এ' পাস
ভাবিসনিকো সেই আফ্‌সোসে ফেলচি নিত্য দীর্ঘশ্বাস!
এত বিদ্যে করলি জমা বুকের রক্ত জল-করা—
দাসত্ব তো করবি শেষে চাক্‌রি সেতো পায় ধরা!
তোরাই আমার কৃপার পাত্র, ঘৃণা আমায় করবি কর,
নিজের হাতে কুপিয়ে মাটি করবো তোয়ের খড়ের ঘর।
তোদের প্রাসাদ গাড়ি-জুড়ি হাজার টাকা মাইনেরে,
স্বাধীন যদি থাকতে পারি, চাইনে আমি চাইনেরে।

কমলানেবুর দেশে

আঙুর-বেদানা-পেস্তা-বাদাম-কমলানেবুর দেশে
আমরা দুজনে যাব মা এবার মিহিজাম থেকে এসে।
বাংলাটি খুঁজে নেব ঠিক সেথা,
তলা দিয়ে নদী বয়ে যায় যেথা—
সন্ধেবেলায় হেনার গন্ধ হাওয়ার সঙ্গে মেশে ;
এবার আমরা যাব মা দুজনে কমলানেবুর দেশে।

দালচিনি আর মৌরি-এলাচ সেইখানে মা কি ফলে?
লাল-নীল যত মাছগুলি সব খেলে পুকুরের জলে?

দাল্‌চিনি-ফুল এলাচের-পাতা
খেতে দেয় বুঝি হরিণের মা, তা—
তোমার মতন খোকাটিরে তার ক্ষিদে পেলে বেলা হলে?
মাঠে-মাঠে খেলে ময়ূর হরিণ এলাচের গাছ ফলে?

ভেঙে কুচি-কুচি করে দে শেলেট্, ছিঁড়ে কুটি-কুটি বই ;
পাগড়ি মাথায় দেখলে 'ঙ'টা ভয়ে আমি সারা হই।
'ঌ' কারের মতো ডিগ্‌বাজি খেতে
পারি আমি দিলে কার্পেট পেতে;
কেদারায় বসে অ আ ক খ গ ঘ ওইটেই রাজি নই!
আঙুরের দেশে যাব মা, দুজনে ফেলে দে শেলেট্ বই।

বোম্বাই মেল, পাঞ্জাব মেল, কোনটায় যাবি বল?
পথ জেনে নে মা ঠাকুমার কাছে ; ঠাকুমাকে নিয়ে চল।
উড়োন্-জাহাজে হয় নাকি গেলে?
আকাশের নীল মেঘ ঠেলে-ঠেলে;—
নয় তো জাহাজে দুলে ঢেউ তুলে নাচিয়ে সাগর-জল?
হাসচিস কেন? বল মা আমায় কোনটায় যাবি বল?

কমলা ফুলের রঙ দিয়ে দিস ছুপিয়ে কাপড় মোর;
টিপ্ এঁকে দিস্ পরিয়ে কাজল যেমনি হবে মা ভোর।
রাখাল ছেলের মতন আমায়
চূড়ো বেঁধে চুল দিস গো মাথায়
আপেলের ক্ষেতে আঙুরতলায় ঘুরব মা দিন-ভোর
কমলা ফুলের রঙ দিয়ে দিস ছুপিয়ে কাপড় মোর।

দুপুর-বেলায় ডাকবি যখন— 'ভাত খাবি আয় ওর্তে!
পেস্তা-বাদাম-কিচমিচি সব আন্‌ব আঁচল ভরে ;
আপেল-আঙুর দু-এক হাজার
এনে ঢেলে দেবো সামনে তোমার
ডিম-ভরা লাল-নীল-রঙা মাছ আনব কতই ধরে ;
দুপুরবেলায় ডাকবি যখন—'ভাত খাবি আয় ওরে!'

পেরজাপতির পিছনে-পিছনে এ-বনে ও-বনে যাব ;
যদি ক্ষিদে পায় হাতের নাগালে টাট্‌কা আঙুর পাব।
সন্ধেবেলায় ফিরব যখন,
ঝাঁপ খেয়ে কোলে পড়ব তখন ;
তোমার মুখের মিষ্ট চুমু মা মধুর মতন খাব।
পেরজাপতির পিছনে-পিছনে এ-বনে ও-বনে যাব।

বাদাম খোলার ছিনি-মিনি খেলব পুকুরপাড়ে,
লুকিয়ে বসে মা গাছের ছায়ায় আপেল গাছের আড়ে;
ভয় পাবি তুই পাছে ডুবে যাই
ছুটে তাড়াতাড়ি আসবি গো তাই,
দেখবি সেথায় খোকা তোর নাই; বেদানা গাছের ঝাড়ে।
বাদাম খোলার ছিনিমিনি খেলা খেলব পুকুরপাড়ে।

খেলার সময় যদি কোনোদিন কুড়িয়ে হঠাৎ পাই—
ছোট্ট একটি হরিণ ছানা সে ঠিকানাটি যায় নাই!
কেঁপে-কেঁপে সারা ভয়ে থর-থর,
ডাগর দুচোখ জলে ভর-ভর,
বলে যেন খোকা বলতে কি পার মা কোথা আমার ভাই?
হারিয়ে-যাওয়া সে হরিণের ছানা যদি কোনদিন পাই!

বাড়ির সুমুখে পুঁতে দেবো দুটি কমলানেবুর চারা,
সকালে-বিকেলে জল দেবো তাতে নইলে যে যাবে মারা।
পিচকিরি ছুঁড়ে ঝরনার জল
দিতে তুই মানা করবিনে বল?
লাগালেই জল অসুখ করে কি? ভয়ে কেন হোস্ সারা?
বাড়ির সুমুখে পুঁতে দেবো দুটি কমলা-নেবুর চারা!

বকা-ঝকা কিছু কোরোনা সেথায় বলছি এখন থেকে!
কী রকম রাগ জানো তো আমার একটু দাঁড়ালে বেঁকে!
কমলা-নেবুর খোসা ছিঁড়ে নিয়ে
টিপে তার রস দেব চোখে দিয়ে,
উহু-উহু করে পালাবি তখন আঁচলে দুচোখ ঢেকে
বকা-ঝকা কিছু কোরো না সেথায় বলছি এখন থেকে।

প্রতীক্ষায়

অস্তগিরির পরে,
ঝড় উঠেছে রঙের বনে আলোর বৃষ্টি ঝরে!

সবুজ মাঠের ক্ষেতে,
ধূপছায়া-রঙ শাড়ির আঁচল কে রেখেছে পেতে!

ওই গগন-কিনারায়,
সাদা মেঘের পাল তুলে কার পান্‌সি ভেসে যায়!

কালো দিঘির জলে,
হাওয়ার কাঁপন লাগলো কখন্‌ সাঁঝের আলো ঝলে!

বকুল ফুলের বনে,
গন্ধে-ভারি দখিন বাতাস দেয় দোলানি মনে!

মাথায়—রূপের ডালি
আড়চোখে দূর আকাশ-কোণে সরু চাঁদের ফালি!

গোলাপ-বাগিচায়,
গোলাপজলের ঝরনা-তলায় রাজকুমারী নায়!

হল্‌দে বাড়ির ছাতে,
তুলসীতলায় ঘোমটা মাথায় বউটি প্রদীপ হাতে!

বন্ধ ঘাটের খেয়া,
ডিঙি বাঁধা নদীর কূলে চুকলো দেওয়া-নেওয়া।

গাঁয়ের সীমানায়,
বাজিয়ে বাঁশি রাখাল ছেলে ঘরে ফিরে যায়!

আমি চেয়ে আছি পথে—
ওই গোধূলির উড়িয়ে ধূলি আস্‌বে সে কি রথে?

পয়লা তারিখ বোশেখ মাসে

পয়লা তারিখ বোশেখ মাসে (কবির কানে খপর আসে)
রাতারাতি ঘুম ভেঙে না উঠে,—
আকাশের ওই ওপার থেকে বসন্ত কয় মাকে ডেকে
কোলের কাছে দৌড়ে গিয়ে ছুটে ;
ঘুমের শিশির চোখের পাতায় জড়িয়ে তখন, পড়্ছে মাথায়
এলো-খোঁপায় এলিয়ে চাঁপা ফুল,
অঙ্গে সারা ফুল-আভরণ, শিথিল বসন অলস চরণ,—
বল্‌তে কথা হয় অগণন ভুল ;

অশোক ফুলের নূপুর পায়ে, ফুর-ফুর-ফুর উড়চে গায়ে
দখিন হাওয়ার রেশ্‌মি সুতোয় বোনা—
জুঁই-চামেলির চুম্‌কি দেওয়া ভোর আকাশে ছুপিয়ে নেওয়া
শাড়ির আঁচল পাড়-বসানো সোনা,—
"ঘুম চোখে নেই দুষ্টু মেয়ে! (মুখের পানে মা কয় চেয়ে)
এই সকালে কেউ কখনো ওঠে—?
দে গালে দে একটা চুমো, আরো খানিক শুয়ে ঘুমো,
বল্লে কথা শুনিস্ নে তো মোটে!
গোলাপ জলে মুখ ধুয়ে আয়, পায় ক্ষিদে তো বলিস্ আমায়,
তৈরি আছে ফুলের মধু সাজো ;"
"আমায় তুমি কী যে ভাবো! এই সকালে খাবার খাবো?
মা আমি কি কচি খুকি আজো?
মাগো, আমার পড়্‌ছে মনে— ফাগুনে সেই ফুলের বনে
বসিয়ে কোলে ভুলিয়ে কত ছলে,
সাজিয়ে তুমি দিলে আমায় ফলে-ফুলে লতায়-পাতায়,
পর-পর গয়না পর বলে!
আবির নিয়ে কতই খেলা খেলেচি সেই ছেলেবেলা
সিঁদুর মেঘের টিপ পরেচি কত,
চাঁদের আলোয় স্নান করেচি, সুর-সাহানায় গান ধরেচি,
জাল বুনেচি স্বপ্নে শত-শত ;
আমার পোষা কোকিল-ডেকে, আমের মুকুল মিষ্টি দেখে
খাইয়ে দিছি নিজের হাতে করে,
রং-বেরং-এর ঢেউ তুলেছি, কতই না সে দোল দুলেছি,
চপল বুকে তরুণ-তরুণীর ;
মিলন দিছি নিবিড় করে নিছাঁক হাসির মধু ভরে,
বিরহেতে তপ্ত আঁখি-নীর!
মন্ চুরির সেই মন্ত্রখানা— আমার যেটা ছিল জানা,
বিলিয়ে সেটা দিলেম পথে-ঘাটে ;
কান্না-হাসি অকারণে, শিউরে-ওঠা সুখ-স্বপনে,
নিষ্কৃতি নেই ঘুমিয়ে সোনার খাটে!
আর সে এখন ছেলেখেলা, চাঁদের হাটে ফুলের মেলা,
নাচিয়ে তোলা রূপ-সায়রের জল,
বাঁশির সুরে হাসির গানে দুলিয়ে-দেওয়া সকল প্রাণে—
ফুটিয়ে তোলা প্রেমের শতদল,
আর সে এখন অনুরাগে কুঙ্কমেরি রক্তরাগে—
রাঙিয়ে দেওয়া আকাশ-বাতাস-আলো,

আন্‌তে গে জল সাঁঝের বেলা আপনারে সেই হারিয়ে ফেলা,
চম্‌কে দেওয়া কাজল চোখে কালো,
হাসির আড়ে লুকিয়ে রাখা মনের ব্যথা সরম-ঢাকা,
কল্পনারি রঙিন পাখায় ওড়া,
ভুল করা সেই পায়ে-পায়ে, একলা বিজন বকুল-ছায়ে
সৃষ্টিছাড়া খেয়াল যত গড়া,
বল্‌ না মাগো বল্‌ না আমায়, আর কি এখন তেমন মানায়?
আল্‌তা পায়ে বাজিয়ে যাওয়া মল?
আজো আমায় সুর্‌মা চোখে দেখলে কী সব বলবে লোকে?
—বুড়ো মেয়ে জানেও এত ছল।
মুনি-জনের মনোহরণ এক-গা গায়ে রতন-ভূষণ,
বল্‌ না মাগো আর কি আমায় সাজে?
আর না দেব চরণ-মূলে আলতা, নূপুর ফেল্‌বো খুলে,
আপনা হেরি আপনি মরি লাজে!
আজকে মা এই বিবিয়ানা যোলো-কড়াই ঠেক্‌ছে কানা,
বনের কোকিল উড়িয়ে দেব বনে,
মিট্‌চে না তো মনের ক্ষুধা, কোথায় সুধা? কোথায় সুধা--?
পাগল হলেম তারি অন্বেষণে!
আবার কৃচ্ছ্রব্রত নেব, ভোগ-ঐশ্বর্য বিলিয়ে দেব,
ত্যাগের মন্ত্র জপ্‌বো রাত্রিদিন,
ঝরা ফুলের আসরেতে আসনখানি নেব পেতে
কঠোর তপে করবো তনু ক্ষীণ ;
মাখ্‌বো ধূলি-ভস্ম গায়ে, রৌদ্রে খর ঝঞ্ঝা-বায়ে
নগ্ন দেহ করবো বিসর্জন,
ঝম্‌-ঝম্‌-ঝম্‌ বাদল রেতে বৃষ্টি নেব মাথায় পেতে,
বজ্র বুকে করবো আলিঙ্গন ;
কাল-বোশেখীর প্রলয়-দোলায়, বিরাম-বিহীন শ্রাবণ-ধারায়,
কন্‌-কন্‌-কন্‌ মাঘ-পৌষের শীতে,
অনাবৃত থির-অচপল এক-আসনে অচল-অটল
আমায় মা তুই পার্‌বি চিনে নিতে?
মা কেন তুই ভাবিস্‌ মনে? ফির্‌বো ব্রত-উদ্‌যাপনে,
নতুন হয়ে ফিরবো তোরি কোলে,
খাইয়ে মধু, লতায়-পাতায় সাজিয়ে তখন দিস্‌গো আমায়,
পর-পর গয়না পর বলে!"

বাংলায় খদ্দর

"ঘর-ঘর-ঘর ঘোরাও চরকা,
ছেয়ে ফেল দেশ খদ্দরে,
বিলাতি পণ্য অশুচি-ঘৃণ্য
ছুঁয়ো না ইতরে-ভদ্দরে,"
সবাই মিলে এই কথা বলে
নাচ্‌রে বাঙালি ধিন্‌তাধিন্‌,
চালাকিতে কর্‌ কার্য হাঁসিল,
কথা কয়ে কর্‌ দেশ স্বাধীন ;—
স্বরাজ লাভের সরল পন্থা বাত্‌লে দিয়েছে গান্ধিজি,
তোরা শুধু তাই বক্তৃতা কর্‌ বাংলা এবং ইংরিজি।

উঠেপড়ে লাগ্‌ প্রচার-কার্যে,
বাজারে গর্বে দুন্দুভি ;
আসল কার্য চরকা ঘোরানো
আপাতত থাক্‌ মুলতুবি ;
ক্বচিৎ কোথাও এখানে-সেখানে
কিনেছে চরকা—সেইতো ঢের ;
খদ্দর গায়ে দেয় কেউ-কেউ,
'ফেলিওর' হলো বলবি ফের?
স্বরাজ লাভের সরল পন্থা বাত্‌লে দিয়েছে গান্ধিজি,
তোরা শুধু তাই বক্তৃতা কর্‌ বাংলা এবং ইংরিজি।

মারাঠি-উড়িয়া-গুজরাটি-শিখ্‌
ঘোরাক্‌ চরকা খুব কসে,
ভারত-মাতার তোরা হোস্‌ মাথা,
বক্তৃতা শুধু কর্‌ বোসে ;

তা বলে কি তোরা ভীরু-দুর্বল?
কাপুরুষ তোরা? কখনো নোস্‌ ;
সাক্ষী রয়েছে বোমার যুগের
আজিও জ্যান্ত বারীন ঘোষ ;
স্বরাজ লাভের সরল পন্থা বাত্‌লে দিয়েছে গান্ধিজি,
বক্তৃতা করে সেইটে শোনাস্‌ বাংলা এবং ইংরিজি।

আজিও বাঙালি তোদেরিতো ভাই
বুক ঠুকে ওই যায় জেলে,

যদি কেউ দোষে তোদের, অমনি
নজির সামনে দিস্ ফেলে ;
যে জাতিতে ওই জন্ম লইল
জিতেন-সুভাষ-সি আর দাস,
সে জাতি কখনো নহে হীন-হেয়
ঘোরাস চরকা নাই ঘোরাস ;
স্বরাজ লাভের সরল পন্থা বাত্‌লে দিয়েছে গান্ধিজি,
তোরা শুধু তাই বক্তৃতা কর্ বাংলা এবং ইংরিজি।

লুকিয়ে-চুরিয়ে বিলিতি দেদার
কিনিস্ ; বোঝে না গিন্নি যে!
একে তো তাদের হয় প্রাণান্ত
শুকুতে নিজের চুল ভিজে,
কেশেরি মতন বেশ যদি হয়
তদ্বির করে শুকুতে রোজ,
রান্না-বান্না করবে কখন?
নেবে বা কখন ছেলের খোঁজ?—
স্বরাজ লাভের সরল পন্থা বাত্‌লে দিয়েছে গান্ধিজি,
তোরা শুধু তাই বক্তৃতা কর্ বাংলা এবং ইংরিজি।

তা ছাড়া, বাঙ্গালি জাতটা প্রেমিক,
কেমনে প্রিয়ার শ্রীঅঙ্গে
সইবে সে মোটা-রুক্ষ বস্ত্র
বিশেষত এই-এ বঙ্গে?
তাই বলি মুখে মার মাল্‌সাট্,
ও সব তোদের কর্ম নয় ;
অন্য প্রদেশ যা করে করুক ,
তোরা শুধু কর বাক্যি ব্যয় ;
স্বরাজ লাভের সরল পন্থা বাতলে দিয়েছে গান্ধিজি,
বক্তৃতা করে শোনাস্ সেইটে বাংলা এবং ইংরিজি।

খদ্দরধারী স্বদেশপ্রেমিক
যদি কোন বীর মস্তরে,
খোঁটা দিয়ে কয়—এ কি হে বন্ধু!
আজিও বিলাতি বস্তরে!
"মান্ধাতা-যুগে কেনা ওটা দাদা"
বেমালুম সাফ্ দিস জবাব,

বেগতিক গোছ দেখবি যেখানে
মিথ্যে সেখানে কওয়াই লাভ ;
স্বরাজ লাভের সরল পন্থা বাত্‌লে দিয়েছে গান্ধিজি,
তোরা শুধু তাই বক্তৃতা কর্‌ বাংলা এবং ইংরিজি।

হাতে-নাতে ধরা পড়িস্‌ নেহাত
পিছলে কখন হড়কেরে,
ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বেকুবের মতো
যাস্‌নে যেন সে ভড়কেরে ;
বলিস—"মোদের স্বরাজ-সাধনা
অশনে-বসনে বদ্ধ নয়,
গোলা-গুলি-বোমা—ইহারো উপরে,
খাঁটি বেদান্ত ইহাতে রয়!"
স্বরাজ লাভের সরল পন্থা বাত্‌লে দিয়েছে গান্ধিজি,
তোরা শুধু তাই বক্তৃতা কর্‌ বাংলা এবং ইংরিজি।

ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর

ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর—অগ্নির বৃষ্টি—
জ্বলে-পুড়ে গেল বুঝি ব্রহ্মার সৃষ্টি!
ওরে মেঘ জল ঢাল্‌, প্রাণ কর্‌ ঠাণ্ডা,
ফুটি-ফাটা দুনিয়াটা, গেল তার জান্‌টা!
আম খেয়ে কাজ নেই, ঘামে খাবি খাচ্চি ;
কাঁটালের কত রস খুব কসে পাচ্চি :
রগ করে টিপ্‌টিপ্‌, নাড়ি নেই নাড়িতে ;
সাধ হয় ডুবে থাকি কুল্পির হাঁড়িতে ;
পাড়ি দিই একদম্‌ লম্বা সিম্‌লে!
পয়সার খাঁক্‌তি ; টিকিট না কিনলে,
পথে ধরে, করে দেবে ইজ্জত নষ্ট!
নচেৎ কি সইতেম এতখানি কষ্ট?

ছেলে-বুড়ো কাতরায়, সাঁতরায় ঘামেতে,
কী করবে আনারস-জামরুল-জামেতে?
হাড়-মাস ভেজে-ভেজে সাঁতলে যে তুল্লে
আগুনের হল্‌কায়, জানলাটি খুল্লে!

'বরফ' 'বরফ' করে প্রাণ-পাখি হাঁকরায়,
তাই কি সুবিধে বাপু? পাঁচ-সিকে-দাম চায়!
তদুপরি কন্-কন্-ঝন্-ঝন্বন্ত
নড়ো-নড়ো পড়ো-পড়ো যে কয়টি দন্ত
ঝুঁকে আছে, খুলে যাবে ঠাণ্ডা লাগলে,
রেখেছি অনেক করে আগ্‌লে-সাম্‌লে!

ফট্-ফট্ ঘোড়াগুলো রাস্তায় মরচে,
পাখিগুলো গাছে বসে ছট্-ফট্ করছে,
ধুঁকচে গরুগুলো বন্ধ গোয়ালে,
শুকিয়ে যায় জিভ আট্‌কে চোয়ালে ;
ঘর-দোর হল তেতে আগুনের খাপ্‌রা ;
জল লাগে বিস্বাদ, গরমের ভাপ্‌রা
উঠছে তাই থেকে, বাপ্‌রে! বাপ্‌রে!
পালিয়ে যাব কোথা? কী ভীষণ তাপরে!
সান্‌চে না সান্‌চে না খস্-খসে, ফ্যানেতে,
দেখিনি এমন তাত, কখ্‌খনো জ্ঞানেতে!
গল্‌গল্ ঘাম ঝরে কখনো বা বিন্‌বিন্,
বন্-বন্ মাথা ঘোরে, ক্ষীণ নাড়ি হল ক্ষীণ!

আন্ বেল্ পানা করে, মিছরির সরবত,
সন্দেশ-পানতুয়া লাগচে বিষবৎ!
দম্ গেল আটকে, হাঁস-ফাঁস, হাঁস-ফাঁস!
কোথা ডাব, তরমুজ, কচি-কচি তাল-শাঁস!
দুধ-ঘি-রাবড়ি ল্যাংড়া-বোম্বাই
চাই না গো চাই না, প্রাণ করে আই-ঢাই!
গায়ে-পিঠে বিঁধচে তপ্ত আল্‌পিন্ ;
ঘেমে-ঘেমে দুর্বল—গা-মাথা ঝিম্-ঝিম্!
ফেলে দাও বস্ত্র—সাজো দিক্-বসনে,
সিদ্ধিতে বুঁদ হয়ে ভজ ত্রিলোচনে,
কুচ্ নেই পরোয়া যদি সেই জন্য
বলে কেউ বর্বর কিংবা বন্য!

ডাকাতের গান

হারে রে রে রে রে!
ডরে মৃত্যুরে আর দ্বীপান্তরে
এমন মুর্খ কে রে!
রক্ত-নদীর টক্‌টকে জলে
মুক্তো-মানিক সোনা-রুপো ফলে,
কব্‌জির জোরে কল্‌জের বলে
লুটপাট করে নে রে!

হারে রে রে রে রে!
বিঘ্ন সতত কুকুরের মতো
পিছনে-পিছনে ফেরে
দৃক্‌পাত তিল করিনেকো তায়,
আপদ-বিপদ পথে-পথে ছায়,
মরিয়া আমরা মরিনে সে ঘায়,
মৃত্যু-বিজয়ী যে রে!

হারে রে রে রে রে!
যবে অম্বর-পথে ঘন তমিস্রা
বিশ্ব-ভুবন ঘেরে,
আলো করে দেয় জমাট আঁধার,
মশালের আলো শানা তলোয়ার,
দল বেঁধে সবে চলি সারে-সার
লাফ খেয়ে তুড়ি মেরে!

হারে রে রে রে রে!
এক পাও মোরা পিছপাও নই
যেতে দুনিয়ার টেরে!
যারা আমাদের তেড়ে আসে ত্রাসি,
খোড়-কুচি করে কেটে রেখে আসি,
গলা টিপে ধন-দৌলত-রাশি
জোর করে নিই কেড়ে!

হারে রে রে রে রে!
বাজিয়ে বিজয়-বিষাণ আমরা
ফিরি ঘরে কাজ সেরে!
প্রহরী-পাহারা-শাস্ত্রী তখন,
সুখে নিদ্রায় ঘুমে অচেতন,

রাত্তির জেগে প্রেয়সীর মন
ভাবনায় আছে ভেরে!

হারে রে রে রে রে!
রাজা-রাজড়ার মাস্তুতো ভাই
আমরা সবাই যে রে!
—মেজ সেজ ছোট মাস্তুতো ভাই—
সেকেন্দার-দাদা শুনে কথাটাই,
একেবারে চুপ, মুখে কথা নাই—
জবাবে ওঠেনি পেরে!

হারে রে রে রে রে!
ধর্মের মানা নীতির দোহাই—
শুন্‌ছে পাগল কে রে!
খালি পেটে যবে কেটেছিল রাত—
ছেলে-মেয়ে নিয়ে, একমুঠো ভাত—
কেউ দিয়েছিল? পেতেছিনু হাত—
লাঠি-তলোয়ার ছেড়ে!

হারে হা রে রে রে রে
সোনার কেল্লা বানারে তোমরা—
রুপোর পাহার ঘেরে!
আঙুর বেদনা পেস্তা মেঠাই—
আতর গোলাপ তোমাদেরি চাই!
আমাদের খেতে ছুঁতে নিতে নাই—
ফাঁসি-কাঠে ফেল ফেঁড়ে!

হারে রে রে রে রে!
করবো দুনিয়া সুরকির গুঁড়ো
নতুন বনেদ গেড়ে!
ধনী-মহাজন-প্রাসাদের ইটে—
গরিবের হবে অসংখ্য ভিটে—
নিঃস্বও পাবে টাকাটা-সিকিটে
সিন্ধুক-ধুলো ঝেড়ে!

হারে রে রে রে রে!
সংসার-মাঝে বহ্নির শিখা—
ক্রমে জ্বলে ওঠে বেড়ে?

আমাদের মিছে দাও অপবাদ—
—এ চির স্বর্ণ-লৌহ বিবাদ—
ছাপাছাপি নদী ভাঙবেই বাঁধ,
যাও যত তাকে তেড়ে!

বোনে-বোনে

দিদি লো আজ দুপুরবেলায় বসচে না মন পুতুলখেলায়,
তোর কাছে তাই দৌড়ে এলুম ছুটে ;
থাকুক এখন পশম বোনা, একটা আমার গল্প শোনা
এখনই মা ডাকবে জেগে উঠে!
বাঁধতে খোঁপা সাতগুছিতে কি করে হয় শিখিয়ে দিতে
শিখিয়ে দিতে তুলতে লেসে ফুল,
সাধচি তো আজ কদিন ধরে, আজ হবে কাল হবে করে
প্রতিদিনই বলিস হলো ভুল!
এই এখনি ছাতে গিয়ে দেখে এলুম লাটাই নিয়ে
ছোড়দা ওড়ায় বেগ্‌নি রঙের ঘুড়ি ;
একবারখানি লাটাইখানা চাইলুম হাতে, বল্লে না না ;
উল্টে আমার ভাঙলে কাচের চুড়ি!
আসুক বাবা আপিস থেকে, সকল কথা বলবো ডেকে ;
রোদ্দুরেতে ঘুড়ি উড়িয়ে খেলা!
চুড়ি ভাঙার মজা কেমন টেরটি বাবু পাবেন তখন,
টো-টো কবে ঘোরা দুপুরবেলা!
যাক দিদি তোর মনে আছে? বলছি তোরে ভুল হয় পাছে,
এবার আমার পুন্যি-পুকুর ব্রত ;
সেঁজুতি আর হরির চরণ নেব আমি করেছি মন,
বলতে পারিস আজকে মাসের কত?
এখন আমায় গল্প শোনা, কালকে হবে পশম বোনা,
তোর কাছে ভাই দৌড়ে এলুম ছুটে ;
আজকে কেন দুপুরবেলায় বসচে না মন খেলায়-ধুলায়,
পড়চে যেন কিসের ভারে লুটে!
হ্যাঁ দিদি সেই বলছিলি যে, যেদিন জলে একগা ভিজে
জামাইবাবু এলেন নিয়ে ছুটি ;
তোদেরো সেই বিয়ের রাতে, পাগলি মেয়ে বর্ষা মাতে,
আকাশ ভেঙে করচে ছুটোছুটি!

মেঘের গুরু গরজনি, হুলুর রব আর শাঁকের ধ্বনি,
অশান্ত প্রাণ তুল্লে আকুল করে!
ঝম্ ঝম্ ঝম্ বৃষ্টিধারা অবিশ্রান্ত বাঁধন-হারা
আশীর্বাদের মতন শিরে ঝরে!
হ্যাঁ দিদি তোর পড়চে মনে শুভদৃষ্টির মিলন-খনে?
কাঁপলো নাকি আঁখির পাতা দুটি?
বাসর-ঘরে বরের পাশে কাঁপলো না বুক লজ্জা-ত্রাসে?
পড়লোনাকো হৃদয়খানি টুটি?
ও দিদি তুই বল না মোরে, বাড়িয়ে দিলি কেমন করে
আলতা-পরা পা দু-খানি তোর?
সত্যি-সত্যি নিজের হাতে জামাইবাবু লিখল তাতে,
রইবে গোলাম চির-জীবনভর?
সুরের গাঙে ছুটিয়ে দে বান্ জামাইবাবু গাইলে কি গান?
পড়ছি পায়ে লক্ষ্মীটি তুই বল,
কানদুটি তার মল্লে যখন লাগলো কি তোর ব্যথা তখন?
সত্যি বলিস করিসনেকো ছল।
কর্মবাড়ির হৈ-হৈ-হৈ, চারদিকে লোক থৈ-থৈ-থৈ,
লে আও লুচি, দাও পাতে দই-ক্ষীর ;
দিদি লো তোর লাগল ভালো ফুলের মালা বাজ্‌না-আলো,
বাসর-ঘরে পাড়ার মেয়ের ভিড়?
একগা সোনার গয়না গায়ে, টক্‌টকে দুই আলতা পায়ে,
পরনে তোর বেনারসীর চেলি,
লালসুতোর সেই রাখী হাতে, অচেনা সেই বরের সাথে,
ও দিদি তুই কেমন করে গেলি?
গেলি দিদি কেমন করে, অচেনা মুখ পরের ঘরে!
ভয় হলনা একটুখানি তোর?
সেই সে শুভমিলনখনে বিদায় দিতে আপনজনে,
টস্-টস্-টস্ ঝরল আঁখিলোর?
হ্যাঁ দিদি তোর প্রথম-প্রথম ঘোমটা দিতে হতে না ভ্রম?
মাথার কাপড় দেওয়া সে কি জ্বালা!
আমি কিন্তু পারবো না তা কাপড় দিয়ে ঢাকতে মাথা,
বিয়ের সবি অনাসৃষ্টির পালা!
এখন তো তুই অসংকোচে মুখে যখন যেমন রোচে
বলিস দিদি জামাইবাবুর সাথে ;
তখন কি তোর লজ্জা হতো? খেতিস ভয়ে থতমত?
বলতে কথা বাধত প্রতি হাতে?

একটি কথা ; বলে সবাই শ্বশুরবাড়ি কঠিন সে ঠাঁই
ক্ষিদে পেলেও বলতে নেই যে খাব ;
ননদ সেথা কথায়-কথায় ঝেঁক্‌রে ওঠে রাগের মাথায়,
বল না দিদি কেমন করে যাব?

ঘুমপাড়ানি গান

নীল আকাশে কাঁপন তুলে অলস সুরে ওই—
ডাক্‌ছে পাখি 'ফটিক জল'—'ফটিক জল' কই?
আতা-গাছে তোতা-পাখি, ডালিম-গাছে মউ ;
ঘরের কোণে লুকিয়ে বসে লিখচে চিঠি বউ ;
মনের মতো হয় না চিঠি, দেড়টা বেজে যায়,
মার বুঝি ওই খাওয়া হল,—চম্‌কে ফিরে চায়!
ঘুম-পাড়ানে সুরের টানে যাচ্ছি কোথা ভেসে ;—
ছেলে ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো বর্গী এলো দেশে!

এলিয়ে দিয়ে শুকোয় ভিজে মেঘের মতো চুল,
ছাদের পরে কাদের মেয়ে—কানে মোতির দুল?
তাস-খেলাতে বারান্দাতে লীলা মাদুর পাতে,
বলচে বীণা—না, না, না, না, ঘুম হয়নি রাতে।
এই কথা নে রঙ্গ-ভঙ্গ ছুটলো হাসির রোল,
হালকা হাওয়ার পান্‌সি যেন একটুকু খায় দোল।
সুরের জরি বুন্‌চে পরী আ মরি, সেই কে সে!
ছেলে ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো, বর্গী এলো দেশে!

গাঁয়ের পথে উড়িয়ে ধুলো গোরুর গাড়ি চলে,
বাবুদের ঝি বাসন মাজে খাঁ-পুকুরের জলে,
পেয়ারা-ডালে দুলিয়ে দোলা খায় ছেলেরা দোল,
ইস্‌কুলেতে পড়ছে যারা তাদের ঘাড়ে জো'ল!—
দশমিকের-ত্রৈরাশিকের—শিশুহত্যার কল,—
সরস্বতী আঁচল দিয়ে মোছেন চোখে জল!
ভগ্ন-অংশ একটি গানের লাগছে কানে এসে,
ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো বর্গী এলো দেশে!

দুধের বাটি ঝিনুক দিয়ে বাজ্‌না বাজায় কে গো!
দুষ্টু ছেলে দুধ পাবে না, ভুলিয়ে তাকে দে গো!

উঠবে ছেলে পাশের ঘরে শব্দ করিস্‌নে ;
এই শুয়েচে, কাঁচা-ঘুমে জাগিয়ে তুলিস্‌নে!
বামুন-দিদি কয়েদ করে আনচো কাকে ধরে?
কচ্ছিল চোর আচার-চুরি লুকিয়ে ভাঁড়ার-ঘরে?
বয়েস হলে দেখচি ওটা ডাকাত হবে শেষে ;
ছেলে ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো, বর্গী এলো দেশে!

মায়ের মুখে প্রথম আমি শুনেছি এই তান,
আজ্‌কে কোথা সে মা আমার, মায়ের মুখের গান!
এমনিতর দুপুর-বেলা কোলের কাছে শুয়ে,
শুনেছি গান-গল্প কত মুখটি বুকে থুয়ে,—
বেগুন চুরি করতে গিয়ে ফুটলো কাঁটা নাকে,
কাক্কাহুয়া করে শেয়াল, নাপিত-ভায়া ডাকে!—
সুখের স্মৃতি দুখের ব্যথা এক-সুরেতে মেশে,
ছেলে ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো, বর্গী এলো দেশে!

হারিয়ে গেছে কোথায় আমার হট্টমালার দেশ—
আদর-স্নেহ শৈশবেরই স্বপ্ন-অবশেষ।
চল্‌তে পথে নেইকো যে আর আম্র-বাগানের ছায়া,
মাছের কাঁটা ফুটলে পায়ে দোলায় চেপে যাওয়া,
ঘুম-পাড়ানি মাসিপিসি তারাও গেছে মরে ;
শান্তি-সুখের ঘুমটি আমার দেয় না চোখে ভরে।
নতুন করে লাগচে কানে পুরোনো সুর এসে,—
ছেলে ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো বর্গী এলো দেশে!

এম্‌নিতর দুপুর-বেলা গাইত সে মোর প্রিয়া
ঘুম-পাড়ানি হাজারো গান খোকায় কোলে নিয়া,
বাজ্‌তো ছ-টি সোনার চুড়ি ঝিনিক্‌-ঝিনি-ঝিন্‌—
তেমনিতর মিষ্টি গান শুনিনি কোনোদিন!
সে মোর প্রিয়া নাহিকো আজ, নাহিকো সেই গান ;
কাঁদচে দুটি আকুল শিশু—আকুল দুটি প্রাণ!
আর কে তাদের ঘুম পাড়াবে ভুলিয়ে ভালোবেসে?
ছেলে ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো, বর্গী এলো দেশে!

ঘুমোয় ছেলে, জুড়োয় পাড়া, জুড়োয়নাতো বুক—
পড়ছে মনে একশোবারি হারিয়ে-যাওয়া মুখ!
আকাশ থেকে চাঁদকে ডেকে, আর কে ধরে দেবে?
দুধ খাইয়ে পরিয়ে কাজল আর কে কোলে নেবে?

যৌবনেরো সোনার পুতুল খেলা না শেষ হতে
খোয়া গেল, শূন্যহৃদয় ফিরছি পথে-পথে!
আঁধার হেরি চারদিকেতে খুঁজে না পাই দিশে—
বুল্‌বুলিতে ধান খেয়েছে, খাজ্‌না দেবো কিসে?

স্মরণে*

এই সেদিনে দেখে এলুম দিব্যি তোমায় সুস্থ-সবল,
আজকে হঠাৎ শুনি, তুমি নাই!
পরপারের ডাক এসেছে—পাইনিকো তার একটু আভাষ,
মনে-মনে সন্দেহ হয় তাই—
আবার যদি যাই কোনোদিন কর্মশ্রান্ত সন্ধেবেলা
'ভারতী'র সেই উপর-তলার ঘরে,
হয় তো তোমার দেখতে পাব, যেমনটি ঠিক্ ছিলে তেমন
হাসচো হাসি, কইচ মৃদুস্বরে!
বক্‌চে 'বুড়ো' এটা-সেটা, হেমেন্দ্র সে পুরুফ নিয়ে,
মণিলালের উড়চে ধোঁয়া মুখে,
সৌরীন্দ্র খাচ্ছে হাওয়া, তক্তপোষের উপর আমি
শুনচি কথা উপুড় হয়ে ঝুঁকে,
ভাবচি মনে কেমন করে এরা এমন লেখে ভালো
বিশেষত ওই মানুষটি—যার
ম্যাজিক-কলম টেক্কা দিলে একেবারে সবার উপর,
ফুটিয়ে ফুলের ফসল চমৎকার!

সত্যি ওগো সত্যি তুমি ভেল্কি-বাজি লাগিয়ে দিলে,
শব্দ নিয়ে খেল্লে ছিনিমিনি,
কী বিচিত্র সুরে-ছন্দে নাচিয়ে দিলে বাংলা ভাষায়!
তোমার কাছে রইল চির-ঋণী।
দেশ-বিদেশের কবির লেখা বাংলা সুরে ছন্দে ভরে
করলে হাজির বঙ্গবাণীর দ্বারে,
মুগ্ধ মোরা অবাক তোমার অনুবাদের কায়দা দেখে,
কেউ পারে না ঘেঁসতে তোমার ধারে!
সত্যি ওগো সত্যি তুমি 'সুরের ফুলের ফুলঝুরিতে'

---

*কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরলোক গমনে।

মাতিয়ে দিলে বাংলা দেশের হাওয়া,
ঝুটো-মেকির চির-শত্রু সবুজ প্রাণের অবুঝ কবি
তোমার মতো আর কি যাবে পাওয়া?
স্মৃতির শাসন মনুর বচন মানলেনাকো তোমার বাঁশি,
শুনিয়ে দিলে মুক্ত হাওয়ার গান,
শুনিয়ে দিলে সেই সে বাণী মানুষ যাতে বাঁধন ছিঁড়ে
পায় ফিরে তার হারিয়ে-যাওয়া প্রাণ!

ওগো কবি তোমার লেখা লাগ্‌তো আমার বড়ই মিঠে,
মাসিক কাগজ প্রকাশ হলেই তাই,
সদ্য-ফোটা ফুলের মতো তোমার টাটকা লেখা কোনো
কী আগ্রহে খুঁজতুম, যদি পাই!
বৃথা এমন সে কল্পনা—খানিক বেজেই ভাঙলো বাঁশি!
এমন হবে হঠাৎ কে তা জানে!
এখন তুমি কোন্ ঠিকানায় বুঝতে নারি, তাকিয়ে আছি
আকুল চোখে চেয়ে আকাশ-পানে।

যদি সে

যদি সে ফিরে এসে, আবার ভালোবেসে
আমার মুখ-পানে চায়!
পুরোনো দুটো কথা, গোপন মন-ব্যথা,
আমার কানে কয়ে যায়!
যদি সে জেগে উঠে সহসা আসে ছুটে
চমকি দেয় দু-নয়ন!
দু-খানি বাহুডোরে বাঁধিয়া রাখে মোরে,
আদরে ভরে ত্রিভুবন!
যদি সে অনুপম মু'খানি প্রিয়তম,
মুরতি মনোরম তার,
মাধুরী উছলিয়া জীবন উজলিয়া,
জীবনে আসে একবার!
—দালিম-ফেটে-পড়া, গোলাপি-হাসি-ঝরা,
অমিয়-দিয়ে-গড়া মুখ!
ডাগর কালো আঁখি চপল দুটি পাখি,
শীতল স্নেহ-ভরা বুক!—

যদি সে অনুরাগে, রঙিন ফুলে-ফাগে,
নবীন করে ফিরে প্রাণ!
সুরভি-কুসুমিত, জোছ্না-পুলকিত,—
গাহে সে পরিচিত গান!
দারুণ অভিমানে সজল দু-নয়ানে
যদি সে আসে পুনরায়!
বচন বাধো-বাধো মু'খানি কাঁদো-কাঁদো
যাতনাহত বেদনায়!
যদি সে লীলাভরে মুখে না হাসি ধরে
আমোদে ভরে চারিদিক,
তেমনি পাশে এসে তেমনি কাছে ঘেঁসে
দাঁড়ায় তেমনিটি ঠিক!
বসন-অঞ্চলে মুছায় আঁখিজলে,
ভুলায় কত ছলে আর!
ছ-গাছি চুড়ি বাজে রহিয়া মাঝে-মাঝে
নরম দুটি হাতে তার!
"কেমন! আছ ভালো? হয়ে যে গেছ কালো,
না দেখে এই কটা মাস ;
এই যে আমি এই! তোমারি প্রিয় সেই!
বঁধু গো নহে পরিহাস!
দ্যাখ না দ্যাখ চেয়ে!" বলে সে চুমা খেয়ে
—অমৃত মিঠে নহে ততো—
যদি সে বাহু-ডোরে বাঁধিয়া ফেলে মোরে
আদর করে শত-শত!
যদি সে এলোচুলে কাঁকন বাহুমুলে
ছেলেকে কোলে তুলে কয়—
"চাহিয়া দ্যাখো দেখি, বাছার হয়েছে কি!
স্নেহের এই পরিচয়?"
মুখরা সে আমার যদি সে একবার
· আমার কাছে ফিরে আসে!
কঠিন বলে কথা জুড়াতে মন-ব্যথা
আবার ফিরে ভালোবাসে!
বৃথা এ মনো-আশা সেজন ফিরে আসা
পিপাসা পড়ে রবে খালি!
মলিন চিতা-ধূমে কঠিন মরুভূমে
কেবলি বালি আর বালি!

পাখি না গাহে গান চাঁদের আলো ম্লান
কুসুমে পরিমল নাই!
দখিনে বাতাসেতে আর না উঠি মেতে
উড়িছে ছাই আর ছাই!

ভিখিরি

একাকী সহায়-সঙ্গতি-হীন,
দ্বারে-দ্বারে-দ্বারে ফিরি প্রতিদিন,
মাগিয়া ভিক্ষা ছিন্ন-মলিন
বসনে ;

কেহ দেয় কিছু করুণা করিয়া
কেহ যায় দূরে ঘৃণায় সরিয়া,
অপমানে যাই মরমে মরিয়া ;
নয়নে

উথলিয়া ওঠে অশ্রুর ধার,
প্রাণে ব্যথা বাজে লাগে ধিক্কার,
কেন গো মরণ—ভিখিরি যে—তার
হয় না?

হয় না মরণ, কী কঠিন জান!
এত লাঞ্ছনা, এত অপমান
সয়ে বেঁচে আছি, আর ভগবান
সয় না!

দেখে মোরে লোকে সন্দেহে চায়,
থালা-ঘটি-বাটি ভয়ে সামলায়,
চলে গেলে তবু পিছনে তাকায়
পিছনে ;

ঘুরে-ফিরে পাছে আসি যদি আমি,
চুরি করে নিই কোন কিছু দামি,
ঘড়ি কি আংটি সোনার বোতামি
বিজনে ;

উপবাসী থেকে শুধু খালি পেটে
কত দিন-রাত যায় মোর কেটে,
ঝর-ঝর জল পড়ে আঁখি ফেটে,
তবুও

হয় না মরণ, কী কঠিন জান!
তুমিও কি ফেলে দিলে ভগবান?
মুছিবে না জ্বালা—পাব না কি ত্রাণ
কভুও?

হাত-পা রয়েছে খেটে-খুটে খাও,
কেন দিক্ কর, মিথ্যে জ্বালাও?
হবে না এখানে পাই-পয়সাও—
বলিয়া

কত-শত-জন দ্যায় হাঁকাইয়া,
কর্কশ স্বরে ঘাড় বাঁকাইয়া,
আসি তাহাদের পানে তাকাইয়া
চলিয়া।

হয়েছে ওষুধ, ভিখ দিতে নাই—
এইরূপ শুনি কত অছিলাই;
ধনীর দুয়ারে যদি কভু যাই
মাগিতে,

আধা-বাংলায় আধা-হিন্দিতে,
দরোয়ান খাড়া থাকে গালি দিত
লাঠি দেখাইয়া বলে ইঙ্গিতে
ভাগিতে।

হয়েছি পথের কাঙাল এখন,
চিরকাল কিছু ছিল না এমন,
ঘর-সংসার প্রিয়-পরিজন
ছিল গো।

ছিল গো সকলি যমে নিল লুটে,
জমি-জমা-জোত দেইজীতে জুটে
করে ছারখার দিল ছিঁড়ে-কুটে,
দিল গো!

এই আমারেও বাবা-বাবা বলে
আসিত ছুটিয়া ঝাঁপ দিয়া কোলে
সোনার পুতলি ; উবে গেল গলে
বাতাসে!

এই আমারেও ছিল একজন,
সঁপেছিল তার তনু-প্রাণ-মন,
হায় সে আমার কোথায় এখন?
কোথা সে!

ছিনু বাপ-মার আদরের ছেলে,
কেটেছিল কাল শুধু হেসে-খেলে,
প্রজাপতিসম খালি ডানা মেলে
উড়েচি

ফুলে-ফুলে-ফুলে পাতায়-পাতায়,
নেচেছি হাসির ঢেউয়ের মাথায়,
এবে নিয়তির চাকায় তলায়
পড়েচি।

ভাগ্যহীন ও লক্ষ্মীছাড়ার
শুনিবে কাহিনী? কী শুনিবে আর?
জেনে রেখো এই দুনিয়ার সার—
রুপিয়া!

ও চিজ্ তোমার থাকিলে প্রচুর,
হবে না অভাব কভু বন্ধুর,
লইবে তোমারে হাসিয়া মধুর
লুফিয়া!

নচেৎ তোমারে পায়ের তলায়,
খেঁত্‌লাবে সবে দারুণ হেলায়,
একফোঁটা জল মরে যাও ঠায়,
পাবে না,

আর জেনো এই মানব-প্রণয়
পুরোপুরি ঝুটো, খাঁটি অভিনয়!
কেউ তারে, যারে ভাগ্য নিদয়,
চাবে না!

একেবারে আমি দাঁড়াইনি পথে,
ক্রমশ ভেসেচি অবনতি-স্রোতে,
চেষ্টা করেচি যদি কোনমতে
অকূলে

কূল পেতে পারি কারেও ধরিয়া,
সবাই গিয়াছে ঘৃণায় সরিয়া,
ডেকেচি কাঁদিয়া কাতরে সাধিয়া—
নে ভুলে!

কতবার মনে ভাবিয়াছি তাই,
ভিখিরির ঠাঁই দুনিয়ার নাই,
জঞ্জাল তারা আপদ বালাই
সমাজে ;

অতএব দাও তাদের পুলিশে,
চর্মে তাদের কালো মিশ্‌মিশে
যাবতীয় রোগ-বীজাণুর বিষে
ভরা যে!

কতবার মনে ভাবিয়াছি, চুরি
করি কারো টাকা বুকে মেরে ছুরি,
ধর্মাধর্ম নেইকো কিছুরি
ভিত্তি ;

নেই ঈশ্বর, নেই পরকাল,
প্রহেলিকা এই সৃষ্টির জাল,
অন্ধ জড়াণু-রচিত বিশাল
পৃথ্বী!

ক্ষমিও না প্রভু, ক্ষমিও না মোর
তোমা 'পরে এই সন্দেহ ঘোর,
চুরি-না-করিয়া-মনে-মনে-চোর
পাপীকে,

দাও গো শাস্তি যত তুমি পারো,
মেরেছ তো প্রভু, আরো মারো, আরো,
আমিই হারি কি তুমি প্রভু হারো
দেখি কে!

চাঁদের আলোয়

হাওয়ায়-কাঁপা বকুল-চাঁপা আন তুলে,
রেশমি-কালো মিশ্‌মিশে ওই পর্‌ চুলে ;
সুর্‌মা এঁকে চোখদুখানি কর্‌ কালো,
মেঘের কোলে বিজ্‌লি যে লো দ্যায় আলো!
ছুপিয়ে নে তোর পাতলা শাড়ি নীল রঙে,
ভুলিস্‌নে পায় আলতা দিতে ভুলক্রমে,
সোনার হাতে সাজ্‌বে সরু জল-চুড়ি,
ফুলঝুরি লো ওলো রূপের ফুলঝুরি!

এইবেলা চল্‌ বেলাবেলি যাই ছাতে,
উঠবে যে চাঁদ সকাল-সকাল আজ রাতে ;
টিপ্‌ দিতে যে ভুল করেছিস্‌, দূর বোকা!
ছোট্ট করে টিপ কেটে নে—কাঁচ-পোকা,
এলাচ দিয়ে পান্‌ খেয়ে নে একখিলি ;
লাল রঙ আর লাল ঠোঁটে তোর নাই দিলি!
মাথা বরং গালটি নরম একবারে
টাট্‌কা-তোলা ফুল-পরাগের পাউডারে!

হীরের বালা মোতির মালা ঝক্‌মকে—
নেই বলে কি কাঁদবি সখি সেই শোকে?
দুধের মতো উথলে-ওঠা জোছনা,
সোনার জলে আঁকবে গায়ে আল্পনা!
পরীরা সব দেখবে তোরে চোখ চেয়ে—
উপচে-পড়া রূপখানি তোর দিক ছেয়ে ;
মলয়-অনিল করবে পাখা হর্‌-ঘড়ি,
অপ্সরী লো ওলো আমার অপ্সরী!

উঠবে লো চাঁদ সকাল-সকাল,—চল্‌ ছাতে,
কইতে আছে অনেক কথা আজ রাতে ;
প্রেমের কথা একটিও সই তুল্‌বো না,
নিবিড় কালো কেশের রাশি খুল্‌বো না,
নেহাত যদি ভুল করে সই ভুল করি,
গোস্তাকিটা মাপ করিস্‌ লো পায় ধরি ;
তোর মুখেতে চাঁদের সুধা পান করে
ইচ্ছেটা হয় চাঁদের আলোয় যাই মরে!

পথ-হারা

পথ-হারানো পথিক আমি
এলেম তোমার দ্বারে,
আকাশ মেঘে ঘনিয়ে এলো
নিবিড় অন্ধকারে!
আস্‌চে উড়ে জোলো-হাওয়া,
শিউরে ওঠে শিউলি-ছায়া,
দুখানি চোখ পথ-চাওয়া
তাকায় বারে-বারে
আমি এলেম তোমার দ্বারে!

মাথার থেকে সূর্য আমার
কখন গেছে ডুবে,
নেইকো আলো একটি ফোঁটা
পশ্চিমে কি পুবে,
থাম্‌লো কুহু বাজ্‌লো কেকা
সোনার জলের চিত্র-লেখা
মুচলে কালো কাজল-রেখা—
আকাশ দিল ছুবে :
গেল সকল আলো ডুবে!

দুয়ার খোলো দুয়ার খোলো,
পড়্‌ছি ভারে নুয়ে,
মাথার বোঝা নামিয়ে রাখি
চরণখানি ছুঁয়ে,
তুচ্ছ আমি নেহাত হেয়,
ঠাঁই দিলে না কোথাও কেহ,
ক্লান্ত চরণ অবশ দেহ,
আছ্‌ড়ে মরি ভুঁয়ে
আমি পড়ছি ভারে নুয়ে!

বেরিয়েছিলেম নবীন উষায়
সুদিন-সুখন দেখে,
সঙ্গী-সাথী ছিল অনেক—
পড়্‌চে মনে কে-কে ;
ঝট্‌কা হাওয়া লাগলো জোরে,
ফুলের গেল পাপড়ি ঝরে,

রাখনু যাদের আদর করে
বুকের পরে ঢেকে—
তারা কোথায় গেল কে-কে!

ছড়িয়ে দিয়ে পথের মাঝে
হীরের মতো হাসি,
কয়েছিল কে কানের কাছে—
'তোমায় ভালোবাসি',
অশ্রুজলের মুক্তা-পাঁতি
দিয়েছিল সে বক্ষে গাঁথি,
আদর-স্নেহ যূথী-জাতি
কুসুম রাশি-রাশি,
ওগো আমায় ভালোবাসি!

ফুট্‌লো কাঁটা পায়ে কখন
উপহাসের মতো,
বিঁধলো বুকে অপমানের
আঘাত শত-শত,
দুখের বোঝা বইনু সুখে,
রক্ত-নদী ছুট্‌লো বুকে,
জল দিলে না কেহই মুখে,
ডাকনু আমি কত!
সে যে বাজলো ব্যথার মতো!

নিবিয়ে ফুঁয়ে আলোর কুঁচি—
জোনাক্ পোকার সারি,
ঝাপ্‌টা মেরে ঝোড়ো বাতাস
আস্‌চে জোরে ভারি,
নীরব ঘন আঁধার-তলে
তোমারি গৃহে প্রদীপ জ্বলে,
যদি তোমার দুয়ার খোলে.
শরণ পেতে পারি ;
ওই ঝড় এলো গো ভারি!

দুয়ার খোলো দুয়ার খোলো—
ডাকচি বারে-বারে,
পথ-হারানো শ্রান্ত পথিক
এলেম তোমার দ্বারে!

জিভ্ মেলিয়ে আলেয়া ডাকে
শালগাছের ও বনের ফাঁকে,
নিশাচর ওই শৃগাল হাঁকে
দারুণ অন্ধকারে,
আমি এলেম তোমার দ্বারে!

ভারি নিষ্ঠুর!

চাঁদপানা মুখখানা ঢেকে মেঘলায়,
কার পথ চেয়ে সখি বসে জান্‌লায়?
সারারাত জেগে চোখ করে কর্-কর্,
সইচে না গায়ে তিল বাতাসের ভর,
ফিকে হয়ে গেল গালে গোলাপের রঙ,
কি জানি কি ভাব্‌নায় বুক ছম্-ছম্,
জমা-করা বাসি ফুল দাও করে দূর,
এলো না সে, এলো না সে ভারি নিষ্ঠুর!

এত করে ধরে-ধরে বাঁধ্‌লি যে চুল!
পাতা কেটে টিপ এঁকে কানে দিলি দুল!
জাম-রঙ শাড়িখানি জরি-দেওয়া পাড়,
আর কেন পরে সখি মিছিমিছি?—ছাড়্ ;
সরু করে টেনে দেওয়া সুর্‌মার দাগ
জলে ভিজে মুছে গেল ; উঠে যায় যাক্,
কাঁদ-কাঁদ মুখখানি বেদন-বিধুর,
এলো না সে, এলো না সে ভারি নিষ্ঠুর!

ঢং-ঢং ঘড়ি বাজে বেড়ে যায় রাত,
গাড়ি যায় রাস্তায, বুক করে ছাঁত,
একবার খাটে আর মেঝে একবার,
থেকে-থেকে মুখখানি মনে পড়ে তার,
ঠেলে ওঠে চোখে জল সাম্‌লানো দায়—
কখনো বা অভিমানে কভু শঙ্কায় ;
ম্লান হয়ে এলো আলো শরদিন্দুর,
এলো না সে, এলো না সে ভারি নিষ্ঠুর!

কত সুখ ছিল সখি, মনে-মনে কাল!
লাল হাসি ফেটে পড়ে রাঙা দুটি গাল!
কি কথা সে কয়েছিল গেয়েছিল গান,
তোলপাড় বুকময় সারা দিন্-মান!
খনে-খনে আর্শিতে দেখছিলে মুখ
যদি কোনোখানে কোনো থাকে ভুলচুক,
জ্বল্-জ্বল্ জ্বলে সরু সিঁথিতে সিঁদুর,
এলো না সে, এলো না সে ভারি নিষ্ঠুর!

আজই ডাকে এক্ষুনি চিঠি লিখে দাও—
—এসে দুটি পায়ে ধর যদি ভালো চাও—
না, না, সখি গুম্ হয়ে করে থাকো মান,
দেখই না আছে কিনা আছে তার টান!
ফাঁদে ধরা দিয়ে পাখি যাবে কোথা আর?
সাত দিন গেলেই তো ফিরে শনিবার,
এই কটা দিন কি লো সবে না সবুর?
এলো না সে, এলো না সে ভারি নিষ্ঠুর!

ওঠো সখি, মুখ ধোও, মোছ আঁখি-নীর,
মনে-মনে ঠাওরাও একটা ফিকির—
অবাধ্য বঁধু যাতে সায়েস্তা হয়,
আশ্কারা এতখানি দেওয়া ভালো নয় ;
কখনো বা নোল দিলি, কখনো বা রাশ
রাখবি লো কসে টেনে যদি ভালো চাস্ ;
পিরীতির এই রীতি এই দস্তুর,
এলো না সে, এলো না সে ভারি নিষ্ঠুর!

বিরহে

তোমারি স্মৃতি তোমারি ছবি মরমে রাখি আঁকিয়া,
বিরহে নিতি কী সুখ লভি জানিতে তা কি হে প্রিয়া?
নয়নে বারি ঝরে না কভু কহিনে কথা এ হেন,
বোঝাতে নারি আঁখিরে ; তবু প্রাণের সে ব্যথা কে যেন
অমিয় ঢালি সুরভি করে— সুখেরি মতো লাগে সে,
স্মরণে খালি মাধুরী ঝরে স্বপনাহত আবেশে!

পরানে-মনে ফুটিয়া ওঠে অযুত যূথী মালতী,
সে ফুলবনে মধুপ ছোটে করিয়া স্তুতি বিনতি,
মুখানি তব নয়নে মম কুহেলি ঘন হরিয়া
পউষে নব চাঁদিনী-সম উজলে মন ভরিয়া,
চমকি ফোটে দীপালি লাখো বাজে কী মধু রাগিণী,
জাগিয়া ওঠে যেখানে থাকো তোমারি বঁধু কাহিনী!

কাঁকনে বাজে রিনিকি-ঝিনি আসিয়া পশে শ্রবণে,
সকালে-সাঁঝে সারাটা দিনই ভাসিয়া ও সে পবনে,
আকাশে-জলে আলোতে হেরি কাহার ও ছায়া নিরখি?
তৃণানীদলে কুসুমে ঘেরি রচিত মায়া কে সখি?
তোমার ও কালো অলকরাশি নেহারি মেঘে গগনে,
উষার ও আলো তোমারি হাসি রয়েছে লেগে নয়নে!

বিরহানলে দহে না খালি জ্বলে সে আলো আঁধারে,
'কোথা সে ব'লে—' প্রণয়ে গালি পাড়া কি ভালো কাঁদারে?
গিয়েছ দূরে রয়েছে পড়ে তোমারি যত নিশানা,
যা দেখি জুড়ে হাজারো ডোরে মাধুরী শত মিশানা,
কামিনী গাছে ধরেছে কুঁড়ি তোমারি হাতে পোঁতা গো,
গড়ানো আছে শাঁখা ও চুড়ি— তুমি এ রাতে কোথা গো!

দেয়ালে ছবি রয়েছে মারা— তোমারি হাতে টাঙানো,
দুটি সুরভি ফুলেরি চারা ও পাশে ছাতে রাঙানো,
দেরাজে ভরা খুঁটি ও নাটি ভরা সে শাড়ি সেমিজে,
শিশিতে করা মধুও খাঁটি ও কি ও? হাঁড়ি দেখি যে।
এখানে কাঁটা ওখানে জাঁতি, কাগজে মোড়া ওটা কি?
সুপুরি কাটা ; এটা কি? বাতি সিকিটা পোড়া যা বাকি!

বিরহে একা রয়েছি ভালো, কী সুখে কব কাহারে?
জীবনে দেখা পেয়েছি আলো কী অভিনব আহা রে!
পুরোনো চিঠি তোমারি শত-— জ্বলে সে লেখা বলে গো
—রেখেছি মিঠি চুমা যা যত, দেবো তা দেখা হলে গো!
সে আশা বুকে তোমারি পানে রয়েছি আমি চাহিয়া,
দুখে ও সুখে তোমারি ধ্যানে দিবস-যামি হে প্রিয়া!

নাতির প্রেম

আজকে তিথি লগন ভালো,
ঠান্‌দি এসো তোমায় নিয়ে
বেরিয়ে পড়ি শ্রীবৃন্দাবন,
যা বলে লোক বলুক গিয়ে ;
পর-পুরুষের সঙ্গে যেতে
আপত্তি হয়? কাজ কি এতে?
ডাকিয়ে পুরুত আজকে রেতে
আমায় করে ফেলো বিয়ে,
বেরিয়ে পড়ি ঠান্‌দি এসো শ্রীবৃন্দাবন তোমায় নিয়ে।

সারা হলেম ঠান্‌দি ওলো
অরসিকের গুলতানিতে,
রসের মর্ম কেউ বোঝে না,
আগুন রাখে ফুলদানিতে ;
পরিহাসের চামেলি ফুল
হাসির দখিন হাওয়ায় দোদুল
ঠান্‌দি আমায় করে আকুল
ফুটে তোমার মুখখানিতে!
সারা হলেম ঠান্‌দি ওলো অরসিকের গুল্‌তানিতে!

ছুটি পেলেই ছুট দিয়ে তাই
দৌড়ে আসি তোমার কাছে,
আজকে মঘা ত্র্যহস্পর্শ
এমন কথা বল্‌তে আছে?
ফুলের কানে গান শুনিয়ে
মৌমাছি ধায় গুন্‌গুনিয়ে
কোকিল সুরের জাল বুনিয়ে
শুনচো না কি ডাকচে গাছে?
আজকে বিয়ের দিন ভালো নয়, এমন কথা বল্‌তে আছে?

মনের যত খপরা-খপর
উড়িয়ে নে যায় ফাজিল হাওয়া,
বিনা-তারে চলেছে আজ
প্রাণে-প্রাণে আসা-যাওয়া ;
এমন শুভ দিন ও লগণ
ঠান্‌দি খুঁজে পাবে কখন?

নাগর এমন মনের মতন
যায় না পথে কুড়িয়ে পাওয়া।
ঠান্‌দি দ্যাখো ঘোমটা তোমার উড়িয়ে দিলে ফাজিল হাওয়া।

বাঁধ্‌বো বাসা, থাক্‌বো খাসা,
করবো তোমার তাঁবেদারি,
চালিয়ো তুমি আমার উপর
যা ইচ্ছে তাই হুকুম-জারি ;
হেথায় হট্টগোলের হাটে
কাজের মানুষ কাজ নে খাটে,
আমার বেকার বসেই কাটে,
টিট্‌কিরি দ্যায় সবাই ভারি!
ঠান্‌দিদি গো চাকরি দিয়ো করবো তোমার তাঁবেদারি।

একটা বিয়ে থাকতে যদি
আর একটাতে খট্‌কা লাগে,
মনের মধ্যে সন্দেহ হয়
প্রেম আগে না ধর্ম আগে!
ঠান্‌দি আমি বলচি শোনো—
দোষ এত নেই নেইকো কোনো,
প্রণয়ে পাপ হয় কখনো?
হয়নাকো পাপ অনুরাগে ;
সম্‌জে দ্যাখো ঠান্‌দিদি গো মনে যদি খটকা লাগে।

ঠাকুরদাদা ঋাঁদে নেহাত
নাতবউয়েরে বদলি দিয়ে
তিন মাসেরি কড়ারেতে
আমায় না হয় কর বিয়ে ;
বল্‌চো তুমি শাস্ত্রে বাধা?
শাস্ত্র মেনে চলে গাধা!
থাক্‌তে পারে মানুষ বাঁধা
যাবজ্জীবন একটা নিয়ে?
তিন মাসেরি কড়ারেতে ঠান্‌দি আমায় করো বিয়ে।

মেয়াদ যে দিন ফুরিয়ে যাবে,
ঠাকুরদাদার কোলে তুলে
দেবো তোমায় দেবো-দেবো
সাজিয়ে বকুল-গোলাপ ফুলে ;

ঠাকুরদাদা বল্‌বে—এ কি!
আজকে আমি কারে দেখি!
ফিরে এলো আমার সে কি
নবীন বেশে এলোচুলে?
ঠাউরে দ্যাখো ঠান্‌দিদি গো রাখবে শ্যাম না রাখবে কুলে।

আব্দারের বেড়ি

সাধবো না মনে কবি
বোঝে কই প্রাণ?
পদে-পদে সই তাই
এত অপমান!
অবেলায় বাদলায়
মানুষ কি যায়?
মাথা খাও রাখ কথা
ধরি দুটি পায়।
আর কোনদিন যদি
করি অনুরোধ,
শুনোনাকো শুনোনাকো
দিও প্রতিশোধ!
চেয়ে দেখ আকাশের
চোখ ছল্‌-ছল্‌,
মেঘ ডাকে গুরু-গুরু
এলো বুঝি জল!

কাল রাতে ভালো করে
হয়নিকো ঘুম,
কাঁদবে যে খোকা, তা কি
আগে জানতুম?
শোবো তারে নিয়ে আজ
আলাদা না হয়,
দেখো-দেখো হবে ঘুম
আজ নিশ্চয়।
কথা তুমি শোনোনাকো
এই ভারি দোষ,

ব্যথা দিলে পরে মনে
পাবে আফ্‌সোস,
তাই বলি কাল যেও
থেকে যাও আজ,
ওই দেখ বিদ্যুৎ
পড়ে বুঝি বাজ!

এতখানি ময়দা যে
একা মাখলুম!
নুচি হবে বলে নেচি
কেটে রাখলুম!
হাট থেকে বেছে-বেছে
আনালুম পান!
দূর করে দাও ; হোক্
সব লোকসান।
কাজ আছে? কাজই বড়?
কাজ নেই কার?
ক্ষতি হয়—তার আমি
দেব গুনগার।
ওই দেখ খোকা করে
চোখ ছলছল,
কী জানি কি বুঝেচে ও
পড়ে বুঝি জল!

সেই সেদিনের কথা—
বেশিদিন নয়,
কত ভালোবাসতে যে
তাকি মনে হয়?
মার কাছে সে বছর
যবে আমি যাই,
মনে পড়ে কেঁদেছিলে
কত কান্নাই?
আমি বল্লুম—ছি-ছি
এত দুর্বল!
ফিরবো তো দুদিনেই
চোখে কেন জল?
এখন বিদায় দিতে
বাধেনাকো আর,

হাসিমুখে চলে যাও—
কপাল আমার!
আমি যেন পর, তবু
খোকা তো আপন,
দ্যাখো লেখা চোখে ওর
মৌন বারণ!
বলতে পারে না কথা
বোঝে সব ঠিক,
তুমি চলে যাবে—চেয়ে
আছে অনিমিখ!
যাও-যাও গায়ে হাত
দিওনাকো ওর,
হয়েছে-হয়েছে ঢের
যত্ন-আদর!
বাজে কথা কয়ে কেন
মিথ্যে ভোলাও?
সরো-সরো কাজ আছে
হাত ছেড়ে দাও।

আয় খোকা, তোরে নিয়ে
দূরে সরে যাই,
শুয়ে-শুয়ে ছড়া-গান-
গল্প শোনাই,
হোস্‌নেকো তুই ওর
মতো নিষ্ঠুর,
বউমা যা বলে, দিস
সায় মঞ্জুর।
একি! একি! জামা-জুতা
খুলচো হঠাৎ?
যাবে না? দাসীরে দয়া
হলো কি নেহাত্?
মেঘ সরে গিয়ে ওই
ওঠে বুঝি চাঁদ ;
পালাবে আবাব ; খোকা
বাঁধ্ ওরে বাঁধ্!

পারুল-চাঁপা

সাতটি ভায়ের সব্ সে ছোট, একটি চাঁপা ফুল—
উঠলো জেগে ভোর না হতে, ডাক দিলে পারুল ;
দেখ্‌ছিল সে স্বপ্ন তখন—একটি সাদা জুঁই,
ছোট্ট কটি বলচে তাকে আয় না কাছে তুই ;
"পারুল দিদি, পারুল দিদি, এমন সময় ডাকো?"
"রাজার বাড়ি দুগ্‌গা পুজো তাও কি জানিস্‌নাকো?
চল্‌না পাবি রানীর হাতে দেবীর পায়ে ঠাঁই!"
—"পুণ্যি অতো চাইনে দিদি, ভক্তি অতো নাই!"

"এমন কথা বলতে আছে?"—পারুল গেল চলে,
ফিরল যখন রক্ত-গগন : স্বর্ণ পড়ে গলে,
আপন নীড়ে চল্‌ছে পাখি বইচে বাতাস ধীরে,
কাঁপচে আলো আঁধার যতো ঘনিয়ে আসে ঘিরে,
রাজ-বাগানে ফুলের মালি ফিরছে সাজি হাতে,
দেখিয়ে তারে পারুল দিদি কয় কি ইসারাতে ;
"রাজবাড়িতে চাইনে যেতে, আঙুল-নাড়া রাখো,
বড়দা গেছে সকাল বেলা মেজ্‌দাদাকে ডাকো।"

"তারিফ্ করে রাজকুমারী বাঁধ্‌বে বড় খোঁপা,
মোতির মালা জড়িয়ে তোরে রাখবে কেমন তোফা!
ভাগ্যিতে নেই!" বলে পারুল দৌড় দিল রাগে,
দুদিন গেলেই আবার হাজির রাত পোহাবার আগে,
বাজচে তখন বিয়ের বাড়ি নবতখানায় বাঁশি,
জল সইতে যাচ্ছে কারা সঙ্গেতে দাস-দাসী,
পারুল বলে, "ও ভাই চাঁপা, ওদের বাড়ি যাবি?
বাসর-ঘরে রং-তামাশা দেখতে অনেক পাবি!

শুয়ে রুপোর ফুলদানিতে শুনবি পেতে কান
হাসির কত ফিনিক্ ছোটে তরুণ গলার গান,
দেখবি কেমন বিয়ের কনে একটি পলকেই
নিলে চিনে এতদিনের অচেনা বর সেই।
বুকখানি তার কাঁপচে ভয়ে আনন্দে থর্-থর্,
ভাবছে বসে কেমন করে আপন হল পর।"
থামিয়ে কথা বল্লে চাঁপা—"ব্যাখ্‌খানাটা রাখো,
বড়দা গেছে মেজ্‌দা গেছে সেজ্‌দাদাকে ডাকো।"

দুপুরবেলা গাটা তখন করছে মাটি-মাটি,
বিছিয়ে নিয়ে সবুজ রঙের পাতার শীতলপাটি,
তন্দ্রা-আতুর চোখে চাঁপা দেখতেছিল চেয়ে
গাছের তলায় করছে খেলা পাড়ার ছেলে-মেয়ে,
কেউ পরেছে সোনার হেঁসো কেউ বা নীলাম্বরী,
খড়্‌কে ডুরে কেউ পরেছে কারুর খোঁপায় জরি,
এমন সময় পারুল এসে বল্লে—"চাঁপা শোন্,
ঠেলিস্‌নিকো দিদির কথা, লক্ষ্মী-সোনা-ধন্!

দশ-আনিদের ছোটছেলের ফুলশয্যে আজ,
ডাক্ পড়েছে রঙ-বেরঙের ফুল কে কোথায় সাজ,
শ্বেত চামেলি সই কামিনী বেলায় বড়বোন,
শিউলিপিসি গোলাপমাসি গেছে এতক্ষণ,
খপর শুনে তোরেও আমি ডাক্‌তে এলুম তাই,
ভায়ের ভালো খুঁজে মরা বোনের স্বভাবটাই।"
"চাইনে দিদি তোমার ভালো, আমার কথা রাখো—
থাক্‌তে বড় যায় কি ছোট? ন-দাদাকে ডাকো।"

"অডিকলম-ল্যাবেন্ডার-আতর-গোলাপজল,
ফুলের পাখার আলোর মালায় হাসিতে বিচঞ্চল,
ঘুমের-প্রবেশ-নিষেধ ঘরে নতুন বউ আর বর
প্রথম পরিচয়ের আজি পেয়েছে অবসর,
বউ-দিদিরা পাতচে আড়ি দাঁড়িয়ে দরজায়—
বর কি করে বউয়ের গালে প্রথম চুমো খায়!
সব তামাশা দেখতে পাবি ঘরের ভিতর বসে!"
চাঁপার মন সে তেম্‌নি নারাজ, পারুল জ্বলে রোষে।

পরদিনেতে রাখাল ছেলে ফিরতেছে গান গেয়ে,
ত্রয়োদশীর চাঁদটি আছে তাহাব পানে চেয়ে,
এক হাতে তার খড়ের আঁটি আর এক হাতে বাঁশি,
টুপ্ করে তার পড়লো চাঁপা পায়ের কাছে আসি,
ফুলটিকে সে কুড়িয়ে নিয়ে রাখলো কানে গুঁজে,
ঘরে ফিরেই সব প্রথমে বউটিরে তার খুঁজে,
সাজিয়ে দিল মুখটি তুলে পরিয়ে কালো-চুলে
চাঁদের আলোয় কুড়িয়ে পাওয়া একটি চাঁপা ফুলে!

বাহবা বেড়ে!

সেদিন রাত্রে তুমুল তর্ক,
রাম একদিকে, শ্যাম বিপক্ষ,
ঘড়ি-পানে কারো নাহিকো লক্ষ,
এগারোটা বাজে-বাজে,
রাম রেগে কয়—হারে-রে অন্ধ!
বলেছে কি দ্যাখ্ সুরেন বন্দ্যো,
শ্যাম ততো পাড়ে গালি ও মন্দ,
থেকে-থেকে মাঝে-মাঝে।

ক্রমশ ব্যাপার হল সঙ্গীন,
গুটায় উভয়ে শার্টে আস্তিন,
হাঁ-হাঁ করে এসে ধরিল নবীন
দুদিকে দুহাত দিয়ে ;
নইলে সেদিন মাথা ফাটাফাটি
হতো একচোট অতি পরিপাটি,
রাজনৈতিক কথা কাটা-কাটি
চড়তো চরমে গিয়ে!

রাম বলে—ছাড়ো! ওটা পাপিষ্ঠ,
কী বোঝে দেশের ইষ্টানিষ্ট?
দ্যাখো দিল মোরে অতি অশিষ্ট
ভাষায় কিরূপ গালি!
কহিল সে পুনঃ ফুঁসিয়া-রুসিয়া,
নাকে কিঞ্চিৎ নস্য ঠুসিয়া
"গুঁড়োতাম মাথা উহার ঘুসিয়া
তুমি বাধা দিলে খালি!

এত বড় ওটা পাষণ্ড ঘোর
বলে কিনা নেতা সব ব্যাটা চোর,
বাদ খালি যান যতো শুধু ওঁর
গান্ধি-চিত্ত-নেরু!
এই যে অর্ধ-শতাব্দী ধরে
দাড়ি পাকাইল দেশ-দেশ করে
ছাইল কীর্তি ভুবন-ভিতরে
চায়না হইতে পেরু,

সেই বক্তৃতা-মঞ্চের বীর
সার সুরেন্দ্র ধীর-গম্ভীর
পাইল যে পদ দেশ-মন্ত্রীর
নতুন রিফর্ম স্কিমে,
তারে অপমান তারে কিনা হেলা,
করে বেইমান গুরু-মারা চেলা
একজোট মিলে একজায়ী মেলা
লেগেছে পিছনে ফিঙে!

আরাম-কেদারা দিয়ে পিঠে ঠেস
স্বদেশ-উদ্ধার কল্পনা বেশ—
ভাবিয়া দেখেছ এই কংগ্রেস
কাহার হাতের গড়া?
রাজনৈতিক ফুটবল-খেলা—
প্রথম সে বলে মারিল কে ঠেলা?
খেয়াল-খবর নেই তার বেলা—
কথা আছে চড়া-চড়া!"

কালো কুচ্‌কুচে চিকন চর্ম
ছাইল বিন্দু-বিন্দু ঘর্ম,
মুছিয়া রুমালে কহিল—"ধর্ম
একটা তবুও আছে ;
গগনে চন্দ্র-তারকা-সূর্য
উঠচে এখনো নবীন বুঝ্‌চো
নচ্ছার শেমো পূজ্যাপূজ্য
কিচ্ছুই নাহি বাছে!

নহিলে ধরেছে মতিচ্ছন্ন
বলে নেতাদের কিসের জন্য
ভীমরথি আর কত কি অন্য
যা আসে মুখে তা কয়!
শুনে জ্বলে ওঠে সর্ব অঙ্গ,
শপথ করিয়া উহার সঙ্গ
ছাড়িলাম আজি এ—পণ-ভঙ্গ
জীবন থাকিতে নয়!

দল বেঁধে দেশে দুশো দুশমন্
বলে—স্বরাজের গোড়া-পত্তন

কর্‌তেই হবে, বিলাতি শাসন
অতি হীন অতি হেয় ;
অতএব ছাড় কলেজ-খেতাব,
ঘোরাও চরকা পোড়াও কেতাব,
দাও করে আড়ি রেখোনাকো ভাব
ইংরেজ-সাথে কেহ।

এইরূপে যদি থাকি স্বতন্ত্র
জপিয়া দেশের ইষ্টমন্ত্র
দুদিনে ব্রিটিশ শাসন-যন্ত্র
অচল-বেকল হবে,—
তল্পিতল্পা লইয়া বগলে
সাগরের পার যাবে ওরা চলে,
স্বরাজ আসিবে মোদের দখলে,
ভাবনা আর না রবে।

মূর্খ উহারা বোঝেনাকো কভু
চিরকাল দাস মোরা—ওরা প্রভু,
ওরা আছে তাই বাঁচোয়াটা তবু
এখনো মোদের আছে ;
নইলে ছিন্নভিন্ন-আহত
উলোট-পালোট খাইত নিয়ত
কাণ্ডারীহীন তরণীর মতো
অকূল সাগর-মাঝে।

এ রকম করে যদি একজায়ী
মনিব উহারা ওদের ক্ষ্যাপাই
সৈন্য-শান্ত্রী-পাহারা-সেপাই
পিছনে ছাড়িয়া দেবে ;
তখন কে আসি করিবে রক্ষে?
সর্ষের ফুল হেরিবে চক্ষে
নয়নের ধারা বহিবে বক্ষে
সে কথা দেখেছ ভেবে?

খুশি হয়ে তাই যা পাও তা নাও,
সদা উহাদের জয়গান গাও,
দেখেছ কখনো ভিখিরি কোথাও
কাঁড়া কি আকাঁড়া বাছে?

মন্টেগু তবু সরেস বালাম,
দিয়েছে মোদের ছাঁটা ও মোলাম
আমাদের মতো নিমকহারাম
আর কি কোথাও আছে?

কেমন মোদের হাগুলা স্বভাব—
কিছুতেই আর ঘোচে না অভাব!
সিন্‌হে বেহারে করিল নবার
বাদশা বিলেতবাসী ;
তবুও মোদের গেল না দুঃখ?
হায় বেইমান হায় রে মূর্খ!
মুখ ভার-ভার মেজাজ রুক্ষ
লালচ বিশ্বগ্রাসী!

অন্নবস্ত্র অগ্নিমূল্যে
যদিও মানুষ ক্ষেপিয়ে তুল্লে,
তবুও চলে না এ কথা ভুল্লে
মোগল-পাঠান যুগে
বিজ্‌লির আলো জ্বল্‌তো না রেতে,
ট্রেনে ও মোটরে চড়তে না পেতে,
অসুখে-বিসুখে ঠায় মারা যেতে
হাতুড়ের হাতে ভুগে!

মোট কথা এই তাদের আমলে
সুখ কি শান্তি ছিল না আসলে,
অত্যাচার ও পীড়নে সকলে
হাড়-ভাজা-ভাজা হতো!
আপিসে চাকরি করিয়া এখন
সুখে-শান্তিতে রয়েছি কেমন,
অন্তিমকালে আধা-পেন্‌শন্‌
পাই দুই-চারিশত!

মিছে গোলমাল কর হৈচৈ
সবুরে ফলবে মেওয়া নিশ্চয়ই,
এখন আমড়া আমড়াই সই
কামড়া-কামড়ি ছেড়ে!"
হইল রামের বক্তৃতা শেষ,
কেহ 'এনকোর' কেহ বলে 'বেশ',

কেহ বা তাকিয়া দিয়ে পিঠে ঠেস্
বলিল বাহবা বেড়ে!

এত শুনি শ্যাম উঠিল জ্বলিয়া,
বলিল দুকান দিতেম মলিয়া,
নেহাত গুরুর আদেশ বলিয়া
চুপ করে শুধু রই ;
রেমোরে কেয়ার করিনে টপেন্স
মটো আমাদের নন্-ভাওলেন্স
নচেৎ উহার এত ননসেন্স
কান পেতে আমি সই?

রাজ্য জুড়িয়া প্রেতের নৃত্য
চলেছে এই যে নিত্য-নিত্য,
দেখিয়া-শুনিয়া যাহার চিত্ত
ক্ষিপ্ত নাহিকো হয়,
ধিক্ সে তাহার জীবন ঘৃণ্য
নাই নিস্তার মরণ ভিন্ন,
স্বদেশের ভালে কালিমা চিহ্ন
সম সে লাগিয়া রয়!"

কিঞ্চিৎ কাল নীরব থাকিয়া
টানিয়া কোলেতে লইল তাকিয়া,
সজোরে দুটান চুরুট চাখিয়া
কহিল আবার ফিরে—
"আর্যগরিমা প্রাচীন কীর্ত্তি,
সে মহামহিমা অতুল দীপ্তি
ভুলিয়া আমরা দাস্য-বৃত্তি-
কলঙ্ক বহি শিরে,

বসনে-ভূষণে সাজেসজ্জায়
করেছে প্রবেশ হাড়ে-মজ্জায়
দাসত্বপনা মরি লজ্জায়,
হায় মা ভারতভূমি।
নাহিকো আত্ম-সম্মান জ্ঞান,
করে বিদেশির স্তুতিগুণগান,
কেমন করিয়া হেন সন্তান
বক্ষে বহিছ তুমি?

সৈন্য-শাস্ত্রী-পাহারা-সেপাই
লালমুখে মাগো মোরা না ডরাই
অন্তরে হৃদি সাক্ষাৎ পাই
শক্তিরূপিণী তোরে!
হিমালয়-সম অচল-অটল
বক্ষ প্রসারি সন্তানদল
নেব লুফে যত গোলাগুলি-বল
'সোল্ ফোর্সের' জোরে।

ঘৃণা শত্রু-শোণিত-সিক্ত
করিব না বাহু কলুষ-লিপ্ত,
মার খেয়ে মোরা রহিব তৃপ্ত
মারিব না তবু কভু,
ষোল-আনা পাপ হইলে পূর্ণ
পশু-বল হবে আপনি চূর্ণ,
করুন বিচার পাপ ও পুণ্য
দুনিয়ার যিনি প্রভু!"

ঈষৎ থামিয়া কহিল সে পুনঃ,
"বলিতেছি কথা মন দিয়া শুন,
সব দ্রব্যের দর তিনি-গুণো—
না খাইয়া লোকে মরে,
পাঁচ সিকে করে পোনা মাছ সের,
সাতটাকা জোড়া দাম কাপড়ের,
অথচ বাড়তি নেই মাইনের,
ম্যালেরিয়া ঘরে-ঘরে ;

গোয়ালিনী এত দুধে ঢালে জল,
গৃহিণী করিছে নিয়ত কোঁদল,
ম্লেচ্ছ-আনিটা এমনি প্রবল,
মানেনাকো কেউ জাতি ;
ছেলেগুলো সব বেজায় বেয়াড়া,
সাতচিৎকারে দেয়নাকো সাড়া,
বেড়িয়ে বেড়ায় এ পাড়া ও পাড়া
টো-টো করে দিন-রাতই ;

থাকিতে চায় না আর নিজগ্রামে,
শহরে আসিয়া চড়ে ট্রামে-ট্রামে,

সিনেমা অথবা থিয়েটার নামে
জিহ্বায় আসে জল ;
কচি ছেলেরাও নাহি রয় থির,
চুল ছিঁড়ে দেয় কোলে উঠে ঝির,
ব্রিটিশ-শাসনশোষণ-নীতির
—এই সমস্ত ফল!

ছোকরারা আর পায়ে নাহি হাঁটে,
আট আনা খরচে চুল-দাড়ি ছাঁটে,
কব্জিতে তারা হাত-ঘড়ি আঁটে,
এমনি বিলাসীপনা,
মেয়েরাও হায় এমনিই বাবু
কুটিতে পারে না কুমড়ো-অলাবু,
জানে না রাঁধিতে বার্লি কি সাবু
ঘরে দিতে আলাপনা ;

রাঁধুনী-চাকরে সব খায় লুটে,
পয়সায় আনে ছ-গণ্ডা ঘুঁটে,
তবু তারা যদি একটুও উঠে
একবার-খানি চায়!
ঘর-সংসার শ্রীহীন-মলিন
হয় না এমন দিনকের দিন,
কেরাসিন তেল পুরো একটিন
তিনদিনে নাহি যায়।

এই বিলাসিতা এই বাবুয়ানী,
রুপোর বদলে নিকেলে দুয়ানি,
মামলা, মড়ক, পথে রাহাজানি—
পরাধীনতার ফল।
দেশেতে পড়েছে শনির দৃষ্টি
খেজুরের রসে নেই সে মিষ্টি,
আকাশে সময়ে হয় না বিষ্টি,
অসময়ে হয় জল ;

ছোটে পাঞ্জাবে রক্তের ধার,
তুর্কেব প্রতি হলো অবিচার,
দিতে প্রতিশোধ নিতে প্রতিকার
চরকা কিনিয়া লাগো

লাট-কৌঁসিলে না যাইও কেহ,
স্বদেশের তরে পাত কর দেহ,
দেশবাসী-প্রতি যদি থাকে স্নেহ
ঘুমাও না আর জাগো

অর্থাৎ ধর বর্জন-নীতি,
ইংরেজ-সাথে রেখোনাকো প্রীতি,
গাও স্বরাজের বন্দনা-গীতি
সকল কর্ম ছেড়ে।"
হইল শ্যামের বক্তৃতা শেষ,
কেহ 'এনকোর' কেহ বলে 'বেশ'
কেহ বা তাকিয়া পিঠে দিয়ে ঠেস্
বলিল 'বাহবা বেড়ে!'

বেশ্যা

বেশ্যা আমি—ঘৃণ্য পেশা—দেহের ব্যবসায়,
জাত-কুল-মান ভাসিয়ে বেবাক্ দিলেম দরিয়ায় ;
লোকসমাজের আঁস্তাকুড়ে আমরা করি বাস,
একটানা ঘোর পাপের স্রোতে ভাসচি বারোমাস,
কোন্ ঠিকানায় ভিড়বো যে শেষ, নেই ঠিকানা তার,
আলোক-বিহীন কোন্ নরকে ভীষণ অন্ধকার!
কামড়াবে সাপ মারবে মুগুর ডাঙস অনুক্ষণ ;
জ্বলবে আগুন ধু-ধু-ধু-ধু—শিউরে ওঠে মন!

কে যাবি রে অধঃপাতে? কে যাবি রে?—আয়!
পৌঁছে দেবো সটান্ সেথা দু-চার রুপেয়ায়,
আমরা মারা-সোনার-হরিণ ভুবন-কাননের,
পুরুষ-ধরা ফিকির জানি বিবিধ বরনের,
নিশ্বাসে মোর বিষিয়ে ওঠে বিশ্বে চারিধার,
সাম্‌লে চলো সাধু তুমি সামনে হুঁসিযার,
ওৎ পেতে ঠিক আগ্‌লে ঘাঁটি ডাকচি ইসারায়—
কে যাবি রে অধঃপাতে? কে যাবি রে? আয়!

বাঘের চেয়ে হিংস্র মোরা—সাপের চেয়ে ক্রূর,
লজ্জা-ঘৃণা নেই আমাদের, নেই মায়া—নিষ্ঠুর,

গুণ্ডা-মাতাল—এরাই মোদের সঙ্গী-সহচর,
আমির মোরা ফকির করি—স্ত্রীকে স্বামীর পর,
দণ্ডবিধি আইন বইয়ের চৌদ্দ আনা পাপ—
দেখবে তাতে মার্কা মারা মোদের হাতের ছাপ,
সুখের ঘরে লাগিয়ে আগুন হাত-তালি দিই তাই,
হোঃ-হোঃ-হোঃ এই আমাদের জাতের ব্যবসাই!

কেমন করে সব খোয়ালেম?—জাত-মান-শীল-কূল—
এক মিনিটের ভুল সে যে গো—এক মিনিটের ভুল!
গোপন ছিল পায়ের নিচে চোরা বালির চর,
না জেনে যেই পা দিয়েছি—মরবি তো ঠিক মর্!
নেমে এলেম অধঃপাতের ক্রমে এক-এক ধাপ,
বৃথা এখন বিলাপ-রোদন—বিফল অনুতাপ!
এক মিনিটের ভুল ওগো সেই এক মিনিটের ভুল!
ভাসিয়ে দিল অকূল জলে জাত-মান-শীল-কুল।

এমন ভরাডুবি হবে—স্বপ্ন-অগোচর,
বিনা মেঘে বজ্রপতন—ভাবলে আসে জ্বর!
তখন আমার কাঁচা বয়েস কাণ্ডাকাণ্ডহীন,
শাশ্ড়ি-স্বামী-ননদ নিয়ে কাটতেছিল দিন,
মা পাঠাতো তত্ত্ব কত ভাইরা নিত খোঁজ,
দুপুরবেলা সঙ্গী মিলে গল্প হতো রোজ,
করতো স্বামী কত আদর—তুলনা তার নাই,
মনে হতো মুঠোর ভেতর গোটা স্বর্গটাই।

তাঁরেও আমি বাসতেম্ ভালো—বাসতেম্ ভালো খুব,
এক গলা এই পাপের পাঁকে দিইনি তখন ডুব।
সেদিনের সেই প্রণয়লীলা মান-অভিমান-ছল
পড়লে মনে আজো চোখে গড়িয়ে পড়ে জল,
ইচ্ছে করে দৌড়ে গিয়ে লুটুই পায়ে তাঁর,
দণ্ড নিই তাঁর চরণ-আঘাত বক্ষে আপনার,
হায় কুলটা-কলঙ্কিণী! কেমন করে মুখ
করবি রে বার সম্মুখে তাঁর?—জ্বল্‌চে, জ্বলুক বুক!

দিয়েছিল বিধি আমায় রূপ—হল সেই কাল,
আজ বাজারে বেশ্যা আমি—নেই চুলো নেই চাল!
চলতে পথে-ঘাটে আমায় দেখতো চেয়ে লোক,
পাড়ার যত নষ্ট ছোঁড়া হান্‌তো নজর চোখ,

জানলা দিয়ে ছুঁড়তো চিঠি, কেউ বা দিত ফুল,
ভাবতুম, তাদের একী রকম আহাম্মুকি ভুল!
শুনলে স্বামী হাসতেন শুধু টিপে-টিপে মুখ,
সন্দেহ তাঁর আমার উপর হয়নি এতটুক্ !

সেদিন মোটে হয়নি মনে করতে গরব নাই
যে অব্‌ধি না নারীর দেহ পুড়বে হবে ছাই,
তাই বুঝি মোর সকল দর্প সকল অহঙ্কার
ভাঙলে বিধি! সেলাম তাঁরে সেলাম শতেক বার!
সন্ধেবেলা আনতে গেছি দিঘির ঘাটে জল,
লোক-জন নেই বইচে হাওয়া ফুলের পরিমল,
এমন সময় দেখি চেয়ে হঠাৎ অকস্মাৎ,
গাঁয়ের জমিদারের ছেলে ধরলে এসে হাত!

পড়লো সোজা ঘাড় ঘেঁসে ঠিক ঝোপ্ বুঝে সেই চোপ্,
ছাঁৎ করে বুক উঠলো আমার—বাক্যি হলো লোপ,
বাধা দেবার শক্তি-সাহস মনের যত জোর
মন্ত্রে যেন উবে গেল করলে চুরি চোর!
তয়ের গাড়ি আমায় নিয়ে লম্বা দিলে ছুট,
শয়তান আর শয়তানীরা পাড়লে হরির লুট!
এই শহরে—আজব শহর—ঘুরে কতই মোড়
হাজির হলুম তিনি-আমি—দুটি মানিক-জোড়!

এরেই বলে হিপনটিস্‌ম্?—এরেই বলে ঠিক্,
রইল না জ্ঞান কোন-কিছুর—কোন্‌টা দিগ্বিদিক,
আমার কথা তোমরা সবাই করবে অবিশ্বাস,
ভাববে এ এক তৈরি গড়া মিথ্যে ইতিহাস,
নিজের সাফাই গাইচি আমি—নয় ওগো, তা নয়,
মিথ্যা আমি কইব কেন? কিসের লজ্জা-ভয়?
গুপ্ত ছিল হয়তো আমার সুপ্ত চেতনায়
লালসার এই বিষের চারা ফোটার অপেক্ষায়!

ওলোট্-পালোট্ হলো জীবন—ঘটলো বিপর্যয়
আগাগোড়া বদলে গেলুম—সে আমি সে নয়!
লাল করে ঠোঁট ছাঁচি পানে গালে দিলুম রঙ,
শিখে নিলুম হাব-ভাব সব কায়দা-করণ-ঢঙ,
গরম-গরম চপ্-কাট্‌লেট হুইস্কি-বিয়ার-রাম—
দিনের পরে দিন চলে যায়, চল্লো অবিশ্রাম!

রাখলে বাবু মাইনে করে গাইয়ে এক ওস্তাদ,
অনুষ্ঠানের কোনও অঙ্গ পড়লোনাকো বাদ!

আসবার সব নতুন হলো—সজ্জা-সরঞ্জাম,
শাড়ি-সেমিজ ব্রুচ-ব্রেসলেট—অনেক টাকা দাম।
গা-ঢাকা-গোছ সন্ধে হলে মাঠের দিকে প্রায়
ট্যাক্সি চড়ে হাওয়া খেতে যেতেম দুজনায়,
ফুর্-ফুর্-ফুর্ লাগতো হাওয়া জমতো নেশা বেশ,
এলিয়ে পড়ে রাত দশটার ফিরতেম আমি শেষ,
হঠাৎ তিনি ফেরার হলেন ভাগলেন নিজের গাঁয়,
দোস্‌রা বাবু রাখলে বাঁধা দোস্‌রা ঠিকানায়!

কি হবে আর খুঁটিয়ে কয়ে পাপের ইতিহাস?
ক্রমেই তলিয়ে গিয়ে দেখি শেষটা সর্বনাশ,
জমিদারের ছাওয়াল যিনি করলেন আমায় বার,
আজকে তিনি সমাজ-নেতা কাউন্সিলে মেম্বার!
কন্যাদায়ে-বন্যাদায়ে মুক্ত তাঁহার হাত,
বলিহারি সাবাস—তাঁরে ক্যাবাত! ক্যাবাত!
এক-যাত্রার পুরুষ-নারীর ফললো পৃথক ফল,
বেঁচে থাকো সমাজ তুমি—নাড়চো খাসা কল!

নরকের এই পিছিল পথে দৈবে যারা হায়,
পা দিয়েছে প্রলোভনের প্রবল তাড়নায়,
ভুল করেছে অসাবধানে—সুযোগ-অবসর
সমাজ কোথা দেবে তাদের, যাতে অতঃপর
আর না তারা করতে পারে তেমনতর ভুল—
তা নয় সমাজ তাদের বুকে হান্‌চে বজ্রশূল!
বন্ধ করে দিচ্চে তাদের শুধরে নেবার পথ!
বেঁচে থাকো সমাজ তুমি, তোমায় দণ্ডবৎ!

* * *

আজ বাবুকে ফিরে যেতে বল্‌লো বেলা বল্,
ও চামেলি কোথায় গেলি?—দেনা একটু জল,
বুকের ভিতর বড্ডো কেমন করচে আমার ভাই,
একটু দে ভাই স্রেফ সাদা জল—আমি যে তাই চাই
দূর করে দে—আনলি ও কি—সইচে না ওর ঝাঁঝ,
কচ্চে পাঁজর কন্-কন্-কন্—পড়চে ছিঁড়ে আজ
শিরগুলো সব পট্-পট্-পট্—কর্‌লো পাখা কর্,
দ্যাখ্-দ্যাখ্-দ্যাখ্-দ্যাখ্‌লো চেয়ে দাঁড়িয়ে আমার বর!

ওই যে শুচি-শুভ্র তাঁহার অকলঙ্ক মুখ!
ওই যে তাঁহার দিব্য কান্তি সুপ্রশস্ত বুক!
দ্যাখ্-দ্যাখ্-দ্যাখ্-দ্যাখ্লো চেয়ে—পাস্নে তোরা ডর,
ঢের দিয়েচিস বরফ মাথায়—আস্তে বাতাস কর্ ;
ওই বুঝি ওই দেখতে পেলেন আমায় তিনি ওই,
পালাই কোথা! পালাই কোথা! লুকিয়ে কোথা রই!
ওই যা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল!—দে ভাই একটু জল,
বাবুকে আজ ফিরে যেতে বল্লো বেলা বল্।

নিদ্রাহীনের স্বপ্ন

নিশীথ-নিঝুম—
    দেড়টা বাজে,
চোখে নেই ঘুম,
    চেষ্টা বাজে।
বিছানায় বালি,
    নেই বাতাস,
ঝিঁ-ঝিঁ ডাকে খালি
    কাঁপে আকাশ।
পাখাটা কোথায়?—
    কে তা যে নিলে!
মশাটা বেজায়
    কামড়ে দিলে!
দুটো পান দাও,
    আলোটা জ্বাল,
শুনতে না পাও?
    ঘুমুলে? ভালো!

দূরে গির্জের
    ঘণ্টা শুনি,
স্বপ্নের জের—
    স্বপ্ন বুনি,
আজকের রাতে
    কিসের ভয়?
চুরি নিজে হাতে
    মন্দ নয়!

এড়িয়ে সদর
    খিড়কি দিয়ে
যাব সরাসর
    সড়কি নিয়ে।

ঘড়িটা বেজায়
    শব্দ করে ;
পথে কে ও গায়
    মিষ্টি স্বরে?
ঝেড়ে বালি-ধুলো
    চাদর তুলে,
জান্‌লাগুলোকে
    দিলেম খুলে।
ঝিক্-ঝিক্-ঝিক্
    জোনাক-পোকা
জাগলে খানিক
    দেখতো খোকা
পাগড়ি মাথায়
    পাহারাওলা
হাঁক্‌চে হোথায়
    বিকট গলা।
বেজে গেল দুটো,
    কাঁদলো ছেলে,
ওঠো-ওগো-ওঠো,—
    শুন্‌তে পেলে?

নিশীথ-নিঝুম—
    পৌনে তিন ;
(যার) ফাঁসির হুকুম—
    কালকে দিন,
ঘণ্টার পরে
    ঘণ্টা যায়
জেগে আছে ঘরে
    জেল-খানায়।
অন্ধকারের
    আঁধার তলে,
বক্ষে কী তার
    আগুন জ্বলে!

কামারহাটির
কলের বাঁশি
ঘুম-ভাঙানির
একটি মাসি—
দিচ্চে টুউ
কানের গোড়া,-
তামলীর-বউ
রান্না চড়া।
ঝির্-ঝির্-ঝির্
ঠাণ্ডা হাওয়া,
—ক্লান্ত শরীর
জুড়িয়ে-দেওয়া-
বোলায় অলস
নয়ন-পাতে
ঘুমের পরশ
আল্‌তো হাতে!

মিথ্যে প্রয়াস
হবে না ঘুম
এপাশ-ওপাশ
ওল্টালুম।
চোখ কর্-কর্
গা ঝিম্-ঝিম্,
ক্লান্ত-কাতর
কী হিম্-সিম্!
সুষমীর শাক--
ঘুমের পাতা
বল্‌ছে নিছক
মিথ্যে কথা।
ঘুমের দাওয়াই
ক্লোরেটোন
খাই কি না খাই—
কচ্চে মন,
আস্‌চে ভাব্‌না—
মাস-কাবার,
যার যা পাওনা
কাল দেবার!

উড়ে গেল পাখি
আকাশ দিয়ে,
মনে-মনে আঁকি
কত যে কি এ!
ম্লান হয়ে এল
তারার আলো,
চাঁদ নিভে গেল
রাত পোহালো।
যদি গো আমার
বয়স হত
ঘড়ির কাঁটার
ফেরার মতো,
পেছিয়ে নিতেম
বছর-বারো,
না হয় নিদেন
কমই আরো;
সুপ্তিবিহীন
সুখের রাতি,—
জ্বালিয়ে রঙিন
প্রেমের বাতি,
থাকতেম জেগে
জাগিয়ে রেখে,
ছুট্‌তো শোণিত
তড়িৎবেগে,
ভরিয়ে দিতেম
আলোয়-গানে,
সুর মেলাতেম
প্রাণে-প্রাণে।
বিজলি-চমক
হা যৌবন!
চোখের পলক—
অদর্শন!

দিক-বধূ কেন
বসন ছাড়ি
পরে ফিরে হেন
পাতলা শাড়ি?

নিশি-আভরণ
একটি-দুটি
—মুক্ত গগন—
পড়ছে টুটি,—
চলছে ওখানে
রাস্তা দিয়ে
গঙ্গাস্নানে
মায়ে ও ঝিয়ে।
চুপ্-চুপ্-চুপ্
আমবাগানে
ধুপ্-ধুপ্-ধুপ্
কে ধান ভানে।

আলো জ্বেলে ওই
বিন্দে-বুড়ি
চাল-ভাজা খই
ভাজচে মুড়ি।
ঝাঁট দেয় ঝুঁকে
ময়রা-মাগী
তানপুরো বুকে
গায় বিরাগী।
বাজে প্রেয়সীর
চাবির রিং
সোনার চুড়ির
ঝিনিক-ঝিন্!
ফিরে নিয়ে পাশ
পাল্টা-ঘুম।
—ঠাণ্ডা বাতাস
কী মরসুম!
খোকা জেগে উঠে
মায়ের পাশে,
দুধ খায় লুটে
খেলায় হাসে।
ও কাদের মেয়ে
গগন পরে
পা-দুটি ছড়িয়ে
আলতা পরে?

—রক্তকমল
    চরণ ছুঁয়ে
জরির আঁচল
    লোটায় ভুঁয়ে!

কে যায় অদূরে
    —সেক্‌রা কালো।
মই-ঘাড়ে উড়ে
    নেবায় আলো।
মোড়ের মাথায়
    জলের কল,
কান-মলা খায়
    অনর্গল।

মুকুজ্যেদের
    নব্‌নে ছোঁড়া
একজামিনের
    পড়ছে পড়া—
ভোর রাত্তির
    চোখ রাঙিয়ে,
সরস্বতীর
    ঘুম ভাঙিয়ে,—
কোন্ সাল আর
    কোন্ তারিখে
ফরাসির হার
    "কর্ণাটিকে।"
পাঁচ রকমের
    পাখির সুর,
কচ্চে মনের
    ক্লান্তি দূর।
ভাঙলো রে ঘুম
    জাগলো পাড়া,
লাগলো রে ধুম
    চায়ের তাড়া,
নাচলো খোকন্
    ধিনিক্-ধিন্,
বাজলো কাঁকন্
    ঝিনিক্-ঝিন্।

উড়ো-চিঠি

কে পাঠালে উড়ো-চিঠি
বসন্তের এই রঙিন হাওয়ায়—
ও ফুলেরা জানিস্ তোরা
কোনখানে সে কোন ঠিকানায়?
গোলাপ বলে—তার ঠিকানা
আমার ভালো আছে জানা,
বকুল বলে—না-না-না-না
কাজ কি গোপাল পরের কথায়?

চামেলি তুই বলতে পারিস?
চামেলি কয় মুচকে হেসে—
কেন তোমায় বলবো আমি?
ছিল আমার সখি যে সে!
পারুল বলে—আকাশ-পারে,
কামিনী কয়—নারে-নারে,
ও জানে না, জানে তারে
চাঁপা সে ওই লুকিয়ে পাতায়!

চাঁপা বলে—কথা আমি
কইবনাকো তোমার সনে,
মানুষগুলো এমনি খেলো
কিচ্ছু কি তার রয় না মনে?
আমি তো কই যাইনি ভুলে
সেই কালো সেই রিশমি চুলে,
নরম-নরম দু-আঙুলে
আমায় তুলে পরতো খোঁপায়!

ভোরের আকাশ—কও না কথা,
ফুলেরা তো সবাই মিলে
একটা কথায় জবাবেতে
লক্ষ কথা শুনিয়ে দিলে!
আর যাবো না ফুলের বনে
বৃথা তাহার অন্বেষণে,
এত দেমাক ফুলের মনে!
ফুলের এত দেমাক মানায়?

মুখের পানে চেয়ে-চেয়ে
উঠলো বলে ভোরের আকাশ—
সময় আমায় নেইকো এখন,
কথা কবার নেই অবকাশ।
এমনি আমার ক্ষণিক জীবন
ঘনিয়ে দ্যাখো আসচে মরণ
আমার গালের গোলাপ-বরন
পাল্টাতে চোখ ওই গো পালায়!

সাঁঝের তারা সাঁঝের তারা—
তুমি কি ভাই বলতে পারো
হাওয়ার হরফ দিয়ে লেখা
উড়ে এলো চিঠি কার ও?
লাগচে চমক হৃদয়-মাঝে,
পড়চে বাধা সকল কাজে,
উড়িয়ে নিয়ে মনখানা যে
কোন সুদূরে ভাসিয়ে নে যায়!

সাঁঝের তারা মৌন মুখে
রইল চেয়ে মুখের পানে,
স্থির-অপলক দৃষ্টি তাহার
মগ্ন যেন কিসের ধ্যানে!
চাঁদের আলো তোমায় তবে
ওই কথাটি বলতে হবে;
চাঁদের আলোও রয় নীরবে
এলিয়ে পড়ে ঝিমিয়ে নেশায়!

ঝিঁঝির পাঁজর বাজিয়ে পায়ে
আঁচল-বায়ে নিবিয়ে বাতি
কে এলো রে? কে এলো রে?—
নিঝুম রাতি—নিঝুম রাতি!
বল্লে—ক্ষ্যাপা এই আঁধারে
খুঁজে-খুঁজে মরিস কারে?
সে যে নদীর অপর পারে
রয়েছে তোর আশায়-আশায়!

দীপান্তরে

সাত বছরের আগের কথা—এমনিতর মাঘ মাসে
কাঠগড়াতে দাঁড়িয়ে আমি—হাকিম বসে এজ্‌লাসে
হুকুম দিলে—হল তোমার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর—
পড়লো ভেঙে আকাশখানা হঠাৎ যেন মাথার পর!
বুড়ো মানুষ বাবা আমার দাঁড়িয়েছিল সেইখানে—
ভিরমি গেল ; চাইলে ছেলে করুণ চোখে মুখপানে!
সেদিনের সেই দারুণ ছবি ভুলতে নারি একটাও,
ঘোরাও ঘানি, পাকাও দড়ি, পাথর ভাঙ, হেঁইয়া-হো!

সাক্ষী-সাবুদ গড়াপেটা এমনি তালিম্ তৈরি গো!
প্রমাণ করে দিলে সটান্ আমি রাজার বৈরী গো!
রাজার রাজা আছেন যিনি সকল রাজার মাথার পর,
যাঁহার আদেশ যাঁহার আইন যাঁহার বাণী-কণ্ঠস্বর
বুকের ভিতর নিত্য বাজে, তাঁহার আদেশ শুনতে গে'
রাজদ্রোহের অপরাধে গেলেম পড়ে মাঝ থেকে!
নির্বাসনের দণ্ড শিরে তাঁহারি জয়-গান গাহ!
ঘোরাও ঘানি, পাকাও দড়ি, পাথর ভাঙ, হেঁইয়া-হো!

সাত বছরের পরে আজো সাত-সুমুদ্দর অন্তরে,
মনখানা মোর উড়িয়ে নে যায় কে জানে কোন্ মন্তরে,
সেই যেখানে নদীর কূলে বাংলা দেশের গ্রামখানি,
পাল তুলে ধায় জেলের ডিঙি সব্‌জে-সাদা-আসমানি!
সেই যেখানে এমনি সময় আমের গাছে বোল ধরে,
ছেলেরা সব ওড়ায় ঘুড়ি সজ্‌নে গাছে ফুল ঝরে,
পুরোনো সেই দিনের কথা ভুলতে নারি একটাও!
ঘোরাও ঘানি, পাকাও দড়ি, পাথর ভাঙ, হেঁইয়া-হো!

বাংলা দেশের গ্রামখানি সেই! বাংলা দেশের গ্রামখানি!
এই দুনিয়ার মাথার মণি—এই দুনিয়ার রাজধানী!
যাহার মাটির স্বর্ণ-রেণু জড়িয়ে আছে অঙ্গেতে,
শুনি-যাহার আশীর্বাণী নির্যাতনে কান পেতে,
সেই যেখানে ছেলেবেলায় পড়তে যেতেম পাঠশালে,
টাঙিয়ে দোলা খেতেম দোলা কাঁঠাল গাছের শির-ডালে,
লাফ খেতে সেই নৌকা থেকে কী আমোদ কী উৎসাহ!
ঘোরাও ঘানি, পাকাও দড়ি, পাথর ভাঙ, হেঁইয়া-হো!

সেই যেখানে দিনু কুমোর চাক্ ঘোরাতো রাত্রি-দিন,
বল্‌তো—মশাই এমন হাঁড়ি পাবেন কোথা? বাজিয়ে নিন!
ময়রাবুড়ো গড়তো মেঠাই চন্দ্রপুলি-ক্ষিরের ছাঁচ,
পথে-পথে করতো ফিরি ইলিশ-ফ্যাঁসা-খয়রা মাছ,
নিমাই পুরুত পাঁজি হাতে কেবল লাভের সন্ধানে
নামাবলী জড়িয়ে গায়ে ফিরতো পাড়ার সবখানে!
সেই যেখানে বন-ভোজনে মিলতেম প্রতি সপ্তাহ,
ঘোরাও ঘানি, পাকাও দড়ি, পাথর ভাঙ, হেঁইয়া-হো!

হায় কোথা সেই মেঠো হাওয়া—বাংলা দেশের মিঠে জল!
বেল-চামেলি ফুলের ফসল, প্যায়রা-আতা-দালিম্ ফল!
হায় কোথা যে গেল আমার সাধের পোষা পায়রা গো!
বোনগুলি সব কোথায় এখন বুক-জুড়োনো ভা'য়রা গো!
আর কি বাবা আছেন বেঁচে? নেই কখনো নেই বেঁচে!
মা-মরা তার কোলের ছেলে কোল থেকে যে পালিয়েছে!
অতীতপানে তাকিয়ে কেন হায় মূঢ় মন আর চাহ!
ঘোরাও ঘানি, পাকাও দড়ি, পাথর ভাঙ, হেঁইয়া-হো!

আর সে আমার খোকাবাবু অভিমানী আব্দারে,
বায়না যে তার মুহুর্মুহু ভোলায় এখন কে তারে!
বারো বছর বয়েস হল—হয়তো তারে ইস্কুলে
কয়েদ রেখে দ্যাখ গো তারা, অঙ্ক কষায় বই খুলে!
আর কি এখন মা তার তেমন আলতা পরে? চুল বাঁধে?
হায় অভাগী তোর তরে যে আজও আমার প্রাণ কাঁদে।
চোখের আড়াল হতে যে তোর জো ছিল না এক পাও,
ঘোরাও ঘানি, পাকাও দড়ি, পাথর ভাঙ, হেঁইয়া-হো!

জ্‌লচে স্মৃতির অনলশিখা—খাক্ হলোরে বুক জ্বলে!
আয়রে ডাকাত! আয় জালিয়াত্! বুকে আমার আয় চলে!
আয়রে খুনি! জড়িয়ে তোরে বুকটা আমার ঠাণ্ডা হোক্,
তোরা মানুষ; তোদের পরশ মুছবে আমার অনেক শোক,
তোদের ঘৃণা করিনেকো—তোদের সমান অবস্থায়
পড়লে পরে, তোদের মতো খুন-ডাকাতি-জালের দায়
আমায়ও যে ঠেকতে হতো—ঠেকতে হতো আমায়ও,
ঘোরাও ঘানি, পাকাও দড়ি, পাথর ভাঙ, হেঁইয়া-হো!

ঘৃণা তোদের কোর্বো কি বল? তোরা আমার আত্মীয়!
নির্বাসনের বন্ধু তোরা, নির্যাতনের সঙ্গীও!

ও খুনি ভাই, দাদা বলে ডাকবো তোমার আজ থেকে,
ডাকাতবুড়ো তুমি খুড়ো,—গেছে তোমার চুল পেকে ;
যুক্ত হয়ে তোদের সাথে মুক্ত হল আমার প্রাণ,
ধন্য আজি চরণ-শিকল, ধন্য আজি আন্দামান!
যাঁর করুণায় নতুন জীবন তাঁহারি জয়গান গাহ!
ঘোরাও ঘানি, পাকাও দড়ি, পাথর ভাঙ, হেঁইয়া-হো!

অতিথি

নির্জন প্রান্তরে
চলেছে কে যাত্রী?
—ধু-ধু-ধু-ধু জ্যোচ্ছনা,
ঝক্‌মকে রাত্রি—

স্বপ্নের জুঁই-বেল
চলেছে সে ছড়িয়ে,
সুপ্তির সুষমাটি
চোখে তার জড়িয়ে ;

গান গায় বয়ে যায়
অমৃতের ঝরনা,
এ তো ধুলো-কাদা মাখা
পৃথিবীর স্বর-না ;

যা লো সখি যা লো ছুটে
ডেকে তারে আন্‌তো,
যায়-যায় চলে যায়
কে বিদেশি পান্থ!

এসো-এসো হে অতিথি,
মুখ তুলে চাও গো!
যে গানটি গাইছিলে
সে গানটি গাও গো!

ভরে দাও হাসি-গানে
সমুদায় সৃষ্টি,
চেয়ে দ্যাখো আজকের
রাতটি কি মিষ্টি!

তরুলতা-তৃণদলে
আলো করে নৃত্য,
তারা করে ঝল্‌মল্‌
দুলে ওঠে চিত্ত ;

চায় প্রাণ ছাড়া পেতে—
চায় পেতে মুক্তি—
শুনচে না মন আজ—
কোন মানা-যুক্তি ;

অজানার-অচেনার
যাচে তাই সঙ্গ,
সরমের শৃঙ্খল
ছিঁড়ে একদম্‌ গো!

ক্ষমা কর ধৃষ্টতা
ক্ষম মোর উক্তি—
বলেচি তো মন মোর
মানচে না যুক্তি!

উড়ো পাখি একঝাঁক্‌
যায় দ্যাখো বেরিয়ে,
আলোকের পারাপার
পাড়ি মেরে পেরিয়ে ;

সাধ যায় প্রান্তর
কান্তার লঙ্ঘি—
ওরি পিছে-পিছে ছুটি—
পাই যদি সঙ্গী!

নয় বঁধু এসো তুমি
নাও মোরে ছিনিয়ে,
দাও মোরে বিপথের
পথকটা চিনিয়ে!

কাঁটা আছে? ভয় নেই,—
কাঁটা তাতে ভয় কি?
তুমি যদি রাখ বুকে,
বুকে ভয় রয় কি।

চলো বঁধু চলো-চলো
    দুর্গম তীর্থে—
প্রণয় কি কল্পনা?
    প্রেম, সে কি মিথ্যে?

হে নিঠুর! ঘৃণা-ভরে
    উঠে তুমি চল্লে!
ভালো কথা একটাও
    আমারে না বল্লে!

পায়ে পড়ি যেওনাকো
    থাকো আজ রাতটা,—
ঢং-ঢং ঘড়ি বাজে—
    একি! বেলা সাতটা!

যা লো সখি যা লো ছুটে
    দে না জল চড়িয়ে,
স্বপ্নের ঘোর চোখে
    এখনো যে জড়িয়ে!

কোথা গেল সে বিদেশি
    দেখা নেই তার তো।
যাবে যদি "চা"টা খেয়ে
    গেলেই তো পারত!

খোকার ব্যথা

ঠাকুরমা তুই সত্যি করে বল
    মাকে কি মোর পরী এসে
    উড়িয়ে নিল চাঁদের দেশে?
এ কি কেন ফেলিস চোখে জল!
    আমি তখন ছোট ছিলেম
        ঘুমিয়ে ছিলেম ঘরে,
    তুই গেছলি গঙ্গাস্নানে,
        দেখলি এসে পরে—
যেখানকার যা সবই আছে তাই
    মা-টি আমার নাই!

তাইতো আমি সন্ধে হলে রোজ—
তাকিয়ে থাকি চাঁদের পানে
পাই যদি তার কোনোখানে
হারিয়ে-যাওয়া মায়ের আমার খোঁজ!
ভাবি আমি হঠাৎ নেমে
মা যদি মোর আসে,
জড়িয়ে কোলে তুলে আমায়
আদর করে হাসে,
বলে—আমি এই যে হেথা খোকা
কাঁদিস কেন বোকা!

কেমনতর সেই-সে চাঁদের দেশ?
সেথায় আলো শুধুই আলো,
নেইকো কিছুই মলিন-কালো,
নেইকো আঁধার নেইকো ছায়ার লেশ?
গাছে সেথায় কী ফুল ফোটে?
গাহে কী গান পাখি?
পরীরা সব উড়ে বেড়ায়
ফুলের পরাগ মাখি?
কেবল খেলা কেবল সেথা খেলা—
সারা দুপুরবেলা?

ঠাকুরমা তুই সত্যি করে বল—
মার কি মোরে পড়ে মনে
চাঁদের দেশে ফুলের বনে
এমনিতর ফেলে চোখের জল?
আমার কেন উড়িয়ে সেথায়
নে যায়নাকো পরী?
কী করলে যাই মায়ের কাছে
বল না পয়ে ধরি!
একটু আমার বুঝিসনেকো ব্যথা—
কস্‌নে কেন কথা?

মা কি আমার সত্যি আকাশ-পার?
এখন কারে বকে-ঝকে
পরিয়ে কাজল দ্যায় সে চোখে?
দুধ খাওয়াতে সাধে বারম্বার?

কারে এখন গল্প শোনায়
সন্ধে হলে পরে?
খায় সে চুমা দ্যায় সে চুমা
জড়িয়ে বুকে ধরে?
আজকে আমার জাগচে ক্ষণে-ক্ষণে
এই কথাটা মনে!

আয় মা নেমে আয় গো নেমে আয়-
এই কথাটি আমার রাখো,
দুষ্টুমি আর করবোনাকো,
লক্ষ্মী হব—ধরচি দুটি পায়!
এখন আমি এ বি পড়ি,
ইস্কুলে যাই রোজ,
ট্রাইসিকিলে চড়তে পারি,
তুই নিলিনে খোঁজ!
বাগানে মোর ফুটেচে বেল জুঁই
দেখলিনেকো তুই!

হাসি-খেলি পাই না তবু সুখ—
আমার দুটি চোখের আগে—
সকল সময় কেবল জাগে—
হারিয়ে যাওয়া আবছায়া তোর মুখ!
সকলকারই মা রয়েছে
আমার শুধু নেই,
আমার কেন এমন হল
পাই না ভেবে খেই ;
কান্না কেন উথলে ওঠে চোখে!
বুঝবে কি তা লোকে!

দুনিয়াদারী

আরে বন্ধু এসো এসো, অনেক দিনের পরে দেখা—কেমন আছ?
খপর তো হে ভালো?
ওরে রামা, কোথায় গেলি? দেনা তামাক, সন্ধে হল নেইকো খেয়াল?
জ্বালনা ঘরে আলো?

কি হে তুমি খাও না তামাক! সাধু-পুরুষ হলে আবার কবে?
চা খেতে তো আপত্তি নেই? এক পেয়ালা চা পান করোই তবে।
আজকে রাতে ছাড়চিনাকো—এইখানেতেই তোমার নিমন্ত্রণ ;
কোন্ ঠিকানায় আছ বল? খপর দিতে পাঠাচ্চি একজন ;
ছেলে-মেয়ে কটি হল? কত বড় তারা?
বল কি হে একটি ছেলে সেদিন গেছে মারা!
বলছিলে কি? কথা আছে? চলো-চলো বারাণ্ডাতে চলো,
দিব্যি সেথায় নিরিবিলি—বইচে হাওয়া—কী বলছিলে বলো।

মেয়ের বিয়ে? শুনে বড় আনন্দিত হলেম আমি। বর্ধমানেই
ছেলেব বাপের বাড়ি
শাশুড়ি নেই ননদও নেই—এ তো অতি ভালো কথা ; মেয়ের দেখছি
বরাত ভালো ভারি!
ছেলেটি কি? পড়চে বি এ! বাপেরও বেশ পয়সা-কড়ি আছে—
শুভকার্যে বিলম্ব কি? অমন পাত্র বাড়ির অমন কাছে
ছাড়ে কি কেউ? কিন্তু তাদের বলচো তুমি টাকার বড় খাঁই—
গয়না বাদে নগদ-নগদ তিনটি হাজার গুনে দেওয়াই চাই।
ছেলের বাজার বেজায় গরম—উপায় তার কি বলো?
সভা করে বক্তৃতা দে নেই এর কোন ফলও।
তবু দ্যাখো চেষ্টা করে যদি কিছু কমেসমে পারো,
এমনই কি তাড়াতাড়ি? মেয়ের বয়েস সবে তো এই বারো।

অবাক্ কল্লে! আজ বাদে কাল মেয়ের বিয়ে ; বলচো তুমি সমস্তটা
টাকার জোগাড় নাই,
বারো-বাবো বয়েস হল মেয়ের তোমার ; এতদিন কি নির্ভাবনায়
ঘুমুচ্ছিলে ভাই!
ছেলে-মেয়ের জন্ম দিয়েই আমরা খালাস—ভাবেন অনেক বাপ,
এত করে সমাজেতে ক্রমাগতই বেড়ে যাচ্ছে পাপ,
বাড়চে দুঃখ বাড়চে দৈন্য তবু লোকের ভাঙচেনাকো ভুল,
দায়িত্বহীন বিয়ের হচ্ছে এই সমাজের সব অনর্থের মূল।
হয়তো আমার কথাগুলো লাগবে কানে রূঢ়,
কিন্তু দ্যাখো চুল পেকেচে—হয়ে গেলাম বুড়ো—
স্পষ্ট কথা মনে যা হয় স্পষ্ট করে মুখেই ফেলি বলে,
বন্ধু চটে—নাচার তাতে, বোসো বোসো—যাচ্ছ কোথা চলে?

এই পৃথিবী কঠিন ভারি— বি-এ এম্-এর্ কর্ম সে নয় সমঝে হেথা
বুঝে-সুঝে চলা,

এত বিদ্যে করলে জমা, ফল কি হল? মূর্খ আমি আমার মুখে
মানায়নাকো বলা
এ সব কথা—তবে কিনা ভবিষ্যতে এমন ফেরে আর

পড়তে না হয়—বে-আন্দাজি খরচ করে লোকের কাছে ধার
চাইতে না হয়—তারি জন্যে বন্ধুভাবে বলচি এসব আমি
—কাপড় বুঝে জামা কাট—ইংরাজের এই প্রবাদ ভারি দামি।
আহা-আহা উঠচো কেন? এত কিসের তাড়া?
ট্রামেই যেও—লাগবে না হয় পাঁচটা পয়সা ভাড়া।
বাড়ির গাড়িই দিতুম আমি কোচোয়ানটা দুদিন পড়ে জ্বরে,
মোটরখানাও বেকল হয়ে—পড়ে আছে আস্তাবলের ঘরে!

হ্যাঁ যে কথা বলতেছিলুম—আছে বটে আমার কিছু যৎসামান্য
বিষয়-আশয়-আয়,
কিন্তু আমার খরচ-পত্র এত বেশি অনেক সময় মান সম্ভ্রম
বাঁচিয়ে চলাই দায়।
তোমরা দ্যাখো মোটর চড়ি ফেটিং হাঁকাই কিন্তু ইহার পিছু
কতগুলি ঢালতে যে হয় হিসেব তাহার নাও না তো কেউ কিছু!
তার উপরে গিন্নি আমার এত অবুঝ—খরচে এত বেশি ;
এমনিভাবে চল্লে পরে ফতুর আমায় করবে শেষাশেষি!
যত বলি বুঝে-বুঝে সমঝে একটু চলো,
আমল দ্যায় না মোট্ সে কথা—কেমন করে বলো—
পেরে উঠি এমনিতর প্রবল প্রতাপ গৃহ-শত্রুর সাথে?
শাসন-বারণ ঢের করেছি—উল্টে কেবল কেলেঙ্কারিই তাতে।
ধার দিও না ধার নিও না শুনতে পাই যে বলে গেছে ইংরাজের যে
সবার সেরা কবি,
সাধে কি আর জাতটা বড়? বলতে পারে অমন একটা দামি কথা
তোমাদের ওই রবি?
ধার দিও না ধার নিও না আমারো ভাই এইটি হচ্চে 'মটো',
খোলাখুলি বল্লুম সবই—এতে যদি আমার উপর চটো,
করবে তুমি আমার প্রতি একটা বড় মস্ত অবিচার,
ভাববে তুমি ইচ্ছে করেই তোমায় আমি দিলুমনাকো ধার।
ঋণের চেয়ে নেই মহাপাপ ; তাহার চেয়ে ভালো
একবেলা সে খেয়ে থাকা ; এই যা গেল আলো।
ওরে রামা ওরে রামা গেলি কোথা? চলো নিচের হলে,
না না এই যে আলো এল! উঠচো কেন? পড়োনি তো জলে।

মানুষে যে কর্জ করে—অনেক সময় অভাবে নয়—কু-অভ্যাসের
দরুন শুধু খালি,
কত লোকের নেশাই হচ্চে কর্জ করা—পেশাই হচ্চে মহাজনকে
পাড়া তাদের গালি,
কর্জ করার কু-অভ্যাসটি অনেক স্থলে আপনি গজিয়ে ওঠে
সেই জন্যেই তো কর্জ দেবার পক্ষপাতী নয়কো আমি মোটে,
বিশেষত বন্ধুজনে—যারা আমার প্রাণের মতই প্রিয়,
টাকার সঙ্গে অনেক সময় যায় যে মারা সাবেক প্রণয়টিও।
টাকা ভারি পাজি জিনিস সব অনর্থের মূল,
—ঋষির বাক্য—নেইকো এতে একটি বর্ণ ভুল।
রুমাল দিয়ে একশোবারি ঘসচো যে চোখ—পড়লো কিছু চোখে?
কও না কথা আমিই খালি একনাগাড়ে যাচ্চি কেবল বকে!

এখন থেকে হিসেব করে চলতে শেখ—বুঝে-সুঝে খরচ করো
আয়ের অনুযায়ী,—
অদৃষ্টকে দোষ দিও না—ভাগ্য সে তো নিজের হাতে—মিথ্যে কেন
কর তারে দায়ী?
চাকর-বামুন তাড়িয়ে দিও—বড়-মান্‌ষি নয়কো অতো ভালো,
নিজের হাতে কিনবে জিনিস আনাজ-কোনাজ তেল-নুন-চাল-ডালও,
পরিবারকে বসিয়ে রেখে খেতে দেওয়া আহাম্মুকের কাজ।
বলবে তারে রেঁধে দিতে অসঙ্কোচে—নেইকো এতে লাজ ;
পরের হাতে লুচি-পোলাও-কোপ্তা-কাবাব চেয়েও
ঘরের রান্না শাক-অন্নও একশো গুণে শ্রেয় ;
শরীর খারাপ? ওষুধি তার দুটি বেলা হাঁড়ি নিয়ে বসা,
সকাল হলেই ঘটি-বাটি-থালা-গেলাস মাজা এবং ঘসা।

ওইখানেই যে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে—বুঝে দ্যাখো এমন কথার
নেইকো কিছু মানে,
রাজার ঘরে দিলেই বিয়ে হয় না রানী—আসল হচ্ছে মেয়ের বরাত—
কেই বা না এ জানে?
ওরি মধ্যে দেখে-শুনে যেখানে হয় সস্তা-গণ্ডা—দাও,
চেষ্টা করে খুঁজে দ্যাখো—বিনা পণে হতে পারে তাও,
শুনতে তো পাই ভালো-ভালো এমনতর আছে অনেক ছেলে
বিয়ে যারা করতে পারে হাসিমুখে কিচ্ছুও না পেলে ;
দৈনিকে কি সাপ্তাহিকে দাও না কেন ছেপে
নামটা না হয় আপাতত রাখলে তোমার চেপে।
একি! একি! পড়লে উঠে! আচ্ছা এসো—কে আছিস রে কে ও!
আসবে যখন কোলকাতাতে একবার করে দেখা করে যেও।

সংযোজন

নতুন খাতা



কিরনধন চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯৪০) প্রচ্ছদপত্র

নতুন-খাতা

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

মিত্র এণ্ড ঘোষ
১০নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নতুন খাতা দ্বিতীয়-সংস্করণের (১৯৪০) আখ্যাপত্র

দাম দেড় টাকা

দ্বিতীয় সংস্করণ

মিত্র এণ্ড ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীসুমথনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৫২।৩, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

নতুন খাতা দ্বিতীয়-সংস্করণের (১৯৪০) মুদ্রণ-বিবরণ-পত্র

ভূমিকা

বঙ্গভাষার কবিতা-পুস্তকের সংখ্যা অগণিত। প্রায় ৬৫ বৎসর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে' বলিয়াছেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার অভাব নাই। বরং অন্যান্য ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গলায় এই জাতীয় কবিতার আধিক্য।' বঙ্কিম-কথিত বাঙ্গালা গীতি-কবিতার ঐ 'আধিক্যের' মাত্রা বর্তমানে যে আরও বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা লিখিয়া যশ অর্জন করা যে কৃতিত্বের পরিচায়ক, তাহা বোধকরি সকলেই স্বীকার করিবেন। আমার মনে হয়, স্বর্গত কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কাব্য সাধনার ব্রতী হইয়া সে যশ অর্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব, এ দুইই এ সংসারে সুদুর্লভ সামগ্রী। কবি কিরণধন এ দুয়েরই অধিকারী হইয়াছিলেন। ইংরাজি সাহিত্য ও ইয়োরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। এই দুই বিষয়েই তিনি দুইবার এম্. এ. পরীক্ষা দিয়া দুইবারই উত্তীর্ণ হন। পরে শ্রীরামপুর, হেতমপুর ও হাওড়ার কলেজে অধ্যাপকের কার্য করিয়াছিলেন। এ কার্যেও তিনি ছাত্র-সমাজের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে মাতুলালয়ে কবির জন্ম হয়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। সম্প্রতি তাঁহার 'নতুন-খাতা' কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয়-সংস্করণ প্রকাশিত হইল। যে কবির যে কবিতা-পুস্তকের দ্বিতীয়-সংস্করণ প্রকাশিত হয়, সে কবির সে কবিতা-পুস্তক সম্বন্ধে বেশি কিছু বলা নিস্প্রয়োজন। 'নতুন-খাতার' নতুনত্ব না থাকিলে তাহার অদৃষ্টে দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়া নিশ্চয়ই দুর্ঘট হইত। নূতনত্ব ও রসাত্মকতা, এই দুই গুণেরই পরিচয় এই 'নতুন-খাতার' অনেক স্থলেই সুপ্রাপ্য। ইহার বহুল প্রচার আমি কামনা করি।

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কী কথাটি?

এসেছিলেম একটি কথা কইতে তোমার কানে-কানে,
হায় গো সেটি হারিয়ে গেল যাই তাকালে মুখের পানে!
কী কথাটি? কোন্ কথাটি?
বুকের গোপন কোন্ ব্যথাটি?
ফুট্‌তে না ফুল কোন্ লতাটি শুকিয়ে গেল? কে তা জানে!
ভেবেছিলেম একটি কথা কইব তোমার কানে-কানে।

বলছিলেম কি—তোমার দুটি রাঙা-রাঙা নরম গালে—
ওই যা আবার গেলেম ভুলে! ফিরে কেন ফের তাকালে?
সবুর কর—দেখ্‌ছি ভেবে,
চাইছি একটা জিনিস—দেবে?
না-না একটা হরিণ নেবে?—এনে দেব কাল সকালে!
ভুলে গেলেম বলছিলেম কি, তোমার দুটি রঙিন গালে।

ও কথা নয়, ও কথা নয়—অন্য কথা বল্‌তে ছিল,
তোমার চোখের চম্‌কে চাওয়া চমক আমায় লাগিয়ে দিল।
পড়্‌চে মনে, পড়্‌চে মনে,
এইবারে এই এতক্ষণে,
তোমার হাসি ঠোঁটের কোণে গোলাপ কুঁড়ি কুড়িয়ে নিল!
ও কথা নয়, ও কথা নয়—অন্য কথা বল্‌তে ছিল!

দেখলে তোমার রকম-সকম মুখখানি ছল-রঙ্গভরা,
বড্ডো আমার ইচ্ছে করে—ইচ্ছে করে—সয় না ত্বরা,
তার পরের কি কথাগুলি,
ওই যা আবার গেলেম ভুলি,
তোমার গালে পেয়ারাফুলি রঙটি আমের পড়লো ধরা!
কি জানি কি ইচ্ছে করে দেখলে তোমার রঙ্গ করা!

তুমি দেবী কল্পলোকের—মর্ত্যলোকের নও মানবী,
আমি ঘৃণ্য বন্য-পশু হিংস্র ভীষণ মাংস-লোভী,
তোমার আঁখির দৃষ্টিতলে
কী অপরূপ দীপ্তি জ্বলে!

বক্ষে তোমার তৃপ্তি ফলে—ধন্য হলেম সঙ্গ লভি!
তুমি দেবী কল্পলোকের—মর্ত্যলোকের নও মানবী!

কি বলতে কি ফেলচি বলে—পাগল আমি হলেম নাকি?
আবোল-তাবোল বক্‌চি কেবল—আসল কথা রইল বাকি।
হায় ভোলা মন সর্বনেশে,
নাকাল আমায় করল শেষে.
একটি কথা বল্‌তে এসে—আর এক কথা বল্‌তে থাকি!
কি বল্‌তে কি ফেলচি বলে পাগল আমি হলেম নাকি?

কৌতুকে ও কৌতূহলে উপ্‌চে তোমার পড়্‌চে হাসি,
ওগো আমি বড্ডো তোমায় বড্ডো তোমায় —এখন আসি ;
এবার যখন আসবো কাছে,
আনবো লিখে ভুল হয় পাছে
কী কথাটি বল্‌তে আছে—তিরিশটি দিন বারোমাসই।
কৌতুকে ও কৌতূহলে ঠিক্‌রে পড়ে তোমার হাসি!

যে কথাটি ভেবেছিলেম কইব তোমার কানে-কানে,
হায় গো সেটি হারিয়ে গেল যাই তাকালে মুখের পানে!
কী কথাটি? কোন্ কথাটি?
বুকের গোপন কোন্ ব্যথাটি?
ফুট্‌তে না ফুল কোন্ লতাটি শুকিয়ে গেল? কে তা জানে।
ভেবেছিলেম একটি কথা কইব তোমার কানে-কানে।

জলের ঘাটে

রূপসীরা ভিড় করেছে রূপ দেখাতে রূপের হাটে—
ননদি, আজ দেখে এলেম আন্‌তে গে জল জলের ঘাটে,
পদ্ম ফুলের মতন কেহ
ভাসচে জলে এলিয়ে দেহ,
বাঁকিযে গ্রীবা হাঁসের মতো কেউ বা আবার সাঁতার কাটে,
দেখে এলেম জলের ঘাটে!

দিঘির পাড়ে বাঁশের ঝাঁড়ে লুকিয়ে পাতায় ডাক্‌ছে পাখি,
অস্ত-রবির রক্তে রাঙা আকাশখানা মাখামাখি!
আনমনে কেউ কলস নাচায়
সখীর ডাকে ফিরেও না চায়,

আজ কেন বর এলোনাকো সেই কথা সে ভাব্‌চে নাকি!
অলস সুরে গাইচে পাখি!

রঙ্গিণী এক রঙ্গ করে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে গায়ে,
"উহু-উহু করিস কি ভাই?"—সঙ্গিণী কয় আল্‌তা-পায়ে,
গোলাপ-কুঁড়ি অলক পরে
কেউ তরুণী পরখ করে
সখীর "সাধের" সোনার চুড়ি বাড়িয়ে বাহু দাঁড়িয়ে বাঁয়ে
নীল শাড়িটি জড়িয়ে গায়ে!

ননদ-ভাজে জায়ে-জায়ে ঝগড়া-ঝাঁটির গল্প-হাসি,
এই বয়সে সখ প্রাণে খুব সাবান মাখে চাঁপার মাসি,
তুমুল তর্ক-আলোচনা
চল্‌চে, কানে যাচ্ছে শোনা,
জলে-স্থলে চল্‌কে পড়ে সুন্দরীদের রূপের রাশি!
—রং-তামাশা গল্প-হাসি!

রূপ সায়রের পদ্মবনে আমার কালো কুরূপ নিয়ে
কী ফাঁপরে পড়ে গেলেম! পালিয়ে এলেম খিড়কি দিয়ে,
অন্দরের এই অন্ধকারে
বন্ধ থাকা মানায় যারে,
তার কি সাজে লোক-সমাজে মুখ দেখানো বাইরে গিয়ে?
পালিয়ে এলেম খিড়কি দিয়ে।

পাছে কারো চোখ পড়ে যায়, ঘৃণায় কেহ ফিরায় আঁখি,
আপনারে তাই সঙ্গোপনে আড়াল করে আগ্‌লে রাখি ;
শ্রীহীনার এই ব্যর্থ জীবন
মুক্তি দেবে কবে মরণ?
কইব কারে প্রাণের ব্যথা? যে না জানে বুঝবে তাকি?
আড়ালে তাই লুকিয়ে থাকি।

তবুও তো দাদাটি তোর আমায় কত আদর করে,
নতমুখে রই নীরবে কৃতজ্ঞতায় অশ্রু ঝরে ;
উথ্‌লে ওঠে কানায়-কানায়
হৃদয়খানা কী বেদনায়!
ব্যর্থতার এই শূন্য ডালি দি অঞ্জলি চরণ পরে!
কৃতজ্ঞতায় অশ্রু ঝরে!

দেহে বিধি রূপ দিলে না, প্রাণে কেন প্রেম দিলে গো?
যায় না মারা দুটি পাখিই একবারে এক ঢিলে গো?
দেহও কাঁদে প্রাণও কাঁদে
এই বিরোধ এই বিসম্বাদে—
প্রতি পদে চল্‌তে বাধে—সারা হলেম গরমিলে গো!
প্রাণে কেন প্রেম দিলে গো?

দেহাতীত প্রেমের কথা কয় অনেকে শুনি-ই কানে,
আমি তো ভাই ইহার ভিতর পাই না খুঁজে কোনই মানে ;
গন্ধ যেমন ফুলের ফাঁদে
আপনাকে ওই আপনি বাঁধে,
তেমনিতর প্রেম ওলো ভাই দেহের বাঁধন-শাসন মানে!
নিছক প্রেমের পাইনে মানে!

কথায়-কথায় ঠাকুরঝি লো, এলেম সরে অনেক দূরে,
রূপসীদের হাট বসেছে আয় দেখে আয় খানিক ঘুরে ;
বইচে বাতাস শ্রান্তি-হরা,
স্বপ্ন-সুখ ও শান্তিভরা,
আকাশ ফেটে আলোর ঝলক পড়্‌চে, পাখি গাইচে সুরে,
জলের ঘাটে আয় লো ঘুরে!

ব্যথার ভুল

সকল কথা সারা হলো—শেষ কথাটি কানে-কানে,
কইব তারে মনে ছিল—রইল গাঁথা প্রাণে-প্রাণে ;
চিরজীবন রইল গোপন বুকের মাঝে প্রকাশ-ব্যথা,
তারি রাঙা রক্ত-রেখা আঁকি আমার গানে-গানে!

জ্যোৎস্নালোকে অশোক-শাখে কোকিল-পাখি যখন ডাকে,
ভাবি তখন সেই কথাটি বল্লে হতো হয়তো তাকে ;
কণ্ঠ আমার বিকল করে দিল স্নায়ুর দুর্বলতা,
কোথাও খুঁজে পেলেমনাকো হারিয়ে যাওয়া সাহসটাকে!

দুষ্টু হাসি মিষ্টি ঠোঁটে তাইতো চোখে দেখলে পরে,
আজো আমার হয় অনুতাপ—আজও আমায় পাগল করে ;
স্মৃতির বাসি গোলাপ-জলে-ভিজিয়ে দে যায় আঁখির পাতা.
সৃষ্টি যেন ঝাপ্‌সা হয়ে মিলিয়ে আসে দৃষ্টি-'পরে!

অসীম-অপার-নীল পারাবার সামনে দেখি উঠচে দুলে,
প্রবাল-দ্বীপে রূপের রানী দেখচে তুফান জানলা খুলে ;
দুঃসাহসী দিচ্ছে পাড়ি—মাস্তুলের ওই কাঁপচে মাথা,
ওই রে তরী তলিয়ে গেল কূল না পেয়ে কোন্ অকূলে।

লাগিয়ে চমক জাগিয়ে দিয়ে কোথাকার এক পাগ্‌লি এসে
বারে বারে কয় আমারে, ফুটিয়ে গোলাপ রঙিন হেসে—
"বলো-বলো আমায় বলো, কোন্ কথাটি বল্‌তে বাকি?
—মিনতি তার সজল হয়ে নয়ন-কোণে ওঠে ভেসে!

"অতীতকালের কবর খুঁড়ে কঙ্কালেরি অন্বেষণে
কেন মিছে ছুটে বেড়াও? —আগুন ওড়াও ফুলের বনে?
হাসির বাঁশি বাজাও কবি—বিলাপ-গীতি বন্ধ রাখি",
এই ধরো এই মালাখানি—প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদন এ!

—বলো-বলো আমায় বলো, কোন্ কথাটি বল্‌তে বাকি,
তোমার বুকের বোঝাখানি আমার বুকে নামিয়ে রাখি।"
--একটি করুণ দীর্ঘশ্বাসে ব্যাকুল করে বাতাসটাকে
মৌন-নীরব-বাক্যহারা-থির-অচপল দাঁড়িয়ে থাকি।

কণ্ঠ হতে মাল্য আমার কণ্ঠে তারে পরাই খুলে,
—ঠিক যেন এই সেই প্রতিমা আবার বুঝি এলো ভুলে।
দুঃখ-সুখের রাগরাগিনী যুগল সুরে বাজায় বাঁশি,
স্বপ্ন-জাগরণের মায়া সঞ্চরে তার এলোচুলে!

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের

নতুন-খাতা

ও

অন্যান্য কবিতা

[অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত]

গুপ্ত প্রকাশনী
৮, গুপ্ত লেন, কলিকাতা—৬

নতুন খাতা তৃতীয়-সংস্করণের (১৯৫৩) আখ্যাপত্র

প্রকাশক :
শ্রীসুনীলকৃষ্ণ গুপ্ত
গুপ্ত প্রকাশনী
৮, গুপ্ত লেন, কলিকাতা—৬

দাম—তিন টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী
পরিচয় প্রেস
৮বি, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা-৬

নতুন খাতা তৃতীয়-সংস্করণের (১৯৫৩) মুদ্রণ-বিবরণ-পত্র

কবিপরিচিতি

কবিতার সংজ্ঞা সম্পর্কে মতামতের অন্ত নেই। রসাত্মক বাক্যই হল কাব্য।—আমাদের দেশের রসবাদীরা এই মন্তব্যটি পরিবেশন করে গেছেন। তারপর আরো বহু কথা বলা হয়েছে,—আরো নানান্ মতামতে অলঙ্কার শাস্ত্রের পুঁথির কলেবর ক্রমশঃ অতিকায় হয়ে উঠেছে।

প্রায় বছর পনেরো আগে প্রকাশিত একখানি ইংরেজি কাব্য-সংকলনের ভূমিকায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছিল :—কবিতার শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা হল স্মরণীয়তম ভাষণ! সম্পাদকদের মধ্যে একজন ছিলেন W. H. Auden। Auden-এর কবি-খ্যাতি সুবিদিত। তথাপি নৈয়ায়িকের চোখে এ সংজ্ঞা অচল। কারণ, 'স্মরণীয়তম ভাষণ'—কথাটা শুধু যে শ্রেষ্ঠ কবিতার সম্পর্কেই খাটে, তা নয়। ব্যাক্তি বিশেষের রুচি, অভিজ্ঞতা ও প্রবণতায় যে-ভাষণ স্মরণীয়তম,—সর্বক্ষেত্রে তা কবিতা নাও হতে পাবে।

তথাপি, মানবসভ্যতার স্মরণীয় সৃষ্টিগুলির মধ্যে সাহিত্য যে অন্যতম, তাতে সন্দেহ নেই। এক একটি দেশ-কালের রসানুভূতির সাহিত্যের প্রবাহে এসে সার্থক হয়েছে। বাংলা দেশে আঠারোর শতকের স্মরণীয়তম কথা-কাহিনী ফুটেছে ভারতচন্দ্রের কাব্যে। উনিশের শতকে মধুসূদন প্রভৃতি কবিনেতৃমণ্ডলী সমকালীন রসানুভূতিকে কবিতার রূপে-রসে-বৈচিত্র্যে চিরন্তন করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আশ্রয় পেয়েছে প্রাচীন ও নবীন ভারতের ঐতিহ্য,—তার আত্মাবিষ্কারের শ্রদ্ধা, সংশয়, বিশ্বাস, অবিশ্বাস—অসীম উৎসাহ,—অদম্য ব্যাকুলতা!

রবীন্দ্রনাথের বয়ঃকনিষ্ঠ বাঙ্গালি কবিরাও তাঁদের সমকালীন জীবন-জিজ্ঞাসার ভিন্ন ভিন্ন স্তর থেকে নিজের নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী আপন আপন দেশকালের প্রতিনিধিত্ব করে গেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রনাথ সেন, মোহিতলাল মজুমদার, কালিদাস রায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইস্লাম,—এবং এঁদের সমসাময়িক ও উত্তরবর্তী কবিরা রবীন্দ্র-প্রভাবের মধ্যে বাস করে আপন আপন মননসামর্থ্য ও আবেগধর্ম অনুসারে বাংলা কাব্যকলার অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন! বলা বাহুল্য, এদের সকলের প্রয়াসও সমান নয়,—প্রত্যেকের সিদ্ধিও সমপরিমিত নয়। কিন্তু এই কবিগোষ্ঠীর মধ্যে মননগত একটি গভীর ঐক্য বিশশতকের উত্তরার্ধে, বিশেষত আজকের দিনে নিশ্চিতভাবে চোখে পড়ে, কবিতার প্রতি শিষ্টাবোধ কাব্যকলার প্রতি গভীর শ্রদ্ধানুভূতি,—রবীন্দ্রনাথের কীর্তি সম্পর্কে প্রভূত প্রীতি ও সম্ভ্রম,—এবং সর্বোপরি, ভোগস্পৃহার ইতস্ততঃ স্ফুরণ সত্ত্বেও—পারমার্থিকতার প্রতি অতি ধ্রুব এক আর্কষণ এঁদের কাব্যসৃষ্টির মৌল প্রেরণাবৈচিত্র্যের মধ্যে নিশ্চিত ভাবে বিদ্যমান। ছন্দে সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথের অতি-মনোযোগ, যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের দুঃখবাদ, নিসর্গ শোভা সম্পর্কে কুমুদরঞ্জন-করুণানিধানের আগ্রহাতিরেক, এ-সব বৈশিষ্ট্য হিসেব করে এঁদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভেদ করা দুঃসাধ্য নয়, কিন্তু বিশ শতকের

রাজনৈতিক ও সামাজিক নানা আলোড়নের মধ্যে বাস করেও যে দুর্ভেদ্য পরমার্থ-বিশ্বাসে এঁরা নিজেদের অস্তিত্বের সংহতিবোধটি জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে পরস্পরের কাছে এবং বিচক্ষণ পাঠকের চোখে নিত্য জাগরূক রেখেছিলেন,—বাংলা কাব্যের পরবর্তী অধ্যায়ে ক্রমশঃ ঝাপসা হতে হতে একেবারে হাল আমলের কবিতায় তা প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। ওপরে যে কবিদের নাম করা হয়েছে, বলা বাহুল্য, তাঁরা ছাড়া আরো কয়েকজন শক্তিমান কবি উক্ত পর্বের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। সকলের নামোল্লেখ করা এখানে সম্ভব হল না, কিন্তু এই কবিগোষ্ঠির সকলের প্রতিই পাঠকের অল্পবিস্তর শ্রদ্ধা অবশ্যম্ভাবী।

এই পর্বের শেষবর্তী নজরুল ইস্‌লামের কবিতায় যে নতুন উদ্দীপনা ধ্বনিত হয়েছে, সমসাময়িক কাব্যের দুঃখবাদ, সমাজচেতনা, পরমার্থবোধ, নিসর্গবিলাস, ছন্দচাতুর্য ইত্যাদি সর্ব বৈশিষ্ট্য অতিক্রম করে তা একটি পরম অভিনবত্বের আদর্শ স্থাপন করেছিল। এই পর্বের কবি মোহিতলাল,—পরবর্তী পর্বের কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং আরও অনেকে জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে নজরুল ইসলামের প্রভাববেষ্টনীর মধ্যে আকৃষ্ট যে হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।

১৯১০ থেকে ১৯৩৫,—মোটামুটি এই পঁচিশ বছরের বাংলা কবিতার দিকে চোখ রাখলে সমকালীন কাব্যপ্রয়াসে যে তিনজন কবির কাব্যাদর্শের অনুকরণ সর্বাধিক পরিমাণে পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়, যথাক্রমে তাঁরা হলেন :—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং কাজী নজরুল ইসলাম। কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায় বিশ শতকের বাংলা কাব্যের এই ত্রিবেণী-সংগমে বাস করে 'নতুন-খাতা' নামে একখানি কবিতার বই ছেপে বার করেন বাংলা ১৩৩০ সালে (ইং ১৯২৩)। এই সংস্করণে সর্বসমেত কবিতা ছিল ৪২টি। এই ঘটনার বছর তিনেক আগে ১৯২০-তে তাঁর পত্নীবিয়োগের সঙ্গেই কিরণধনের কাব্যরচনার সূত্রপাত হয়। সম্ভবতঃ 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'নিদ্রাহীনের স্বপ্ন'—কবিতাটিই তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা।

কবির মাসতুতো ভাই ঁমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের আহ্বানে তিনি তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যপত্র 'ভারতী'-র পরিচালকগোষ্ঠির মজলিশে যোগ দেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাছাড়া কালিদাস রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি ছিলেন তাঁর প্রীতিভাজন সহকর্মী। 'ভারতী', 'বঙ্গবাণী', 'বিজলী', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'উত্তরা'. 'ভারতবর্ষ', 'মৌচাক', 'রংমশাল' ইত্যাদি পত্রিকায় একে একে তাঁর অনেকগুলি কবিতা ছাপা হয়।

কিরণধনের জীবনে ঘটনার বিচিত্র সমারোহ ছিল না। তিনি লালিত হয়েছিলেন উচ্চশিক্ষিত জমিদার বংশের আভিজাত্যে ও কৌলীন্যে ; ভবানীপুরে মাতুলালয়ে তিনি জন্মগ্রহন করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত উত্তরপাড়া পৈতৃক বাড়িতে বাস করেন ; ইংরেজি সাহিত্যে এবং দর্শনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষা পাশ করেন এবং তাছাড়া বি. এল্ পাশ করে প্রথম জীবনে হুগলির জেলা-আদালতে কিছুদিন ওকালতি-ও করেছিলেন ; যথাক্রমে হেতমপুর, শ্রীরামপুর, ও হাবড়া নরসিংহ দত্ত কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনাসূত্রেও তিনি নিযুক্ত ছিলেন।

বাংলা ১২৯৩-এর ৩রা ফাল্গুন (১৮৮৭ ইং) থেকে ১৩৩৮-এর ১০ই আশ্বিন (১৯৩১ ইং) অবধি মোটামুটি পঁয়তাল্লিশ বছরের আয়ুতে তীব্র অথবা দ্রুত কোনও উত্থান-পতনের অভিজ্ঞতা

তাঁকে ভোগ করতে হয়নি। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের কর্মমুখরতার আকর্ষণ তাঁকে কখনোই প্রবলভাবে আক্রমণ করেনি। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে উচ্চ-মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত, শান্তিপ্রিয় একটি কবিমানস কলকাতা, এবং শহরতলী—তথা বৃহত্তর বাংলা দেশের জীবনপ্রবাহে যে-সব তরঙ্গবিক্ষেপ লক্ষ্য করেছিল, কিরণধনের অনেক কবিতায় সেই সব তরঙ্গের প্রতিফলন-ই হল মুখ্য ব্যাপার। 'নতুন খাতার' প্রথম কবিতায় তিনি দুর্গত, লাঞ্ছিত, নিন্দিত জনসাধারণকে আহ্বান করে লিখেছিলেন :—

এস সবার বুকে আশার প্রদীপ একশো-মুখে দিই জ্বেলে,
ভয়ের মুখে তুড়ি মেরে এগিয়ে চলি পা ফেলে!

তবে, যাদের বুকে আশার প্রদীপ জ্বালবার তিনি স্বপ্ন দেখেছেন, তাদের জীবনের ক্লেদ ও গ্লানি, নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার প্রত্যক্ষ অংশীদার তিনি যে ছিলেন না, সেকথা বলা বাহুল্য। আপন কবিকল্পনার বিস্তারসূত্রে তাদের প্রতি সমবেদনা পোষণের দায়িত্ব তিনি কর্তব্য বোধে গ্রহণ করেছিলেন, এবং এতে তাঁর ঔদার্য ও মার্জনের ধ্রুবত্বই প্রমাণিত হয়েছে।

কিরণধনের 'নতুন খাতার' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৪০-এ ; এই সংস্করণে সর্বসমেত ৩৮টি কবিতা মুদ্রিত হয়। 'কি কথাটি', 'জলের ঘাটে' এবং 'ব্যথার ভুল'—এই তিনটি কবিতা এই সংস্করণের নতুন যোজনা ; প্রথম সংস্করণের 'শারদোৎসব', 'পয়লা তারিখ বোশেখ মাসে', 'ভিখিরি', 'বিরহে', 'বাহবা বেড়ে', 'বেশ্যা' এবং 'অতিথি' —এই সাতটি কবিতা এ সংস্করণে বাদ দেওয়া হয়। বর্তমান সংস্করণে প্রথম সংস্করণের সবগুলি কবিতাই ছাপা হল—তবে, প্রথম সংস্করণের কবিতা বিন্যাসের ক্রম বর্তমান সম্পাদকের পরিকল্পনা অনুসারে পরিবর্তিত হয়েছে। সূচীপত্রে কবিতার নামের পাশে পাশে প্রথম সংস্করণের ক্রমসংখ্যা বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে মুদ্রিত হল। দ্বিতীয় সংস্করণে একটি কবিতা ('কি কথাটি') এই সংস্করণে বাদ দেওয়া হল। তার কারণ, বর্তমান সংস্করণটি 'নতুন খাতার' তৃতীয় সংস্করণমাত্র নয় ; কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের স্বল্পস্থায়ী কবিজীবনের মোটামুটি সকল পর্বের সৃষ্টিধারার প্রতিনিধিস্থানীয় একটি সংকলন প্রকাশের আগ্রহ নিয়েই এ বই প্রকাশিত হল। পূর্বোক্ত কবিতাটির অনুরূপ ভাব ও রীতির প্রকাশ এ সংস্করণের অন্যান্য একাধিক কবিতায় স্পষ্ট,—অতএব বাহুল্যবোধেই ঐ কবিতাটি এখানে বর্জিত হয়েছে। এই সংস্করণের শেষাংশে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত নতুন যে দশটি কবিতা সংযোজিত হল, সেগুলির মধ্যে 'নতুনখাতা'-র পরিচিত কবি-স্বভাবের পুনরাবৃত্তি ছাড়া কিছু নতুনতরো মননেরও প্রকাশ ঘটেছে। সে বিষয়ে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছিলেন : 'নূতনত্ব ও রসাত্মকতা, এই দুই গুণেরই পরিচয় এই 'নতুন খাতার' অনেক স্থলেই সুপ্রাপ্য।' কিরণধনের কবিতায় নতুনত্বের প্রধান অবলম্বন ঘরোয়া অভিজ্ঞতার আটপৌরে চিত্রণে, বর্ণনায়, স্বাদে, স্মৃতিতে সুপরিস্ফুট। বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী জীবনের দাম্পত্য সুখদুঃখের মধুকণ্ঠ কবি হিসেবেই তিনি বিশ শতকের প্রথমার্ধের যুগসন্ধিতে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আমার বন্ধু অধ্যাপক শ্রী যুক্ত বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, কিরণধন একটি কবিতার কবি—সে হল তাঁর 'আব্দারের আধঘণ্টা'।' কিরণধনের কবিতার অনেক ভক্তেরই এই হল মুখ্য অভিমত। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ইত্যাদি লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলোচকরা একথা স্পষ্টভাবে না বললেও এ বিষয়ে মোটামুটি এই একই মতের

অংশীদার। ১৩৩০-এর চৈত্র সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত মোহিতলালের আলোচনাটি সুখপাঠ্য। অবশ্য, 'বাংলায় খদ্দর', 'উকিলের কবুলতি', 'বেশ্যা', 'ভিখিরি' প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে তাঁর লেখনীর আগ্রহ যে পরিস্ফুট তাতে সন্দেহ নেই,—কিন্তু কিরণধন প্রধানতঃ দাম্পত্য প্রণয়ের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কবি। ১৩৫২-র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় এক বাংলা মাসিক পত্রে কবি ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য এই সূত্রে কিরণধন ও মোহিতলালের কতকটা সমগোত্রভাব স্মরণ করে লিখেছিলেন, 'মোহিতলালের 'বাঁধন' দাম্পত্য মিলন প্রেমের একটি বিশিষ্ট কবিতা। আধুনিক যুগের দাম্পত্য মিলনের আদর্শ কবি হইলেন কিরণধন চট্টোপাধ্যায়।' কতকগুলি কবিতায় প্রণয়িনীর স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে,—অন্য কয়েকটিতে সখীর সান্নিধ্যে অকুণ্ঠ আলাপের সূত্রে,—কখনো বা পতি-পত্নীর সংলাপের আয়োজনে বাংলা দেশের প্রায় তিরিশ বছর আগেকার গার্হস্থ্য রস প্রধানতঃ শৃঙ্গার মূর্তিতে এই কবির রচনায় দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ফুটেছে। দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'সনেট' সম্পর্কে কবি মোহিতলাল বলেছেন, সে যেন 'একবাটি নারাঙ্গীর রস'। কিরণধনের 'আব্দারের আধঘণ্টা' যদিও চতুর্দশপদী নয়,—তথাপি এই কবিতাটির স্বাদে কতকটা অনুরূপ অভিজ্ঞতাই লাভ করা যায়। আর, স্ত্রীবিয়োগের পরেই তাঁর এ কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল বলে এই শ্রেণীর অনেক কবিতাতেই মিলনের সুখস্মৃতি একটি স্থায়ী বিচ্ছেদবেদনায় যেন কারুণ্যসচেতন হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রথম দিকের রচনায় যে ভোগচাঞ্চল্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, শেষ দিকের কয়েকটি কবিতায় সেই উদ্বেলতার পরিবর্তে দেখা দিয়েছে গভীর নশ্বরতা-বোধ। এই সংকলনের শেষাংশে প্রকাশিত 'কবির প্রতি'—কবিতায় তিনি লিখেছেন :

ক্ষণিকের তরে কবি অনুভব
যা কিছু জগতে সুন্দর সব,
কেবলি মাধুরী ফুল গান হাসি
চাঁদের কিরণ ভালোবাসাবাসি
নিমেষেই হায় স্বপ্ন মিলায় হাজারো জ্বালায় চিত্ত দহে!

সেই সঙ্গে বিশ শতকের জড়বাদী যন্ত্রসভ্যতার আর্থিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় বিক্ষোভের যন্ত্রণা থেকে তিনি মুক্তি চেয়েছেন। কিন্তু কাকে তিনি মুক্তিদাতা বলে স্বীকার করলেন? কবির নিজের কথাগুলিই স্মরণ করা যাক :—

যমুনার কূলে পুনরায় বাঁশি
বাজাও হে শ্যাম গোপিকা-বিলাসী
তিমিরে ফুটুক কৌমুদীরাশি সুরে সংগীত উঠুক ভরি! (পরিত্রাহি)

তাঁর প্রথম দিকের রচনায় এই একই সভ্যতার সম্পর্কে কিরণধন লিখেছিলেন :—

গির্জে-গৃহ-মন্দিরেতে সকল আচার অনুষ্ঠানে
সর্বনাশী এই যে কৃত্রিমতা,—
ইহার চেয়ে অনেক ভালো সুস্থ সবল সহজ জীবন
বন্য জাতির নগ্ন বর্বরতা! (সভ্যতার প্রতি)

সমসাময়িক বাঙালি সমাজে ব্যাপক আন্তরিকতাহীনতার যে মনোভাব তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, সে বিষয়ে তাঁর কটাক্ষ উচ্চারিত হয়েছে একাধিক কবিতায়। কটাক্ষ করে তিনি লিখেছিলেন :—

স্বরাজ লাভের সরল পন্থা বাত্‌লে দিয়েছে গান্ধিজি
তোরা শুধু তাই বক্তৃতা কর্‌ বাংলা এবং ইংরিজি।
(বাংলায় খদ্দর)

আবার বলেছেন,

মণ্টেগু তবু সরেশ বালাম
দিয়েছে মোদের ছাঁটা ও মোলাম
আমাদের মত নিমক-হারাম
আর কি কোথাও আছে?
(বাহবা বেড়ে)

তাঁর এই কটাক্ষ-সামর্থ্যের আর এক রকম প্রকাশ ঘটেছে অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তেজনাতাড়িত কৌতুকধর্মী কবিতাগুলিতে। 'নামকাটা সেপাই', 'গিন্নি', 'বাহবা বেড়ে' এবং 'দুনিয়াদারী'—এই চারটি কবিতাতেই অল্পবিস্তর কটাক্ষ আচে বটে, তথাপি, ব্যঙ্গবাণ এই সব কটির মধ্যে সমান শাণিত নয়,—সে তীক্ষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধির তারতম্য সহজেই চোখে পড়ে।

অল্পবয়স্কদের বিষয়ে লেখা তাঁর কয়েকটি কবিতা 'নতুন খাতায়' এলোমেলো ভাবে ছাপা হয়েছিল। বর্তমান সংস্করণে সেগুলি পর পর সাজিয়ে ছাপা হল। এখনো গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত তাঁর এই শ্রেণীর আরো অনেক কবিতা কবির দুই পুত্রের কাছে সংরক্ষিত আছে। 'শ্রীকান্ত', 'বনের পাখি', 'নামে গরমিল', 'মরণিং ইস্‌কুল', 'কালো বাবুর পড়া', 'আমাদের ইস্‌কুল', 'পণ্ডিত মূর্খ', 'সামার ভেকেশান', 'পুজোর ফরমাস', এবং 'উড়োজাহাজ' মৌচাকে প্রকাশিত হয়,—যাদুঘর-পত্রিকায় 'খুকুকুটু' এবং লোবো',—রঙ-মশালে 'শরতে' এবং 'চক্‌চকে এক রঙ-মশাল' ছাপা হয়েছিল। বর্তমান কাব্য-সংকলনে তাঁর এই সব কবিতা পুনর্মুদ্রিত করা সম্ভব হল না। এবং এইগুলি ছাড়া তাঁর দুটি গান ('নয়নপাতে সজল মেঘের কাজল বুলানো', 'বরিষে বারিধারা শ্রাবণ নিশা'—প্রথমটি 'উত্তরা'য় এবং দ্বিতীয়টি 'নাচঘরে' প্রকাশিত হয়) ; 'ফাঁসীর আগে', 'পূজারিণী', 'অবেলায়', 'পুরোণো চিঠি', 'নিরুদ্দেশে', 'আদর', 'একবার', 'মাতাল', 'বসন্তে ও বরিষায়', 'সমালোচকের প্রতি', 'ফুলের ঘা', 'বিরহিণী', 'অথরে-ক্রিটিকে', 'রসের প্রলাপ', 'বুড়ো', 'জীবনতরী' প্রভৃতি কবিতাও এই সংকলনে অপ্রকাশিত রইলো। তাঁর সর্বসমেত কবিতায় সংখ্যা ৯১টি—'নতুন খাতার' প্রথম সংস্করণের প্রকাশিত ৪২টি কবিতার সঙ্গে আরো ১০টি কবিতা এই সংস্করণে সংকলিত হল। ১৩৩৮-এর কার্তিক সংখ্যার উপাসনায় শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় 'কিরণধনের স্মৃতি' প্রবন্ধে কিরণধনের কাব্যকলার বিষয়ে লিখেছিলেন : 'মিল অনেক দূরে দূরে—কোন প্রকার অলঙ্কৃতি নেই—মনে হয় লেখা অতি সহজ। ভাবাও জলের মত স্বচ্ছ, তরল—শব্দের জন্য কবিকে বিন্দুমাত্র থাকতে হয় না—যে ভাষায় কবি কথা কইতেন ঠিক সেই ভাষা।' আলোচনাসূত্রে কিরণধনের 'দুনিয়াদারি' ও রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা'র রীতিসাদৃশ্য স্মরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ১৩২৭-এর পৌষ সংখ্যার 'উপাসনা'-য় কিরণধনের 'ব্যথার স্মৃতি' কবিতাটির প্রশস্তিসূত্রে 'মোহিতবাবু, প্রবাসীর নবীন কবিগণ, এমন কি সত্যেন্দ্রনাথ, করুণানিধান বাবুকেও এই কবিতাটির

প্রতি' দৃষ্টিপাত করতে বলা হয়েছিল। 'উপাসনা' পত্রিকার 'পঞ্চভূত' কিরণধনের কবিতার যে বিশেষ ভক্ত ও অনুরাগী ছিলেন, ঐ পত্রিকার সমকালীন অনেক সংখ্যার তার প্রমাণ আছে। একালেও তাঁর ভক্তসংখ্যা খুব কম নয়। অবশ্য, কবিতার পাঠক হাজারে হাজারে ফোটেও না, ফলেও না। যে অল্প সংখ্যক সার্থক-নামা পাঠক কবিতার প্রতি অনুরাগ পোষণ করেন, একেবারে হাল আমলের বাংলাদেশে তেমন পাঠকের মহলে কিরণধনের স্মৃতি তাঁর খ্যাতির প্রথম বিকাশলগ্নের উত্তেজনা ও অতিকথন পরিহার করে যে রকম সংযত, শোভন ও শুদ্ধ মূর্তিতে সঞ্জীবিত আছে, উত্তরকালের কাব্যামোদীও তাকে উপেক্ষা করতে পারবেন না।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'কাব্যের মুক্তি' নামক প্রবন্ধে আধুনিকতার মূল যে লক্ষণটি পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেছেন,—তাঁর নিজের কথাতেই বলা চলে, সে লক্ষণ হল, 'অবৈকল্য আর অকপটতা'। কিরণধনের কবিতাবলীর বিচক্ষণ পাঠক এই কবিতাবলীর অনেক জায়গায় সে লক্ষণ যে অবশ্যই দেখতে পাবেন, তাতে সন্দেহ নেই। ভাবে, ভাষার, ছন্দে এবং কাব্যপ্রকরণ সম্পর্কিত যাবতীয় কারুপ্রযুক্তিতে কিরণধন তাঁর যুগোপযোগী 'আধুনিকতা'রই সাধক ছিলেন। তবে এই সাধনা যে সর্বত্র ফলপ্রসূ হয়েছে, সে ধারণা পোষণ অথবা প্রচার করা একমাত্র তাঁর অন্ধ স্তাবকের পক্ষেই সম্ভব। সুস্থতর পাঠক সম্প্রদায় তার আন্তরিকতার প্রশংসা করবেন, তাঁর দেশপ্রীতি, সমাজচেতনা, পরিহাসদক্ষতা, কটাক্ষনৈপুণ্য ইত্যাদির তারিফ করবেন,—এবং কিরণধনের বিষয়ে ভাবতে বসে পরিশেষে হয়তো অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো কেবল সেই একটি কবিতাই তাঁদের মনে পড়বে :—

বেল ফুল চাই না
জুঁই ফুল দাও
ও গানটা গেও না,
এই গান গাও!

আমার শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য ডক্টর সুকুমার সেন ও ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমার অন্যান্য গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে যেমন,—বর্তমান কাজটিতেও তেমনি নানাভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করে দিয়েছেন আমার স্ত্রী শ্রীমতী মণ্টুরানী মিত্র। কবির দুই পুত্র শ্রীযুক্ত বিজনকুমার ও প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় যথাসাধ্য তথ্যাদি পরিবেশন করেছেন। 'গুপ্ত প্রকাশনী'র তরুণ স্বত্বাধিকারী শ্রীমান সুনীলকৃষ্ণ গুপ্ত বিস্ময়কর আগ্রহে গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাবটি গ্রহণ ও পূরণ করেছেন। এদের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধনীয়।

১০ই চৈত্র, ৯১ রবীন্দ্রাব্দ (মার্চ, ১৯৫২)

বাংলা বিভাগ
ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুচবিহার

হরপ্রসাদ মিত্র

আমার এ লেখাগুলি ভারতী, বঙ্গবাণী, বিজলী, মানসী ও মর্মবাণী প্রভৃতি পত্রিকায় এতদিন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। সেগুলিকে একত্র করে বইএর আকারে ছাপা কখনো হত কিনা সন্দেহ—হল যে সে শুধু আমার প্রিয় বন্ধু ও আত্মীয় স্বদেশ-প্রাণ শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও আমার ছোট ভাই শ্রীমান প্রাণধন চট্টোপাধ্যায় এঁদের উৎসাহে ও আগ্রহে—

উত্তরপাড়া
১৫ই অঘ্রান, ১৩৩০

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়

চাঁদের আলোয়

আকাশ ছেয়ে ফুল ফুটেচে—তারারা সব রয় জেগে,
গঙ্গাজলে মানিক জ্বলে চাঁদের আলোর রঙ লেগে,
ও পারেতে ঘুমিয়ে আছে নীরব-নিঝুম গ্রামখানি,
জেলের ডিঙি ইলিশ মাছের চল্‌চে ছুটে তীরবেগে।

এলোমেলো হাল্কা হাওয়ায় মনের যত জোড়গুলো
আল্‌গা হয়ে যাচ্ছে খসে—ভুঁইচাঁপা-জুঁই-বেলফুল ও ;
খুন বুঝি গো কর্‌বে ওরা সৌরভেরই শর হানি,
মর্ত্ত্যটাকে স্বর্গ বলে চোখে কে আজ দেয় ধুলো।

লাফিয়ে এসে আছড়ে ভাঙে ঘুমপাড়ানি ছন্দেতে
ঢেউগুলি সব শানের ঘাটে—পাশেই উপবন যেতে
সোনার সরু হারের মতো পথের রেখা যায় দেখা,
আলোকের এই ঝরনাতলায় চোখ ফিরে পায় অন্ধেতে!

মরচে-পড়া প্রাণের তারে উঠ্‌চে বেজে করুণ সুর—
যৌবনেরি দিনগুলি সব পালিয়ে গেছে অনেক-দূর,
অতীত শত-স্মৃতির আগুন আঁতে দারুণ দেয় ছ্যাঁকা,
মুখখানি কার জেগে ওঠে চোখের আগে তন্দ্রাতুর!

অতীত কথা স্মৃতির ব্যথা মনের থেকে ফ্যাল্‌ ঝেড়ে,
দেখ্‌ না কেমন চাঁদ উঠেছে মেঘের কোলে ফুল-পেড়ে!
প্রাণখানাকে ঝালিয়ে ফিরে নতুন করে রাঙিয়ে তোল্‌,
অন্তত এই আজ্‌কে রাতে দিসনে ক্ষ্যাপা হাল ছেড়ে!

লে আও সুরা গোলাপ-রাঙা, সে আও সেরা সুন্দরী,
বিফল যাবে আজ রজনী? আয় না উপভোগ করি!
দোহাই তোদের, তুলিসনেকো ধর্ম-নীতির গণ্ডগোল,
নীতি তোদের ফোঁপ্‌রা-ভুয়ো—ধর্মে গেছে ঘুণ ধরি!

ছুট্‌বে হাসির প্রবল বন্যা—করবোনাকো অশ্রুপাত,
আজ নিশীথে গীতা মোদের ওমর খাঁয়ের রুবৈয়াৎ

পরকালে নরক আছে? করবে সমাজ এক-ঘরে?
চোখরাঙানির ভয়ে কাঁপে যেজন,—বেকুব হয় নেহাত!

*   *   *

পাইনেকো স্বাদ রঙিন সুরায় ওষ্ঠসুধায় সুন্দরীর,
ঘনিয়ে আসে ম্লান অবসাদ, বিকল করে দেয় শরীর,
বিষের বাটি চুমুক দিলি, হায়রে, বোকা ভুল করে!
ইঙ্গিতে ওই কইচে আকাশ ফেল্‌চে তারা অশ্রুনীর!

চল্ ফিলে মন, চল্‌রে ফিরে প্রেমের যেথা প্রস্রবণ,
যেথায় রাধা রাসেশ্বরী, বংশীধারী বৃন্দাবন,
কালিন্দীর ওই কালো জলে মনের কালি ফেল্ ধুয়ে,
মিল্‌বে সুধা, মিট্‌বে ক্ষুধা, টুটবে বাধা আর বাঁধন!

দাও হে দেখা যুগলরূপে—হে পীতাম্বর শ্রীহরি!
চরণতলে হৃদয় আমার উঠুক ফুটে মুঞ্জরি,
বাজাও বাঁশি, আঘাত কর আমার প্রাণের তার ছুঁয়ে,
তোমার রূপের চাঁদের আলোয় ভুবন আমার দিক ভরি!

কবির প্রতি

কেবল কথার ঝুটা মুক্তাব গেঁথে-গেঁথে হার ফিরিস কবি,
আঁকিস নিত্য বেদনা-সিক্ত কল্পনা-রাঙা রঙিন ছবি।
ছন্দের তালে-তালে—
দোল খাস তুই, ফোটে বেল-জুঁই গাছে-গাছে ডালে-ডালে!
আপনার গানে আপনি বিভোর,
না রাখিস কারো খেয়াল-খবর,
থাকিস মগ্ন সোনালি স্বপনে—
কৃত্রিম আলো দীপ্তি কিরণে,
আলেয়া-আলোকে পলকে-পলকে ঝলকে লক্ষ চন্দ্র-রবি!
কেবল কথার ঝুটা মুক্তার গেঁথে-গেঁথে হার ফিরিস কবি!

ওরে বাজিকর, কোথা তোর ঘর? এ অবনীপর কখনো নহে,
তোর ওই স্বরে উন্মাদ করে, অন্য লোকের বার্তা কহে,
মর্মের তারে-তারে
বেজে ওঠে তার ক্ষীণ ঝংকার থেকে-থেকে বারে-বারে!

ক্ষণিকের তরে করি অনুভব
যা কিছু জগতে সুন্দর সব,
কেবলি মাধুরী-ফুল-গান-হাসি,
চাঁদের কিরণ ভালোবাসাবাসি,
নিমেষেই হায় স্বপ্ন মিলায় হাজারো জ্বালায় চিত্ত দহে!
ওরে বাজিকর, কোথা তোর ঘর? এ অবনীপর কখনো নহে!

তুই মনোচোর লুব্ধ চকোর সারা নিশিভোর রহিস জাগি
মানস-বধূর অধর-মধুর কাঁদিয়া সাধিয়া ভিক্ষা মাগি!
গুঞ্জরি কানে-কানে
কী রচিস গান সারা দিনমান—বুঝি না অর্থ, মানে!
তৃণে-পল্লবে তারায়-তারায়,
দ্রুত চঞ্চল রক্তধারায়,
কাঁপে তার সুর মরি-মরি-মরি!
শুষ্ক নয়ন জলে আসে ভরি!
বিকশে কমল শত শতদল তোর ও সুরের পরশ লাগি!
তুই মনোচোর লুব্ধ চকোর সারা নিশিভোর রহিস জাগি!

সাগরে-শৈলে অনিলে-সলিলে আকাশের নীলে কে দিল ঢেলে
সুষমা-কান্তি? রচিল ভ্রান্তি সরস্বতীর কোন্ সে ছেলে?
ধরণীর ধূলিপথে
সুধা সিঞ্চন করে কোন্‌জন অমৃত-উৎস হতে?
কাহার পরশে কালো জঞ্জাল
হয়ে ওঠে রাঙা, টক্‌টকে লাল?
সিঁদুরে মেঘের রঙ্ করে চুরি
কে মাখালো বঁধু মুখে সে মাধুরী?
মণি-আভরণ মায়া-আবরণ সৃষ্টির পরে কে দিল মেলে?
রচিল ভ্রান্তি-সুষমা-কান্তি, সরস্বতীর কোন্ সে ছেলে?

তুই-ই সে কুহকী, স্পষ্ট নিরখি ; দেখেছি পরখি নাইকো খাঁটি—
তোর রচনায় পনেরো আনায় সোনা বলে ভুল করেছি মাটি!
পড়ে গেছে ফাঁকি ধরা
মিথ্যে এখন মোহ-অঞ্জন—রঙিন স্বপ্ন-ভরা!
বুঝেছি তোর ও কলা-কৌশল—
ভাষার চাতুরী-বঞ্চনা-ছল,
শ্রবণ-মধুর শব্দ যোজনা,
ভাবের বিলাস-লীলা-ব্যঞ্জনা,

উপমার ছটা, ছন্দের ঘটা, অনুপ্রাসের বোঝাই আঁটি।
তোর রচনায় পনেরো আনায় দেখেছি পরখি নাইকো খাঁটি!

কঠোর-কঠিন শ্রীহীন-মলিন জীর্ণ-প্রাচীন মোদের ধরা,
বিঘ্ন-বিপদ হিংস্র শ্বাপদ লক্ষ রোগের বীজাণুভরা ;
বারিহীন ধু-ধু মরু
কোথাও না-শেষ তুষারেব দেশ- নাহি তৃণ, নাহি তরু ;
আঁকিলি শিল্পী করে ফুলময়
লাগিল চমক, প্রাণে বিস্ময়,
সাজালি নিখিল শ্যামলে-সবুজে
কাঁচা যৌবনে ভুলেচি না বুঝে,
এবে ওরে চোর, প্রতারণা তোর ছলনা-চাতুরী পড়েছে ধরা!
কঠোর-কঠিন শ্রীহীন-মলিন-জীর্ণ-প্রাচীন মোদের ধরা!

পাপে পঙ্কিল স্বার্থ-জটিল ক্রূর ও কুটিল মানবজাতি—
ইন্দ্রিয়-দাস ;—ওরে কবি, গাস্ তারি জয়গান দিবস-রাতি?
কাটাকাটি-হানাহানি,
ঘোর সংগ্রাম চলে অবিরাম প্রাণ নিয়ে টানাটানি!
প্রণয়-পিরীতি-প্রেম-লীলাছল—
সেরেফ লালসা স্বচ্ছ-সরল,
নগ্নতা তার দিলি তুই ঢেকে
সভ্য ভাষার রঙ গুলে এঁকে ;
ঐন্দ্রজালিক, তোর ও অলীক কুহকে ভুলিয়া আর না মাতি!
পাপে পঙ্কিল স্বার্থ-জটিল ক্রূর ও কুটিল মানবজাতি!

তোর ও প্রলাপ শুনবে গোলাপ, করগে আলাপ তাহার সনে,
তরু-মর্মর ঝিল্লি-মুখর চাঁদনীর রাতে ফুলের বনে!
প্রাণ-লেন-দেন খেলা
খেল্‌বে তরুণ লজ্জা-অরুণ তরুণী সন্ধেবেলা!
শুনে তোর সুর, শুনে তোর স্বর
—মিলবে কাঁপিয়া অধরে অধর!
আমরা যতেক বুড়োসুড়ো লোকে
বুঝি না কী আছে তোর ওই শ্লোকে,
নিমেষের ভ্রম জাগে মনোরম—থাকে না সে দাগ মনের কোণে।
তোর ও প্রলাপ শুনবে গোলাপ, করগে আলাপ তাহার সনে!

পরিত্রাহি

আসিছে বিকট জড়-সভ্যতা গ্রাসিতে-নাশিতে পৃথ্বী,
লাঞ্ছিত আজি বিশ্ববিধাতা, বাঞ্ছিত পশুবৃত্তি ;
জ্বলিছে লালসা—প্রখর অনল,
টুটে সমাজের বিধি-শৃঙ্খল,
নগ্নিকা আজি লজ্জাহীনা।
ধর্মাধর্ম, পুণ্য ও পাপ,
এক করে দেয় মোহরের ছাপ,
অর্থের আজ সাত খুন মাপ—গরিব মরিছে অন্ন বিনা।

জগৎ জুড়িয়া চলিয়াছে তাই ধনিকে-শ্রমিকে দ্বন্দ্ব,
কল-কারখানা ছেয়ে দিল দেশ—ধোঁয়ায় চক্ষু অন্ধ!
মুছিল ধরার শোভা শ্যামলিমা,
কে সে হ'রে নিল আকাশে নীলিমা?
পঙ্কিল আজি গঙ্গাবারি,
মুছে দিল হাসি, মুছে দিল গান,
পৃথিবী আজিকে শ্মশান সমান,
রসাতল-পানে দ্রুত ধাবমান রাজ্যের যত নর ও নারী।

ধরণীর এই দুষ্কৃতি-পাপ হরিবে কে তুমি ভিন্ন?
ত্রাহি-ত্রাহি তাই ডাকি হে মুরারি, হও ফিরে অবতীর্ণ,
প্রলয়-সলিলে কর নিমগন
যা কিছু জীর্ণ-ম্লান-পুরাতন ;
নূতন ভুবন গঠন করি,
যমুনাব কূলে পুনরায় বাঁশি
বাজাও হে শ্যাম গোপিকা-বিলাসী
তিমিরে ফুটুক কৌমুদীরাশি, সুরে-সংগীতে উঠুক ভরি।

যশ ও প্রেম

নেই কোন ফল ইতিহাসের পাতায় বেঁচে যশ নিয়ে,
যৌবনেরি দিনগুলি সব লেখা সোনার জল দিয়ে ;
চাইনে যশের হীরের মুকুট—নই মনে যশ-ধন-কামী
প্রিয়ার হাতের ফুলের মালা এদের চেয়ে ঢের দামি!

বুড়োর মাথায় ফুলের মুকুট পরালে কি খাপ খাবে?
শিশির-ছিটে লাগলে মরা ফুল কি ফিরে প্রাণ পাবে?
পক্ক কেশের উপর থেকে দাও তা ফেলে টান মেরে,
নিছক শুধু যশের তরে যশের মালা চায় কে রে?

ও খ্যাতি, তোর প্রশংসাবাদ শুনেই শুধু গাল-ভরা
আনন্দ পাই ভাবিস যদি মস্ত সে তোর ভুল করা,
আনন্দ পাই যখন উজল প্রিয়ার আমার দুচোখ গো
বল্‌তে থাকে নেহাত আমি নইকো প্রেমের অযোগ্য।

সেথাই তোরে বিশেষ করে খোঁজ করি আর পাই খুঁজে,
তোরেই ঘেরা কিরণ সেরা হানে প্রিয়ার চক্ষু যে ;
আমার গুণে মুগ্ধ হয়ে উজল যবে হয় আঁখি,
বুঝি মনে প্রেম তো ইহাই, গৌরবেরও নেই বাকি।

—বাইরন

বাতায়ন-তলে

রাতের প্রথম ঘুমটি মিঠে মরি
ভাঙ্‌লো সখি,—স্বপ্নে তোমায় দেখে,
বইচে যখন বাতাসগুলি ধীরে
তারারা সব জ্বলচে থেকে-থেকে ;
জাগিয়ে দিল স্বপ্নে তোমার সখি
আনলো টেনে কি এক মন্ত্রবলে
—কে জানে সে কেমন করে মোরে?
তোমার গৃহের বাতায়নের তলে!

নীরব-কালো নদীর জলে হোথা
এলিয়ে পড়ে এলো বাতাস যত—
চাঁপার গন্ধ যাচ্ছে উবে যেন
স্বপ্নে মিঠে ভাবনাগুলির মতো ;
বুলবুলিটির বিলাপধ্বনি উঠে
মিলিয়ে মরে যাচ্ছে ওরি বুকে
অমনি করে তোমার বুকে প্রিয়ে
মিলিয়ে মরে যাবো আমি সুখে!

তোলা আমায় ঘাসের থেকে ওগো!
মরি-গেলুম,—পারচি না আর মোটে!
প্রণয় তোমার চুমার বৃষ্টি হয়ে
ঝরুক পাণ্ডু চোখের পাতায়,—ঠোঁটে।
কপোল আমার ঠাণ্ডা, সাদা,—আহা!
হৃদয় চলে জোরে, দ্রুত-তালে ;
বাঁধো তারে নিবিড় করে বুকে
পড়বে ভেঙে সেইখানে শেষকালে!
—শেলী

ভুলে গেছি প্রিয়া

ভুলে গেছি প্রিয়া!
স্মৃতির মর্মর তাজ এতদিনে হলো চুরমার,
চক্ষে আর নাই অশ্রু, বক্ষে আর নাই হাহাকার,
দীর্ঘশ্বাস গিয়াছে থামিয়া!
নয়নের অবিশ্রান্ত ধারা
জীবনের মরুপথে কোন্‌কালে হয়ে গেছে হারা!
নির্বাপিত অন্তরের তলে
অগ্নিস্রাবী এট্‌নার অনলপ্রবাহ আর নাহি চলে!

মনের হতো আগে—
প্রেমের অম্লান জ্যোতি জন্মান্তেও হবে না মলিন,
এ চির-বিরহব্যথা প্রাণে লেগে রবে চিরদিন
চিরপ্রেম চির-অনুরাগে!
ফুলে আর রবে না সুরভি,
চাঁদ নিভে যাবে, আলো দেবেনাকো আকাশের রবি,
বাতাস সে মরে যাবে কেঁদে
সংগীতের হবে কণ্ঠরোধ, ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি যাবে বেধে!

কতদিন সখি,
সোহাগে শপথ করি বলিয়াছি পড়িতেছে মনে—
তোমারি, তোমারি আমি, ভুলিব না জীবনে-মরণে,
'এত প্রেম এতটা ভালো কি?'
সকৌতুকে কয়েছিলে তুমি

তব মুগ্ধ প্রণয়ীর নিরুত্তর ওষ্ঠদুটি চুমি।
সেই প্রেম কোথা গেল আজ?
প্রাণহীন প্রণয়ের বিশীর্ণ কঙ্কাল হানিতেছে লাজ!

কে জানিত হায়—
প্রেম শুধু দুদণ্ডের আলাপন—চকিতের নেশা,
ক্ষণিকের চিত্তভ্রান্তি—হাসি-খেলা-মেলা আর মেশা
যৌবনের সমুদ্র-বেলায়!
অকস্মাৎ স্বপ্ন যায় টুটে,
নগ্ন মূর্ত্তি প্রণয়ের হি-হি করে ব্যঙ্গ করে উঠে—
কয়—আমি চেয়ে দেখ দেখি
রূপের লালসা-মাত্র—ইন্দ্রিয়-বিকার—আগাগোড়া মেকি!

কী দারুণ কথা!
শিহরিয়া মরি ত্রাসে জীবনের ভিত্তি নড়ে ওঠে,
সৃষ্টির শিকড় ঘেঁষে পড়ে টান—থাকেনাকো মোটে
ঈশ্বরে বিশ্বাস,—নির্ভরতা।
এ বিরাট জগতের মেলা
মনে হয়, প্রহসন—জড়াণুর সমষ্টির খেলা ;
যাহা কিছু করি অনুভব
—স্নায়ুর কম্পন-মাত্র—দয়া-মায়া-স্নেহ-প্রেম-সব !

মর্ম্মস্থল থেকে
ক্ষুব্ধ অন্তরাত্মা মোর আশ্বাসিয়া-আশ্বাসিয়া কয়—
ওরে ভীরু অবিশ্বাসী জানিসনে প্রেম মৃত্যুঞ্জয়?
বারে-বারে বলে ডেকে-ডেকে
এ বিপুল জগতের হাটে
একটিও কানাকড়ি মারা কভু যাবেনাকো মাঠে!
মিছে কেন পাস তুই ভয়?—
ক্ষুব্ধ অন্তরাত্মা মোরে আশ্বাসিয়া-আশ্বাসিয়া কয়!

ওগো মোর প্রিয়া,
প্রবোধ মানে না মন স্তোকবাক্যে বৃথা সান্ত্বনার,
সন্দেহ-বিক্ষিপ্ত-চিত্ত—মসীলিপ্ত গাঢ় অন্ধকার
হৃদয়ের সমস্ত ব্যাপিয়া!
তুমি আজ কিনা আছ—তাই
বুঝিতে পারি না, শুধু ঊর্দ্ধনেত্রে আকাশে তাকাই।
সুদূর নক্ষত্র-লোকে কোন্
পেতেছ খেলার ঘর হয়তো বা তুমি সম্পূর্ণ নূতন!

একবার কাছে
তেমনি হাসিটি হেসে ভালোবেসে এসো মোর প্রিয়া!
একবার দেখা দিয়ে দেখে যাও নিজ আঁখি দিয়া
কী বেদনা বুকে রহিয়াছে!
কই ব্যথা? কিছুই তো নাই!
আগুন সে নিভে গেছে—পড়ে আছে কেবলি যে ছাই!
বারে-বারে ডাকিতেছি কারে?
আমার পূর্ণিমা-চাঁদ সে কি ডুবে গেছে চির-অন্ধকারে?

মা

একদা বসন্তে কোন-পল্লবিত ফুলেল্ ফাল্গুনে
প্রাণ-পুষ্প মম
উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া অদৃষ্টের লৌহ-জাল বুনে
দীর্ঘ দৃঢ়তম
তোমার তরুণ অঙ্কে স্মরণের অতীত দিবসে
মা গো, মা আমার!
স্নেহে আর্দ্র চিত্ত তব ভরেছিল কী অমৃত-রসে
ক্ষুধিত আত্মার
মিটেছিল কী পিপাসা! যুগান্তর-সঞ্চিত বেদনা
মৌন ভাষাহীন
লভিল মুহূর্তে শান্তি—অকস্মাৎ জাগিল চেতনা
অপূর্ব নবীন!

(২)

প্রতিষ্ঠিত মাতৃত্বের নিষ্কলঙ্ক রত্নবেদি পরে
খোকা কোলে নিয়া
আনন্দ-স্পন্দন তব অঙ্গে-অঙ্গে নয়নে-অধরে
উঠিল নাচিয়া!
সে দৃশ্য দেখিল শিশু ;—স্বপ্নাতুর মেলি দুটি আঁখি
বুঝেছিল কি ও—
জীবদাত্রী তুমি তার—তুমি তার জগতে একাকী
একান্ত আত্মীয়?
প্রত্যেক শোণিতবিন্দু, অনুভূতি, চিন্তা ও কামনা
সর্বস্ব তাহার,

তোমার অন্তর হতে পেল তারা প্রাণ ও প্রেরণা—
নির্দিষ্ট আকার?

(৩)

বসন্ত বিদায় নিল আবার বসন্ত এল ফিরে
চমকি ভুবন,
মাধুরী উঠিল ফুটি—তৃণে, পুষ্পে, সলিলে-সমীরে
আলোকি নয়ন ;
ডাগর হয়েছে খোকা টলে-টলে চলে দিকে-দিকে
মানা নাহি মানে,
রাজ্যের দুরন্তপনা যতো কিছু নিয়েছে সে শিখে
কি করে কে জানে!
অন্ত নাই বায়নার—দুধ খেতে করে সমারোহ
ভোলালে না ভোলে,
ভেঙেচুরে তচ্‌নচ্‌ এটা-সেটা করে সে প্রত্যহ,
নাহি রয় কোলে!

(৪)

সে অশান্ত শিশুটারে কি কৌশলে বাঁচালে মা তুমি
করি প্রাণপাত,
রঙিন খেলেনা দিলে, দিলে বাঁশি, দিলে ঝুম্‌ঝুমি
ভরে দুটি হাত!
কত না বিনিদ্র রাতি শয্যাপ্রান্তে বসি একাকিনী
রুগ্ন শিশু কোলে
কেটেচে তোমার মা গো! উপবাসে—মরি, কত দিনই
গিয়াছে না চলে!
পুত্রের কল্যাণ মাগি করিয়াছ দেবতা চরণে
কত না মানত্‌
অতীত শৈশব কথা থেকে-থেকে নড়ে ওঠে মনে
স্বপ্ন-স্মৃতিবত্‌!

(৫)

কালো ছেলে আলো করে নয়নে অঞ্জন দিলে টানি,
ভালে দিলে টিপ ;
নাচাতে আঁখির আগে কয়ে কত অর্থহীন বাণী
সাঁঝের প্রদীপ!
মৃদুল গুঞ্জন করি শুনাইতে ঘুম-পাড়ানিয়া
সুমধুর-সুরে,

নীল পাখি লাল ফুল কোথা হতে দিতে যে আনিয়া
ভোলাতে শিশুরে!
সহসা সে একদিন মোহময় রঙিন প্রাসাদ
ভেঙে চুরমার,
চাহিয়া দেখিল খোকা—লভিতে সে জ্ঞানের আস্বাদ
বন্দী-পাঠাগার।

(৬)

ফাঁকে ছেড়ে দিতে তারে কিছুতেই চাহিতনা মন,
—না দিলেও নয়,
একে সে চঞ্চল শিশু, গাড়ি-ঘোড়া পথে অগণন,
—কখন কি হয়!
যদি না সে পারে পড়া, লেখা যদি যায় এঁকে-এঁকে
—যদি মার খায়!
যদি খোকা ভয় পেয়ে কেঁদে উঠে মা মা বলে ডেকে
কি হবে উপায়!
যদি সে অবাধ্য ছেলে পাঠশালে খেলা নিয়ে মাতে
—করে হৈ-চৈ!
যদি সে কলহ করে তার কোন সহপাঠী সাথে
—ছিঁড়ে দেয় বই!

(৭)

অসংখ্য আশঙ্কাভরে থর-থর কাঁপিত হৃদয়
দীপশিখা-সম!
দারুণ বাজিত বুকে যদি তার ব্যথা কোথা রয়
অতি ক্ষুদ্রতম!
তোমার উদ্বেগ-শঙ্কা, স্নেহের শ্রাবণ-ধারা মরি
অজস্র অসীম,
জীবনের খর তাপে দগ্ধ-প্রাণ আজও আমি স্মরি—
স্নিগ্ধ অকৃত্রিম!
মোর বাল্য শৈশবের ইতিহাসে রয়েছে সে লেখা
পাতায়-পাতায়,
সহস্র নয়ন জলে সে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষর-রেখা
মুছিয়া না যায়।

(৮)

নাহিকো সে দিন আজ, কালগর্ভে হয়েছে বিলীন,
তুমি গেছ চলে ;

সংসার শ্মশানে ভ্রমি ডাকি নাই ও সে কত দিন
মা-মা-মা-মা বলে!
জগতের কোলাহল ভেদি উঠে চীৎকার ধ্বনি,
নাই নাই নাই!
সে সুন্দর অবয়ব স্নেহ-মণি-মাণিক্যের খনি
হয়ে গেছে ছাই!
নির্ম্মম নিষ্ঠুর বাণী কানে যেন বিষ দেয় ঢেলে,
তীক্ষ্ণ শেল বেঁধে,
পৈশাচিক অট্টহাসি হাসে তার লক্ষ জিভ মেলে,
মরি আমি কেঁদে!

(৯)

মিশিয়া গিয়াছ তুমি অনন্তের অমৃত সত্তায়
—দার্শনিক কহে,
আমার বিদ্রোহী আত্মা সে কথায় নাহি দেয় সায়
কহে,—নহে নহে।
নব-নব রূপ ধরি জন্মান্তের প্রবাহে ভাসিয়া
চলিয়াছ ছুটে,—
কহে বিজ্ঞ শাস্ত্রবিত—মূঢ় মোর সমীপে আসিয়া
বুক জ্বলে উঠে!
সেই পরিচিত রূপে পুনর্বার দিয়ে মোরে ধরা—
জানি—আমি জানি,
প্রেম দিয়ে বিধাতার মর্ম্মান্তিক পরিহাস করা—
নাহি আমি মানি!

(১০)

তোমার উদ্দেশে আজ পাঠালেম্‌ অসংখ্য প্রণাম,
লহ, মা গো, লহ!
শান্তিহীন-সুখহীন এ কঠিন জীবন-সংগ্রাম
হয়েছে অসহ!
কবে ডেকে নেবে মোরে? ঝাঁপ দিয়ে কোলে ছুটে যাবো
পড়িব লুটিয়া;
আমার বেদনাগুলি একে-একে তোমারে শোনাবো
খুঁটিয়া-খুঁটিয়া।
মিশিবে তোমার অশ্রু মোর তপ্ত অশ্রু-ধারা সাথে
দীর্ঘকাল পরে,
ফুটিবে অশোক-চাঁপা মিলনের সেই পূর্ণিমাতে
থরে-থরে-থরে!

পিতা স্বর্গ

নীল আকাশের কোন্‌খানে ওই নীল আকাশের আকাশের কোন্ কোণে—
পরীরা সব করচে খেলা পারিজাতের ফুলবনে?
মিথ্যে অলীক কল্পনা
কামধেনু আর কল্পলতার ছলনাতে ভুলব না!
তুমিই আমার স্বর্গ পিতা তুমিই আমার দেবতা গো!
দাও চরণের পুণ্যধূলি—নাও হৃদয়ের পুষ্পার্ঘ্য!

তালপাতার ওই পুঁথির ভিতর ধর্ম আছে বল্লে কে?
বেদ-কোরান আর বাইবেলে কি কেউ দেখেছিস এক লেখে?
পুরোহিতের মন্ত্রণায়
সোনা ফেলে আঁচলে তুই বাঁধলি গেরো, হায়রে, হায়!
তুমিই আমার ধর্ম পিতা, তুমি আমার দেবতা গো!
দাও চরণের পুণ্যধূলি—নাও হৃদয়ের পুষ্পার্ঘ্য!

হোম-আরতি, ঘিয়ের বাতি, তপ-তপস্যার আড়ম্বর,
জপবো না নাম, ন্যাস-প্রাণায়াম করবোনাকো অতঃপর,
কাজ কি মিছে জঞ্জালে?
কি হবে মোর চক্ষু বুজে আসন পেতে বাঘছালে!
তুমিই আমার তপ-তপস্যা, তুমিই আমার দেবতা গো!
দাও চরণের পুণ্যধূলি—নাও হৃদয়ের পুষ্পার্ঘ্য!

জানিনিকো শৈশবে আর মানিনিকো যৌবনে,
পাপ করেচি হাজার-হাজার আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘনে,
অপরাধ আর দোষত্রুটি—
ক্ষমা করো, ভিক্ষে মাগি জোড় করে মোর হাত-দুটি!
ঠেকিয়ে মাথা তোমার পায়ে আর মাগি এই ভিক্ষা গো—
দাও চরণের পুণ্যধূলি—নাও হৃদয়ের পুষ্পার্ঘ্য!

তোমার অতল স্নেহ-শীতল পরশখানি মোর প্রাণে—
বুলিয়ে দে' যায় শান্তি-সুখের কী অমৃত কে জানে!
মনে-মনে হয় ধোঁকা—
আজো আমি তেমনি তোমার ছোট্ট-কচি সেই খোকা,
আড়াল করে আগ্‌লে আছ যা কিছু ঝড়-ঝঞ্ঝা গো!
দাও চরণের পুণ্যধূলি—নাও হৃদয়ের পুষ্পার্ঘ্য!

প্রেমের সুরা পান করেচি—উগ্র তাতে তীব্র ঝাঁঝ,
তোমার স্নেহের গঙ্গাবারি কণ্ঠ আমার চাইচে আজ!
কালো চোখ আর লাল ঠোঁটে—
বেলফুল আর চাঁদের আলোয় কই সে রকম মন ওঠে?
তড়িৎ হানে শিরায়-শিরায় চাই না ও আর, চাই না গো!
দাও চরণের পুণ্যধূলি—নাও হৃদয়ের পুষ্পার্ঘ্য!

অগ্রন্থিত-কবিতা

পূজারিণী

যাহার রচিত সংগীত-রবে মুখর নগর-পল্লী,
লাগে কম্পন তৃণে-পল্লবে জাগে চম্পক-মল্লী,
যাঁহার বাঁশরি ধরনীর কোলে
সাগরে সলিলে হিল্লোল তোলে,
আকাশে বাতাসে ফোটায় হাসি ;
একদা মধুর মাধবী নিশীথে
গাহিতেছিল সে কি গান বাঁশিতে
পশিল সে সুর ভাসিতে-ভাসিতে ধনীর প্রাসাদ-কক্ষে আসি!

"ওলো জেনে আয় কে ও গান গায় এমন গভীর রাত্রে
এ যেন সুরের সুরভি মদিরা উছলি উঠিছে পাত্রে!"
সখিরে ডাকিয়া কহে পুরনারী
"এ করুণ স্বর সহিতে না পারি
যা লো যা উহারে করে দে মানা,"
সখি কয়—সখি ও এক খেয়ালি,
রচিছে অর্থবিহীন হেঁয়ালি,
কাজ নাই কোনও রাত দিনই খালি পদ্য লিখিছে ছন্দে নানা।

দিয়ে তারে সুর করে সুমধুর মাতাইয়া তোলে বিশ্ব,
নিয়ে একতারা আছে মাতোয়ারা লক্ষ্মীছাড়াটা নিঃস্ব!"
পুলকে বিষাদে কম্পিত হিয়া
শোনে নারী গান সারা দেহ দিয়া
বসি বাতায়নে জাগিয়া রাতি,
কবিরো চক্ষে ঘুমনাহি আসে,
স্বপ্নে সোনার রেণুকণা ভাসে,
কেঁদে কয় সুর ইশারা আভাষে—কোথায় প্রাণের দরদী সাথী!

প্রত্যুষে উঠি স্নান সমাপন করিয়া সখীর সঙ্গে,
তুষার শুভ্র গরদের শাড়ি বেষ্টন করি অঙ্গে,
কবির ভবনে পূজারিণী বেশে
চলে বরাঙ্গী আলুলিত কেশে
চরণে কঠিন কাঁকর বাজে,

দু-একটি তারা তখনো আকাশে,
পাখি নীড় ছেড়ে ছোটে উল্লাসে,
ক্বচিত পথিক পথে য়ায় আসে শিহরে রূপসী ত্রাসে ও লাজে!

কবির কুটির সম্মুখে আসি দেখিল দুয়ার মুক্ত,
কুশাসন পরি কবি সমাসীন করি দুটি কর যুক্ত
সম্বোধি স্বীয় ইষ্টদেবীরে
কহিছে—জননী ভক্ত-সেবিরে
অটুট নিষ্ঠা ভক্তি দিও ;
তপোক্ষীণ দেহ—দুনয়নে কালো
জ্বলে জ্বল জ্বল প্রতিভার আলো,
হরিণ শিশুটি ছুটিয়া পালালো—সে ছিল কবির বড়ই প্রিয়!

"লহ প্রীতিফুল চন্দন কবি ভক্তের দীন অর্ঘ্য,
প্রবেশাধিকার নাহিক আমার এ যে মনোময় স্বর্গ,
অপরাধ যদি করে থাকি ক্ষমা
করিও"—বিনয়ে কহে মনোরমা,
সম্ভ্রমে দুটি আনত আঁখি,
বুঝেছি তোমার সংগীত স্বরে
ব্যথার তরল নির্ঝর ঝরে
বাঁধিল তোমায় কে গো পিঞ্জরে? তুমি যে মুক্ত বনের পাখি!

হে মায়াবী কোন্ মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ করিলে চিত্ত!
ছোঁয়ালে মর্মে পরশ মনিটি অলোক-আলোক দীপ্ত!
সুপ্ত মগ্ন চেতনার তলে
মূক ও মৌন যে বাসনাজ্বলে—
প্রকাশের যার নাহিকো ভাষা,
শব্দে ছন্দে করিয়া মধুর
নীরবতা তার করে দিলে দূর,
মহ কবি লহ প্রাণের প্রচুর ভক্তি যে কথা জানাতে আসা!"

অপহৃত-বাক্ বিস্মিত কবি ভাবে বিহ্বল মত্ত,
যেন একাকার হয়ে গেল তার স্বপ্ন এবং সত্য,
পড়ে গেল কবি বিষম বিপাকে,
মূঢ়ের মতন তাকাইয়া থাকে
কি করে কি কহে পায়না খুঁজে,
ক্রমে মনে মনে করি সঞ্চয়
শক্তি সাহস করি কথা কয়,
সঙ্কোচে নারী অবনত রয় কনক-কেয়ূর মৃণাল ভুজে!

"স্বাগত মম আঁধার কুটিরে অপরূপ রূপ দীপ্তি!
কল্যাণ হোক কল্যাণী তব সুন্দর মনোবৃত্তি,
হোক মধুময় স্বর্ণবরনী,
তোমার দিবস তোমার রজনী,
—বিকসি উঠুক পুষ্প-সম,
বিরাজে শান্তি প্রাণে চিরদিন,
প্রেম যেন কভু না হয় মলিন
জীবনের পথ হোক্ মসৃণ বিঘ্ন-বিহীন দীর্ঘতম!

প্রশংসা গানে গৌরব দানে দিয়াছ আমারে লজ্জা,
কাঙালে কখনো সাজো কি গো দেবী মনিময় রাজ-সজ্জা?
স্খলন-পতন চ্যুতি-বিচ্যুতি
আছে অজস্র ভোরে মোর পুঁথি,
কবি-সম্মানে রাখি না দাবি,
গৃহ কোণে বসি নিভৃতে একাকী
ভাষা নিয়ে ছেলে-খেলা করে থাকি,
হিজিবিজি ছবি কত কি যে আঁকি মনে-মনে যত খেয়াল ভাবি!

যখন দুপুরে ঝাঁ-ঝাঁ রদ্দুরে তন্দ্রা মগন সৃষ্টি,
ধরনীর শ্বাস পড়ে মৃদু-মৃদু ক্ষীণ হয়ে আসে দৃষ্টি,
বন পথ ধরি কাননে-কাননে
বিচরণ করি নীরব চরণে
চুপি-চুপি শুনি ফুলের কথা,
চামেলি সখিরে কামিনী কি কহে,
কী বিরহ-ব্যথা গোলাপেরে দহে,
ফাঁক করে দিই ছাপা নাহি রহে—কি ব্যথা তুররে জানায় লতা!

জ্যোৎস্না প্লাবিত নিঝুম নিশীথে আলোক সাগর যাত্রী
শুনেছি জাগিয়া তারকার গান কত বিনিদ্র রাত্রি,
ভাষার বাঁধনে ছন্দের ডোরে
সেই সংগীত রাখিয়াছি ধরে,
কেহ বোঝে কেহ বোঝে না মানে,
কেন সমীরণ হা-হা করে কাঁদে
কলঙ্ক কেন লেগে রয় চাঁদে
মনের যে কথা মুখে কেন বাধে—করে দি প্রচার কবিতাগানে!

ধেয়ানে যা লভি আঁকি সেই ছবি রূপরসে করি সিক্ত,
কল্পনা রঙে রাঙিয়া তারে আলোকিত করি চিত্ত,

প্রাণময় করি ছন্দে নাচাই
করি অনুরূপ শব্দ বাছাই,
ঝঙ্কারে ওঠে নূপুর বাজি ;
হৃদয়ের যত কল্পিত আশা
ভয় ও ভাবনা প্রীতি ভালোবাসা
তাহাদের মুখে তুলে দিই ভাষা—ভবে দি প্রাণের ফুলের সাজি !

নির্মান করি নূতন সৃষ্টিয়—কল্পানোলোক বিশ্বে,
করি মনোরম সাজাই তাহারে গন্ধে বরনে দৃশ্যে,
সে নব ভুবন বিস্মিত চোখে
স্বয়ং বিধাতা নিরখে পুলকে
পলকে-পলকে ঝলকে আলো,
যাহা কিছু হেয় তুচ্ছ শ্রীহীন
চির অনাদৃত কুরূপ মলিন
করি অপরূপ সরস নবীন—কালোকেও লাগে নয়নে ভালো !

কঙ্কালে করি প্রাণসঞ্চার—রস সঞ্চার চিত্তে,
মুছে দি প্রভেদ করি একাকার সত্য এবং মিথ্যে,
সাগরে শৈলে গগনে পবনে
পুষ্পে পত্রে বনে উপবনে
ভরে দি কান্তি, অননুমেয়,
প্রেয়সীর প্রেম করি নির্মল,
জননীর স্নেহ অশ্রু-সজল
ভরি স্বর্গের সুধা পরিমল—ফুলময় করি কণ্টকেও।

হাসি অশ্রুর রুদ্ধ ফোয়ারা খুলে দি তড়িৎ স্পর্শে,
জীবন-বীণার প্রত্যেক তার ঝঙ্কারি ওঠে হর্ষে,
প্রণয়ের শত লীলা অভিনয়
ছল ও রঙ্গ অভিমান ভয়
করেদি রঙিন গোলাপি রঙে,
যা কিছু মহান করি বরণীয়,
বিস্মৃতিলীন করি স্মরণীয়
ভরে তুলি পুঁথি প্রিয়-অপ্রিয় আমীর ফকির সাধু ও সঙে !

এত বলি কবি হইল হইল নীরব, লাগিয়া রহিল কর্ণে
তাহার কথার শেষ রেশটুকু প্রতি অক্ষরে বর্ণে,
রমণী কবির চরণ ধরিয়া
ওঠে বার-বার প্রণাম করিয়া

সম্ভ্রমে সারা চিত্ত ভরি ;
কবি দেখে চোখে স্বপ্ন-বিভল—
ঘেরিয়া বানীর চরণ কমল
উঠেছে ফুটিয়া শ্বেত-শতদল গন্ধে শোভায় আ-মরি-মরি!

(ভারতবর্ষ)

পুরোনো চিঠি

যেমন আছে তেমনি থাকুক,
খুলিসনে ও খুলিসনে ;
খুঁচিয়ে মিছে স্মৃতির আগুন
জাগিয়ে ও সই তুলিসনে ;
চিতায় যবে কোরবো শয়ন
দৃষ্টি হারা দুটি নয়ন,
ঐ চিঠির ঐ কুসুম-চয়ন
চিতায় দিতে ভুলিসনে!
রাখ মিনতি রাখলো কথা
খুলিসনে ও খুলিসনে!

গোপন আছে ঐতে দুটি
তরুণ প্রাণের ইতিহাস,
কান্না হাসি মান অভিমান
চোখের জল ও দীর্ঘ-শ্বাস
জড়িয়া আছে মধুর স্মৃতি,
মিলন গাথা বিদায়-গীতি,
অতল স্নেহ অসীম প্রীতি,
দুটি বুকের কলোচ্ছ্বাস!
গোপন আছে ঐতে দুটি
তরুণ প্রাণের ইতিহাস!

ছড়িয়ে আছে ঐতে আমার
অতীত সুখ ও সান্ত্বনা,
একশোবারি পড়েও —মনে
তৃপ্তি আমার মান্‌তোনা,
পথের পানে তাকিয়ে থাকা,
ডাক-এলো-কি-খবর-রাখা,

চিঠি সে তার স্বপ্ন আঁকা
কি মিঠে কেউ জানতোনা!
ছড়িয়ে আছে ঐতে আমার
অতীত সুখ ও সান্ত্বনা!

বুকের কত ধড়ফড়ানি
আশঙ্কা ও ভাব্না ভয়
মিশিয়ে আছে ঐতে আমার
বুকের রাঙা রক্তময়!
ধুক পুকুনি ঘুচেচে আজ,
চিঠি লেখার ফুরিয়েছে কাজ,
ওগো মরণ রাজাধিরাজ!
তোমারি জয়—তোমারি জয়!
মিশিয়ে আছে ঐতে দুটি
বুকের শত ভাব্না ভয়!

প্রথম চিঠি তার লেখা সে
ছাপার মতো অক্ষরে—
দুষ্টু মেয়ে বউদিদিটা
ছিনিয়ে নিলে জোর করে,
ঐতে আছে—রুলটানা সেই
তেমনি আজো নীল কাগজেই
সবই আছে সেই শুধু নেই
নেই সে আর এ চত্বরে!
ঐতে আছে তার সে চিঠি
ছাপার মত অক্ষরে!

ঐতে আছে আমার চিঠি
লুকিয়ে লেখা রাত জেগে,
কত হরফ ধুয়ে গেছে
চোখের জলের দাগ লেখে,
ছোট্ট চিঠি বুঝলি লো সই
হোতো না তার পছন্দ সই,
ভয়ে সারা হতেম সে ঐ
কখন কিসে যায় রেগে!
ঐতে আছে আমার চিঠি
লুকিয়ে লেখা রাত জেগে!

চিঠির ভিতর দিয়ে চুমা—
পাঠাতে সই ভুল হলে

এমন ক্ষ্যাপা আছে কি কেউ
অভিমানে যায় গলে?
অভিমানী তাহার মতো
দেখিসনি সই কারেও অতো
পড়্‌লে মনে দুঃখু হোতো
মুখখানি তার ছলছলে!
রক্ষে আমার ছিল না সই
এতটুকুন ভুল হলে।

"বড্ডো ভালোবাসি তোমায়"
"কর্‌চে বড় মন কেমন"
"তুমি নিঠুর দিব্যি আছ"
"কঠিন তোমার পাষাণ মন"
"মাথা খাও" আব "পায়ে পড়ি"
পাতায়-পাতায় ছড়াছড়ি
অভিমানে গড়াগড়ি—
"বাঁচি যদি হয় মরণ"
পাতায়-পাতায়—"ভালোবাসি"
"কর্‌চে বড় মন কেমন"!

ঠিক-ঠিকানা ছিলনা তার
ছিলনা তার কিচ্ছুরি,
খাম আছে তো নেইকো কাগজ
কলম আছে নেই ছুরি!
তবু আমায় লিখতো চিঠি
পুরোপুরি চারটি পিঠই—
খুঁটিয়ে এটি ওটি সেটি
ফুটিয়ে রঙের ফুলঝুরি!
ঠিক-ঠিকানা ছিল না তার
ছিল না তার কিচ্ছুরি!

কখনো সে লিখতো টানা—
হিজিবিজি একবারে
কখনো সে লিখতো চিঠি—
ছাপার হরফ ঝক্‌মারে!
খাম-খেয়ালি তাহার মতো
দেখিসনি লো কারেও অতো
তার কথা আর বোলব কত?
বলে সে শেষ হয়না রে!

খাম-খেয়ালি তাহার মতো
দেখিসনি সই আর কারে!

যেমন আছে তেমনি থাকুক,
খুলিসনে ও খুলিসনে ;
খুঁচিয়ে মিছে স্মৃতির আগুন
জাগিয়ে ও সই তুলিসনে ;
চিতার যবে কোরবো শয়ন
দৃষ্টি-হারা দুটি নয়ন
ঐ চিঠির ঐ কুসুম-চয়ন
চিতায় দিতে ভুলিসনে!
রাখ মিনতি রাখলো কথা
খুলিসনে ও খুলিসনে!

(বঙ্গবাণী)

নিরুদ্দেশে

যে জন গোপনে মম হৃদয়ে আঁকা,
যাহারি মিলন আশে জীবন রাখা,
তাহারি কুশল শুভ-কামনা ভরি
দেবতা-চরণে নিতি মিনতি করি—
দাও গো ফিরিয়া বিধি দাও গো তারে,
তৃষিত নয়ন দুটি হেরিতে যারে,
যাহার লাগিয়া প্রতি নিমেষে পলে
দিবস রজনী বুকে সাহারা জ্বলে!

বধির বিধাতা কানে শোনে না কথা,
মানুষে বোঝে না প্রাণে বিঁধে কি ব্যথা,
কেহ বা কখনো মুখে আ হা হা করে
করুণা-মেশানো স্নেহ-জড়িত স্বরে,
লাগে সে সহানুভূতি অসহনীয়,
হা মোর লিখন ভালে! হা মোর প্রিয়!
আড়ালে সরিয়া আসি সজল আঁখি,
মরমে বেদনা রঙা সরমে ঢাকি!

মরণ ডাকিয়া কহে—আমার কাছে
তোর চির-ইপ্সিত লুকানো আছে ;

চমকি শিহরি ত্রাসে ; দেবতা স্মরি
উজন করিয়া শিরে সিঁদুর পরি,
বাহুতে সোনার সরু কাঁকন দুটি
সবলে ধরিয়া রহি করিয়া মুঠি ;
মৃদু-মৃদু চঞ্চল বাঁ-চোখ নাচে—
আছে সে আছে সে বেঁচে, বেঁচে সে আছে!

হয়তো ভ্রমিছে একা ফকিব বেশে
গিরি-মরু-কান্তারে নিরুদ্দেশে,
নাহি প্রেম নাহি স্নেহ কোথাও কিছু,
লক্ষ বিপদ তার নিয়েছে পিছু,
পিপাসায় জ্বলে বুক কণ্ঠ রোধে,
বহ্নি হানিছে রবি তপ্ত রোদে,
আর্ত ধরণী করে পরিত্রাহি
চলেছে—চলেছে পথে—বিরাম নাহি!

অথবা চেতনা হীন শয্যাশায়ী
চিকিৎসা-গৃহ-কোণে, স্তন্যপায়ী
অসহায় শিশু-সম, জীর্ণ খাটে
বিকারে প্রলাপে তার প্রহর কাটে ;
শয়নে বিলীন ক্ষীণ শীর্ণ দেহ
কে করিবে পাখা শিরে? শীতল পেয়
কে দিবে অধরে একবিন্দু বারি?
তুমি একা আছ প্রভু দুঃখহারী!

দেশ-জননীর সেই গোঁয়ার ছেলে
হয়তো দ্বীপান্তরে নয়তো জেলে
বন্দী রয়েছে আজ ; টানছে ঘানি
সহিছে অসীম ক্লেশ মুখে না বাণী!
করেছে মটরে লুট? গড়েছে বোমা?
মেরেছে পুলিশে গুলি? কি করে ওমা!
পাগল হলেম নাকি? সে কথা কভু
থাকতো কি ছাপা? মন বোঝেনা তবু!

সে নাকি সাগর-পারে জাপানে গিয়ে
তরুণী জাপানি এক করেছে বিয়ে?
বেঁধেছে নতুন ঘর—কাঠের চালা,
ভুলে গেছে বাংলার পল্লী-বালা,

ভুলে গেছে বাংলার শ্যামল শোভা,
ধূ-ধূ-ধূ ধানের ক্ষেত নয়ন-লোভা!
সে কভু কি সম্ভব? অন্য কারে
প্রিয়া-প্রিয়তমা সেকি বলতে পারে?

এসো গো এসো গো ফিরে হে প্রিয়তম.
জীবন বিফলে হায় যায় যে মম!
মুছে গেছে নীলাকাশে সোনালি হাসি,
বিকল বাতাসে বাজে বেসুরা বাঁশি
চাঁদিনী যামিনী ম্লান কান্তি হীনা,
ধূলি অবলুণ্ঠিতা ভগ্ন বীণা,
আর কি অধিক আমি কহিব প্রিয়?
মরণের আগে শেষ দেখাটি দিও!

(উত্তরা)

আদর

ওরে	পরান প্রিয়!	ওরে	অমিয় মাখা!
ওরে	নয়ন মণি!	ওরে	নয়নে রাখা!
ওরে	চাঁদের আলো!	ওরে	ফুলের হাসি
আমি	বোঝাব কিসে?—	তোরে	কী ভালোবাসি
		বুকে হৃদয়ে আঁকা!	
ওরে	পরান প্রিয়!	ওরে	অমিয় মাথা!
তোর	উজল আঁখি	কালো	কাজল-পরা
যেন	সজল মেঘে	থির	দামিনী-ভরা!
পড়ে	ডালিম ফেটে	রাঙা	গোলাপি গালে!
নাচে	চরণ দুটি	সুরে	ছন্দে তালে!
		প্রাণ পাগল-করা!	
তোর	উজল আঁখি	কালো	কাজল-পরা!
তুই	সাগর-সেঁচা	মোর	অতুল নিধি!
বহু	পুণ্যে মোরে	তোরে	মিলালো বিধি!
চির	রঙ্গময়ী!	তোর	সাঙ্গ সুখে
সহি	দুঃখ শত	উৎ—	ফুল্ল মুখে!
		ওরে জুড়োনো-হৃদি!	
তুই	সাগর-সেঁচা	মোর	অতুল নিধি!

তুই	কল্পলতা!	তুই	মর্ত্যে পরী!
দিলি	তৃপ্তি প্রাণে	সুখ	শান্তি ভরি!
তুই	মিষ্টি মধু!	তুই	সৃষ্টি সেরা!
দিল্	রোশনি-করা	আরে	দোস্ত মেরা!

ওরে আমরি মরি

তুই	কল্পলতা!	তুই	মর্ত্যে পরী!
তুই	প্রলয় শিখা!	তুই	মলয় হাওয়া!
—লাখো	মালতী যূথী	প্রাণে	ফুটিয়ে যাওয়া!
মেশা	অমৃতে বিষে	ওরে	হীরের ছুরি!
তুই	মোহের ফাঁসি!	তুই	মায়ার ডুরি!

মন—দুরূহ-পাওয়া!

তুই	প্রলয় শিখা	তুই	মলয় হাওয়া!
ওরে	জীবনে আশা!	ওরে	মরণে স্মৃতি!
তোরে	ঘিরিয়া গাহে	যত	কাব্য গীতি!
ওরে	সোহাগে গলা!	পড়া—	আদরে গায়ে
জল	চল্‌কে ওঠা	চোখে	ফুলের ঘায়ে!

তুই নতুন নিতি!

ওরে	জীবনে আশা	ওরে	মরণে স্মৃতি!

(ভারতবর্ষ)

মাতাল

বোতল করেছি পাচাব,
ভালো কি মন্দ করিনা বিচার,
রীতি ও নীতিব লৌহ-খাঁচার
ভিতরে বন্ধ থাকিনা ;
আমরা মাতাল আমরা মরিয়া,
লোক লাঞ্ছনা নিয়েছি বরিয়া
তরল বহ্নি উদরে ভরিয়া
কারো তোয়াক্কা রাখিনা।

নিয়তি নিয়ত চক্র ঘুরায়
পলকে-পলকে জীবন ফুরায়

তাইত রঙিন জীবন ঘুরায়
যে কদিন আছি বাঁচিয়া।
চারি আশ-পাশ রাঙা করে রাখি,
কালো যবনিকা কবে দিবে ঢাকি,
নিন্দা ও গ্লানি গায়ে নাই মাখি,
বেড়াই নাচিয়া-নাচিয়া!

সংযমী তুমি হোয়োনা ক্রুদ্ধ,
মোরা মনুষ্য—নহেকো বুদ্ধ,
মধুপানে যথা ভ্রমর লুব্ধ
ফুলে-ফুলে বুলে কাননে,
আমারা তেমনি কমল-বিলাসী,
সুরা আসক্ত মদিরাভিলাসী
পাঁচবার পাঁচ-আইন খালাসী
ফিরি আরক্ত আননে।

মোদের কীর্তি লিখি যদি নানা
রীতি মতো বই হয় একখানা—
কেমনে কবার পড়ে গেছি থানা
পুলিসে দিয়েছে গুঁতিয়ে ;
কতবার রেলে খেয়েছি প্রহার,
মাথা কেটে গেছে গরাদে লোহার,
চাকরী গিয়েছে হয়েছে খোয়ার
বাবা দিয়েছেন জুতিয়ে!

স্ত্রীলোক ঘটিত কত কি কাহিনী
সৃজন করেছে বোতল বাহিনী,
বিস্তারি তাহা বলিতে চাহিনি
রইল সেগুলো উহ্য,
অকথ্য গৃহে করেছি দাঙ্গা,
করিতে ঠান্ডা রক্ত চাঙ্গা
ছুটে গেছি সেই ফরাসডাঙ্গা
কেন কিছু কেউ বুঝচো?

তুলিয়াছি হাত প্রিয়ার অঙ্গে,
ঝগড়া করেছি মায়ের সঙ্গে,
ভাবচো মোদের তুল্য বঙ্গে
শয়তান কেউ নেই গো ;

কারো এক পাই করিনিকো চুরি,
বুকে কারো কই মারিনিতো ছুরি,
ধর্মের নামে করিনি চাতুরি,
শুধু মদ খাই—এই গো!

মোরা করি পাপ? সে তো লাল চোখে,
পরে মরি লাজে অনুতাপে শোকে,
উত্তেজনায় মদিরার ঝোঁকে
কি করি থাকেনা স্মরণে ;
প্রাণ চায় খালি করিতে নৃত্য,
কে জানে মনিব কে জানে ভৃত্য,
রাঙা হয়ে যায় সকল চিত্ত
সুরার শোণিত বরনে!

ঘুচে যায় যত বাধা ও বন্ধ,
যা কিছু বিরোধ যা কিছু দ্বন্দ,
হৃদয়ে উপজে সে কি আনন্দ
বোঝাবো কি করে ভাষাতে?
প্রাণে বাজে যেন জল-তরঙ্গ
ফুটে ওঠে ছবি মনোহরণ গো,
পুলকে আবেশে শিহরে অঙ্গ
বুঝিবে কি করে চাষাতে?

এই ত আসল জীবন মুক্তি,
রেখে দাও মিছে শাস্ত্র-উক্তি
সুরা পান কিসে নহেক যুক্তি—
যুক্ত মোদের বল তো?
ছিল না যখন বোতল কি শিশি
সোমরস পান করিতেন ঋষি,
পরম ব্রহ্মে যাইতেন মিশি,
হাতে-হাতে দ্যাখো ফল হোতো।

একবার কেন দেখইনা চেকে
পৈতে গোছাটা ট্যাঁকে গুঁজে রেখে,
ঔষধার্থে শাস্ত্রে তো লেখে—
সুরাপান পারে চল্‌তে ;
ভেবেচ তোমার রাগ নাই মোটে?
ক্ষিদে পেলে তবে কেন যাও চটে?
বিছানায় শুলে খালি হাই ওঠে
বেধে যায় কথা বল্‌তে?

ও গুলো দারুণ পীড়া স্নায়বিক,
সারবেনা বিনা ঔষধে ঠিক,
বোলবো আরকি ইহার অধিক?
জান্‌তে পার্‌বে ঠেকলে ;
নেশা করা পাপ—অতি কুকার্য—
এ কথা কদাপি নহে স্বীকার্য,
সারা দুনিয়াই নেশার রাজ্য—
বুঝ্‌বে সম্‌ঝে দেখলে!

তারকা চন্দ্র গ্রহ উপগ্রহ
বোঁ-বোঁ-বোঁ ঘুরছে কেন অহরহ?
দূরবীণ কষে কেন ও গো কহ
জ্যোতিষী আকাশে তাকিয়ে?
যোদ্ধারা কেন করিছে যুদ্ধ?
সাধনা করিছে জ্ঞানী ও বুদ্ধ?
কিসের নেশায় অর্থলুব্ধ
ছুটেছে মোটর হাঁকিয়ে?

নদীগুলো কেন কিসের নেশায়
আপনারে ঐ সাগরে মেশায়,
রক্ত-গগনে রঙিন উষায়
রাঙা হয়ে ওঠে সূর্য?
কেন রাত জেগে পাগলের মতো
গাঁথিতেছে কবি ছন্দ নিয়ত,
কাঁচা মাথাগুলো বলি দেয় যত
স্বদেশ প্রেমিক পূজ্য?

মারা যাবে তুমি—পাক্‌বে লিভার
কান কালা হলো শুনে বারবার,
মরণের খোলা সহস্র দ্বার
আগলাবে তুমি কোনটা?
সুরা না খেলেই হব কি অমর?
জিনিয়া লইব জীবন সমর?
কাঁচা হয়ে যাবে শুক্ল চামর
ফুলগুলো আর মনটা?

এ কথা কিন্তু বলতেই হবে
সুরা যে নেশার রাজা এই ভবে,
ইহা বিনা কভু নাহি সম্ভবে
মেঘনাদ হেন কাব্য ;

জন্ম নিয়েছে সুরানুরক্ত
বহু গুনী জ্ঞানী কবি ও ভক্ত,
হিসেব তাদের রাখাই শক্ত
কি করে হিসেব রাখ্‌বো?

বল্‌বে ও সব দেবতার খেলা
পাপ লেখে বুঝি আমাদেরি বেলা?
হে সমাজ মারো যত পার ঠেলা
পা দিয়ে মোদের অঙ্গে ;
কারণ আমরা নেহাৎ তুচ্ছ,
নাহিকো লম্বা দীর্ঘ পুচ্ছ,
তুলনা মোদের হয়না উচ্চ
ব্যক্তির কভু সঙ্গে!

তাই যেন হলো ; কিন্তু যাহারা
বিধবা ভাজের মারে মাসোহারা,
নিজের স্বার্থে দিচ্চে পাহারা
নিয়ত তীক্ষ্ণ চক্ষে ;
কিংবা যে সব সুদ-খোর পাকা
ধরে শতকরা ছত্রিস টাকা,
ব্যবসা যাদের বাড়ি বাঁধা রাখা
কায়দায় পেয়ে লোককে,

খাস ডাকে ফিরে কেনে তা নীলামে,
অথবা যাহারা বিবাহের নামে
ছেলে বিক্রয় করে চড়া দামে—
কশাই-এর ওঁচা বৃত্তি!
আর যারা তোলে লাখ-লাখ চাঁদা
বানিয়ে বেবাক লোকেদের গাধা,
ফাঁক করে দেয় বেমালুম শাদা
ফাঁদে প্রামোদের ভিত্তি,

এবং যাহারা নাবালক ভায়ে
বাপের বিষয় ফাঁকি দিতে চাহে
বিধবা বোনেরে থেঁতলায় পায়ে
মায়েরে দেয়না অন্ন ;
অথচ স্বদেশ-জননীর তরে
নিয়ত চক্ষে শোকাশ্রু ঝরে,

দেশ-ভ্রাতাদের বাঁধে রাখী করে
কেনেনা বিদেশি পণ্য

এবং যাহারা ধনোন্মত্ত
শোষণ করিছে দীনের রক্ত
জীবনের যার করেছে অর্থ—
ব্যাখ্যা করিব কত বা,
ছুটেছে মোটরে হাঁকিয়ে বেদম,
পথিকেরে ভাবে পশুর অধম,
চাকার তলায় করিছে জখম,
মৃত্যু হানিছে অথবা,

এবং যাহারা টিকি ফোঁটা কেটে
পাঁঠার ঘুগনি মারে ঘরে সেঁটে,
মুর্গির চড়া পড়ে গেছে পেটে,
মুখে বলে—"জয় শ্রীরাধে!"
হে সমাজ কই কর মা বারণ,
তোমার বক্ষে রাখিয়া চরণ,
হেন কোটি লোক করে বিচরণ
হাসি মুখে নির্বিবাদে!

আমাদেরি তুমি টুটি টিপে ধর,
দেখিলে ভ্রূকুটি ইংগীত কর,
ঘৃণার পক্ষে সরো-সরো-সরো
ভাবখানা ওঠে ফুটিয়া,
তাদের তো কই করনাকো কিছু?
চুপ করে থাক মাথাখানি নিচু,
কুকুরের মতো ফের পিছু-পিছু
গড়াগড়ি খাও পুটিয়া!

এই কি তোমার সূক্ষ্ম বিচার?
মানিতে পারিনা আমরা নাচার,
তোমার গঠিত লৌহ-খাঁচার
ভিতরে বদ্ধ থাকিনা;
আমরা মাতাল আমরা মরিয়া,
লোক লাঞ্ছনা নিয়েছি বরিয়া,
তরল-বহ্নি উদরে ভরিয়া
কারো তোয়াক্কা রাখিনা!

(উত্তরা)

সমালোচকের প্রতি

"নিয়ে সূঁচ লাল-গুলি রেশমি সুতো
সারা বেলা একি খেলা? বুনিস জুতো!
এ যে সখি নিতান্ত গদ্যে ভরা,
সহজেত বঁধু ওতে দেবেনা ধরা।
তার চেয়ে বেছে-বেছে আনগে তুলে
নরম-নরম পাঁচ রকম ফুলে
গেঁথে হার চম্পক-অঙ্গুলিতে
সোহাগে বরের গলে পরিয়ে দিতে!
প্রেমের এ সনাতন প্রাচীন প্রথা,
ফেলে দে ফেলে দে সূতো—রাখলো কথা!

কারে ও লিখিস চিঠি আপন মনে?
একাকী নীরবে বসি গৃহের কোণে!
যত বলি—দেনা দেখি, দেবেনা তবু
দেখিনি এমন মেয়ে জীবনে কভু
অন্ততঃ দু-চারিটে লাইন গোনা
আমার খাতিরে নয় পড়েই শোনা!
ও মা! ওতে রস কই? কই সে মধু?
পড়লেই ভালো যাতে বাস্‌বে বঁধু!
কোথায় মিলন-তৃষা, বিরহ-ব্যথা?
ফেলে দে ফেলে দে চিঠি—রাখলো কথা।

পমেটম জরি দিয়ে আয়না ধরে,
কি খোঁপা বাঁধলি মরি সাবাস তোরে!
এর চেয়ে এলো চুল ছিল যে ভালো,
সজল মেঘের মতো চিক্কন কালো!
হয়নি সমান সিঁথি গিয়েছে বেঁকে,
অত বড় টিপ তোরে কে দিল এঁকে!
রাঙা টিপ সিঁদুরের একটু খানি
দিব্যি মানাতো ওলো রূপের রানী!
সন্ধ্যা গগন ভালো তারকা যথা,
মুছে ফ্যাল্‌ কালো টিপ—রাখ্‌লো কথা!

রুচির তারিফ করি—বাহারে বাহা!
দিদিমার যুগ কিরে আনলি ডাহা!
এ কালে ও লাল ডুরে কে কোথা পরে?

—নয়নে কি লাগে নেশা, নজরে ধরে ?
চুড়িগুলো বেমানান—পড়্‌চে খুলে !
বাজে মল ঝমাঝম চরণ মূলে !
শনিবার—বেলাটুকু আস্‌চে মরে,
বসন ভূষণ নব আয় লো পরে !
কোন কাজে নেই গোছ শৃঙ্খলতা,
ওরে ওরে বোকা মেয়ে রাখ্‌লো কথা !"

"ক্ষমা দে—ক্ষমা দে সখি মিনতি করি,
তোর সমালোচনায় বেজায় ডরি !
পিরীতি পিনাল কোডে আইন যত,
কে জানিত সবই তোর কণ্ঠগত !
খোল এক পাঠশালা—হয়ে যা গুরু,
প্রণয়ের ক খ পাঠ করে দি সুরু ;
এলে বঁধু বোলবো যে—ধৈর্য ধরো,
কিছু কাল দোষ ত্রুটি সহ্য করো,
শ্রীমতী অমুক দেবী শিক্ষকতা
নিয়েছেন দয়া করে—রাখলো কথা !

(বসুধারা)

বিরহিনী

কোন্ বিদেশের বসন্ত আজ
এল হঠাৎ হাওয়ায় উড়ে !
কই আষাঢ়ে মেঘের ঘটা
আলোর ছটা আকাশ জুড়ে !
ঠাণ্ডা সাদা চাঁদের আলো
অসময়ে লাগ্‌চে ভালো,
এ সময়ে কে বিদেশি
উদ্দেশে ফুল মারলে ছুঁড়ে !
কোন্ বিদেশের বসন্ত আজ
এলো হঠাৎ হাওয়ায় উড়ে !

ফুর্‌ফুরে এই ঠাণ্ডা হাওয়ায়
আধ জাগা আধ ঘুমের ঘোরে,

শুন্‌চি কানে ডাকচে যেন
নাম ধরে কে আদর কোরে!
আল্‌তো চুমা ঠোঁটের আগে
তার সে ভারি মিষ্টি লাগে,
চোখ চেয়ে যাই দেখতে যাব,
পালিয়ে কোথায় যায় সে সরে!
ফুরফুরে এই ঠান্ডা হাওয়ায়
ডাক্‌চে কে মোর নামটি ধরে!

যা রে পাখি যা রে উড়ে,
আমার তারে খবর দে না!
এক্ষুনি সে মিটিয়ে দে যাক্‌
আমার কাছে তার যা দেনা।
এমন রাতি বিফল যাবে,
এর প্রতি ফল পাবেই পাবে ;
মিছে আমার ফুল বাগানে
ফুটলো বকুল গোলাপ হেনা!
যারে পাখি যা উড়ে যা,
আমার তারে খবর দে না।

পাত্‌লা মেঘের রেশমি রুমাল
হাওয়ার স্রোতের একটানাতে,
রং-বেরংএর ঘুড়ির মতো
ওড়ায় কে আজ কাদের ছাতে!
খয়ের রঙের ঐ দুখানা,
চাঁপা ফুলের রং ওটানা?
কমলা নেবুর রং এটারে
পারেনাকো হার মানাতে!
পাত্‌লা মেঘের রেশমি রুমাল
ওড়ায় কে আজ কাদের ছাতে!

এত বাহার দেখাই কারে?
জানাই কারে মনের কথা?
ছেয়েছে আজ সোনার ফুলে
পাতায়-পাতায় আলোক-লতা!
বুকের কাছে মুখটি বুযে,
কার কাছে আজ রইলো শুয়ে?
কার বুকে আজ বুক মিলিয়ে
শুন্‌বো বুকের গোপন ব্যথা?

ছেয়েছে আজ সোনার ফুলে
পাতায়-পাতায় আলোক-লতা!

যারে পাখি যারে উড়ে
আমার কথা বল্‌গে তারে,
এমন সময় কেউ কখনো
একলাটি কি থাক্‌তে পারে?
পাগল আমি হলেম নাকি?
কথা ও সে কয় কি পাখি?
কি বল্‌তে যে কি বলি ছাই—
ঘুম তুই ও কি আসবি নারে?
যা রে পাখি যা রে উড়ে
আমার কথা বল্‌গে তারে!

(বসুমতী)

রসের প্রলাপ

"ঠানদি, আমার ঠাকুরদাদা
ডাকতো তোমায় কি বলে?"
"সারাদিনটা এলোমেলো
বকিস কেন? বেলা গেলো,
পাগ্‌লি আমায় ছেড়ে দে লো—
যাই কাজে চলে।"

বলো "দুটি পায়ে পড়ি তোমার
ঠান্‌দিদি গো ঠান্‌দিদি!"—
"সে সব যে ভাই ভুলে গেছি ;
তার মরণের পেছো-পেছি
কনে-বউ-ডাক্ শেষ শুনেছি
আজ সে কি দিদি?"

ঠান্‌দি আমার ঠাকুরদাদা
দিত তোমায় কি কিনে?"
"হীরের কণ্ঠি ভুবন-আলা,
মানিক জ্বালা মুক্তো মালা।
ছাড়না আঁচল-একি জ্বালা!
—কথা শুনবিনে?"

বেবাক ঝুটো! সত্যি বলো—
ঠান্‌দিদি গো ঠান্‌দিদি!—"
পাঁচরকমের রকমারি
কাঁচের চুড়ি বেলোয়ারি,
পায়না পোলি, পার্শী শাড়ি,
হিসেব তার কি দি!"

"ঠান্‌দি, আমার ঠাকুরদাদা
তোমাকে কি করতো ভয়?"
"বাঘ না ভুত? না গুরুমশাই?"
জুজু? না, কি ঠাকুর গোঁসাই?
ভয় যে করবে বল দেখি তাই!
—গোলাম যে তো নয়।"

"দুটি পায়ে পড়ি তোমার
ঠান্‌দিদি গো ঠানদিদি!—"
"ভয় মানে কি? মোটের মাথায়,
শুনতো কথা চলায় ফেরায়
হাজ্‌রে দিত রাত দশটায়
সে মোর আঁচল-নিধি।"

"ঠানদি, আমার ঠাকুরদাদা
প্রেমের চিঠি লিখতো কি?"
"থাকলে তুই লো, লিখতো তোকে,
ভুলিয়ে নিত এক শো লোকে
নাত-জামাইটি কাঁদতো শোকে
'—প্রাণ যায় সখি!'

"দুটি পায়ে পড়ি তোমার
ঠান্‌দিদি গো ঠানদিদি—"
"মৌমাছি কয় ফুলকে ডেকে,
চাতক চেঁচায় মেঘ না দেখে,
দূরের মানুষ দূরকে লেখে ;—
বিরহের বিধি।"

"ঠানদি, আমার ঠাকুরদাদা
কিসে তোমার ভাঙ্‌তো মান?"
"উৎরে গেল সন্ধেবেলা
যাই আমি কাজ আছে মেলা,
পোড়ারমুখীর এ কি খেলা
সারা দিনমান।"

"দুটি পায়ে পড়ি তোমার
ঠান্‌দি আমার ঠান্‌দি গো!—
"ঝগড়া হলে ধরতো পায়ে,
গায়পড়া সে পড়তো গায়ে,
চির কালের প্রথাটা এ
রণের পরে সন্ধি লো!"

"ঠানদি. আমার ঠাকুরদাদা
চুমো দিত দুই গালে?"
"ফোগ্‌লা দাঁতে হাঁসাস্‌নে ভাই!
চুমোর কথা বলবো কি ছাই!
তেমন চুমো দেখ্‌তে না পাই
তোদের এই কালে!"

"দুটি পায়ে পড়ছি তোমার
ঠানদিদি গো রঙ্গিণী!—"
"আলোর তবে কর আয়োজন,
জপ-আহ্নিকের নেই প্রয়োজন,
(চল্‌) প্রলাপ রচি আমরা দু-জন
দু-বয়সের সঙ্গিণী!"

(ভারতী)

মার ব্যথা

খোয়া গেছে মোর নয়নের মণি জ্বলে গেছে মোর সুখ
ডুবে গেছে মোর আকাশেব চাঁদ ভেঙে গেছে মোর বুক!
বারোটি বছর নয়নের আড নিমেষ করিনি যারে
আজ সে কোথায়—কোন খানে প্রভু—কোথা গেলে পাব তারে?
মনে পড়ে তার ছেলেবেলাকার কচি-কচি সেই মুখ,
কালো-কালো চুল নরম আঙুল—দুটি দাঁত এতটুকু;
দুষ্টুমি-ভরা কালো আঁখি-তারা আলো-করা সারা ভিটে,
টিপি-টিপি হেসে চুমা দিত এসে মিছরির চেয়ে মিঠে;
নষ্টামি আর ফন্দি-ফিকির রকমারি তার কত,
দুধ খাওয়ানোর ভীষণ দাঙ্গা ঘুমে হাঙ্গামা শত;
বড় হলে পরে দষ্যিপনায় ঘরে তেষ্ঠানো ভার
পায়রার খোপে বনে ঝাড়ে-ঝোপে খালি দরকার তার;

সকালে দুপুরে রদ্দুরে ঘুরে রক্তবরণ মুখ
বিষ্টিতে ভিজে হোত তার কি যে পেত সে যে কোন্ সুখ!
আমার সে খোকা ভারি একরোখা—ছিলনাকো ভয় ডর.
শাস্তি-শাসন মানা ও বারণ তবুও কথান্তর!
এখনো কপালে জ্বল-জ্বল জ্বলে—এই যে কাটার দাগ,
ঝিনুকের বাড়ি মেরেছিল খোকা—উঃ কি বিষম রাগ!
একশো নিশানা অঙ্গে-অঙ্গে সঙ্গে-সঙ্গে ফেরে,
ঠিকানাটি শুধু পাইনেকো তার—জ্বলে গেল বুক যেরে!
স্বর্গেতে প্রভু গেছে সেকি চলে? খেলে নন্দন বনে?
বেলা পড়ে এলো খেলা সারা হলে পড়ে তার মাকে মনে?
হয়ে গেছে ছাই সে আর সে নাই—শোক করা শুধু মিছে
কেহ বলে প্রভু—কেন ছুটে মর আশা-আলেয়ার পিছে?
দাও বিশ্বাস দাও প্রাণে বল কর সন্দেহ ক্ষয়,
তোমার ও দেওয়া বেদনা এ বুকে সয় যেন ও গো সয় ;
ক্ষণিক বিবহ আঁধারের পারে চির মিলনের আলো
ঐ ঐ ঐ—ঐ দেখা যায়! সেই ভালো-সেই ভালো!
এ পারে একাকী ঘাটে বসে আমি ও পাবের পানে চেয়ে,
পার করে দিবি আয় ওরে আয়—আয় ওবে মোর নেয়ে!

(বঙ্গবাণী)

শ্রদ্ধাঞ্জলি

হঠাৎ এমন পড়বে ভেঙে বিরাট একটা হিমালয়
একটা বিশাল সাগর শুকিয়ে যাবে,
দীপ্ত সূর্য পড়বে খসে মাঝ-গগনে অকস্মাৎ
দিন-দুপুরে এমনিতর ভাবে,
কল্পনাতে পায়নিকো ঠাঁই, স্বপ্নে কভু ভাবিনিকো
এমনতর সর্বনাশের কথা,
হায় নিয়তি ভাবতবাসীর বুকে তুমি দিলে দাগা
বজ্র-সম রইলে লেগে ব্যথা!

সে যে ছিল পুরুষ বাচ্ছা আসল সাঁচ্চা খাটি মানুষ
এই কাপুরুষ ভেল ও মেকির দেশে.
সারা দেশের বুকের নিধি মাথার মণি চোখের আলো
তারেও মরণ ছিনিয়ে নিল শেষে!

জ্ঞানে কর্মে ত্যাগে ভোগে শৌর্যে বীর্যে সে যে ছিল
পুরো এক হাত সবার চেয়ে বড়ো,
তাহার সমকক্ষ মানুষ ক্বচিত কোথায় একটা মেলে
বিশ্ববাসী করলে পরে জড়!

কে জান্‌ত যে আগমনীর বাঁশি হঠাৎ বিষাদ সুরে
বিসর্জনের বিদায়-গীতি গাবে?
কে জান্‌ত যে প্রজ্জ্বলিত হোমের শিখা একটি ফুঁয়ে
অসময়ে এমনি নিভে যাবে?
শিবাজী ও বুদ্ধদেবের অস্থি দিয়ে তৈরি সে যে,
কর্মযোগী বিরাট পুরুষ একা
উদ্দীপনায় নাচিয়ে দিল বাংলা দেশের অসাড় শোনিত,
ও রকমটি আর কি যাবে দেখা?

ছিলনা সে স্বার্থান্বেষী অর্থ লোলুপ বিবেকবিহীন
ক্ষুদ্র-মনা আইন ব্যবসায়ী,
রাজ ঐশ্বর্য বিলাস বিভব অকাতরে বিলিয়ে দিল
বারেক ফিরে দেখলে না তা চাহি!
তীক্ষ্ণ তরবাবির মতো ধারালো তার মণীষা সেই
প্রতিপক্ষের যুক্তি দিত কাটি,
তার করুণা ঝরণা সম পড়তো ঝরে সবার শিরে
ভিজিয়ে দিত বাংলাদেশের মাটি!

তার অভাবে উঠ্‌ছে ঠেলে মানচেনাকো প্রবোধ-মানা
অশ্রু সাগর ভারতবাসীর চোখে,
যেমন গেল তেমনিটি তো আর হবেনা একশো বছর—
সমস্বরে বল্‌চে সকল লোকে!
হে বৈরাগী, ওগো কবি, তুমি ছিলে দেশের মাথা
প্রাণেব রাজা প্রিয় প্রিয়তম;
আজ্‌কে তুমি কোন্ ঠিকানায়? স্বদেশ প্রেমে মাতোয়ারা
পাগল গোরা তোমায় নমোনমঃ!

(বিজলী)

গান

বরিষে বারিধারা—শ্রাবণ-নিশা,
বিরহ জ্বলে বুকে—মিলন তৃষা!
বিজলি চারিধারে চমকি উঠে,—
হৃদয়ে তারে-তারে প্রবাহ ছুটে
পড়ি লুটে—
খুঁজে পাইনা দিশা!
বরিষে বারিধারা শ্রাবণ-নিশা!

মেঘেরি গরজন শ্রবণে আসে,
একাকী নিরজনে শিহরি ত্রাসে—
প্রাণেরি প্রিয় বঁধু কোথা হে তুমি?
এসো গো এসো বুকে—আদরে চুমি!
বনভূমি—
জলে আঁধারে মিশা!
বরিষে বারিধারা শ্রাবণ-নিশা!

(নাচঘর)

ফাঁসির আগে

উঃ! কী যাতনা সারা রাত ধরে—মরণের বাড়া এযে!
শিরগুলো সব ছিঁড়ে গেলো বুঝি—গড়াগড়ি খাই মেঝে!
জ্বলে মরি ওগো জ্বলে মরি—এ যে তপ্ত বালির খোলা!
পায়চারি করি—চরণ চলেনা—চোখে দেখি সব ঘোলা!
জিভ টেনে ধরে—আটকায় দম নিশ্বাস নিতে জোরে,
দাঁড়াতে পারি না—জল দি মাথায়—বন-বন করে ঘোরে,
জিভটা শুকিয়ে হয়ে গেছে ঠিক ভিজে ব্লটিং-এর মতো,
টগ্‌-বগ্‌ করে ফুটচে বুকের গায়ের রক্ত যতো,
দারুণ তৃষায় ছাতি ফেটে যায়—জল কই কোথা জল?
পউষের শীতে গায়ে ছোটে ঘাম গলগল্‌ অবিরল,
চুলগুলো সব ছিঁড়ে ফেলে দিই—মাথা খুঁড়ে মরি মেঝে!
উঃ! কী যাতনা সারা রাত ধরে—মরণের বাড়া এযে!

দাও বল প্রাণে দাও বল প্রভু—কাতরে তোমায় ডাকি!
নেই আর দেরী—বাজে ঐ ভেরী—প্রহর খানেক বাকী!
রাত হলে শেষ—হয়ে যাবে শেষ কুড়ি বছরের খেলা!
লালে লাল ঘোর করে দেবে রাঙা প্রথম প্রভাত বেলা

আমারি তরুণ নবীন রক্তে ; অজানা ঠিকানা দেশে
চলে যাব চির-জন্মের মতো শোণিত প্রবাহে ভেসে!
প্রিয় পরিজন শ্যামল ধরণী—আকাশ বাতাস আলো
মুছে যাবে সব—একটি আঁচড়ে করে দেবে সব কালো!
থেকে-থেকে বুকে কর দুপ্ দুপ্ মাথা করে দপ্ দপ্,
ডাকি হে শ্রীহরি কাতরে তোমারে করি তব নাম জপ্,,
তবুও শান্ত হয় না হৃদয়—বোঝেনাকো মন তবু,
জীবনের প্রতি এত কেন টান—এত কেন মায়া প্রভু!

এই তো জীবন—মানব জীবন—ফুল ফোটা ফুল ঝরা,
যেতেই তো হবে আগে নয় পিছে কেন মিছে শোক করা?
ঝরে গেল কই? না ফোটা হতেই ছিঁড়ে নিল নিল ছিঁড়ে!
এ নয় মরণ—সাধের মরণ—সুখে গঙ্গার তীরে ;
ও যে অপঘাত—দারুণ ভীষণ—ফাঁসিকাঠে এ যে ঝোলা!
এ 'নয় সে দোল', দে দোল, দে দোল—নতুন এ এক দোলা
ভাবলেও গায়ে দিয়ে ওঠে কাঁটা—ডেকে গেলো ঐ পাখি,
আকাশের রঙ ফিকে হয়ে এলো—রাত নেই বেশি বাকি,

উঃ! কী যাতনা দিচ্চে মোরে প্রাণের শিকড় ধরে!
হায় গো বিধাতা গড়েছ মানুষে এত দুর্বল করে!
আত্মা অমর পড়েছি গীতায়—কাজে লাগিল না প্রভু,
জীবনের প্রতি গেলনাকো টান—গেলনাকো মায়া তবু!

রাজ-বিদ্বেষ করেছি প্রচার?—কে আবার কার রাজা?
করিনিকো খুন—দেশ-শত্রুরে দিয়েছি উচিত সাজা
রগ ঘেঁসে ঠিক গুলি মেরে তারে ; আমি খুনী আমি পাপী?
কবুল করেছি ঠিক-ঠিক সব—কিছুই রাখিনি ছাপি,
আমি গড়ি বোমা গুপ্ত-সমিতি—মিটাতে পিপাসা মোর
দেশ-শত্রুর উষ্ণ শোণিতে , আমি নই হীন চোর!
মায়ের চরণে লোহার শিকল বড় বেজেছিলো প্রাণে,
তুমি জানো না গো হৃদয়ের ব্যথা আর বলো কেবা জানে?
উপড়ি হৃদয় পুষ্পের মতো তোমার চরণে ডালি
দিব হাসিমুখে শপথ করেছি সেই কথা আজ খালি
মনে পড়ে আর লজ্জার মরি—ছিঃ কি জীবন ছার!
এই সে সুমুখে বরাভয়প্রদ মুরতি আমার মার!

নমো নমো নমো দুটি অনুপম চরণ কমলে নমো,
এ কী অতুলন বরিষে নয়ন শান্তি অমৃত-সম!

শত ইন্দুর সুধাবিন্দুর কান্তি ঝলকে মুখে,
প্রতি নিশ্বাসে ঝরে আশ্বাস—পাই বিশ্বাস বুকে!
যন্ত্রনা টুটে গেল কোথা ছুটে—নাই ভয় নাই ভয়,
জয় মা জননী জগজ্জননী—জয় মা তোমার জয়!
কুত্তারে দিয়ে খাওয়াক মাংস—দিক ফাঁসিকাঠে ঠেলে,
করিনে কেয়ার মাগো মা তোমার স্বাধীনতা যদি মেলে ;
আমার এ অর্ঘ্য প্রতি সামান্য জানি আমি মাগো জানি,
তবু ও চরণ রাঙাতে তোমার দিতেছি হৃদয়খানি,
আমার ব্যর্থ সাধনা সফল হবে একদিন হবে,
তোমার শাস্তি এই নিপীড়ন কদিন দেবতা সবে?

আমি প্রস্তুত,—আয় জহ্লাদ ফাঁসিকাঠে নিয়ে চড়া,
তুচ্ছ শরীর কৃমির ভোগ্য রক্তমাংসে গড়া!
করিনেকো শোক ইহার জন্য মনে পড়ে শুধু যায়
শোকোন্মাদিনী গর্ভধারিণী বিধবা আমার মায়,
তাঁর সে কান্না চীৎকারধ্বনি কানে আসে মোর ভেসে
দুর্বল করে দেয় সারা প্রাণ—এই ছিল লেখা শেষে?

উদ্দেশে মোর নাও মা প্রণাম, দাওমা পায়ের ধূলি,
কর মার্জনা খোকার তোমার দোষ অপরাধ গুলি,
জঠরে তোমার জন্ম লভেছি—করেছি স্তন্য পান,
এ সময়ে যদি কেঁদে ফেলে দিই—তোমারি সে অপমান!
করো মা আশিস দাও প্রাণে বল দাও মা শক্তি তুমি,
সময় হয়েছে নিকট এখন—অদূরে বধ্য-ভূমি!
ওরে মোর প্রিয়, বড় আদরের ভাইটি আমার ভাই,
তোর মুখপানে মনে-মনে-মনে ফিরে-ফিরে আমি চাই,
দাদা-দাদা বলে তোর ওই ডাক এখনো বাজে এ কানে,
বিদায়ের ব্যথা তোরি বুকে নয়, আমারো যে বুকে হানে!
আমি কিরে জড় অসাড় পাষাণ স্নেহদয়ামায়াহীন?
আমি কী ভীষণ হিংস্র-পিশাচ—আজ বিদায়ের দিন
এক ফোঁটা জল পড়েনাকো চোখে?—নয় ওরে তা তো নয়
জননীর যদি শৃঙ্খল ঘুচে-বজ্রও বুকে সয়!
অবোধ বালক হোসনে অধীর—হোসনেকো কেঁদে সারা,
যেতেই তো হবে এটা না ওটায়—জগতের এই ধারা ;
মাথার উপরে আছে এক রাজা—আর কোন রাজা নাই,
শয়তানে কভু দিসনেকো কর—যাই ভাই আমি যাই!

সারারাত ধরে ছট্-ফট্ করে চোখে নেই মোর ঘুম,
ফর্সা হয়েছে—লাগবে এখনি মস্ত একটা ধুম!

পূর্ব গগনে কুঙ্কুম মেরে করে কে দিয়েছে লাল!
হাতটি বাড়িয়ে ভরে কে আবির ধরেছে সোনার থাল!
আজ যে ঝুলন—আমার ঝুলন—খেতে হবে দোল দোলা!
শুভ দৃষ্টির হবে বিনিময়—মুখানি ঘোমটা খোলা
দেখে নেব আমি মরণ-বধূর নিবিড়, আলিঙ্গনে
করে দেবে নীল সর্ব শরীর—চুম্বণ বরিষণে

করে দেবে মোর সংজ্ঞার লোপ,—দে দোল দে দোল দোলা!
দেখবো আজিকে মরণ-বধূর মুখানি ঘোমটা-খোলা!
আমি প্রস্তুত—আয় জহ্লাদ—ফাঁসি কাঠে নিয়ে চড়া,
তুচ্ছ শরীর কৃমির ভোগ্য রক্তমাংসে গড়া!

করেছি যে কাজ নেই তার চারা—মরণের নেই ভয়,
একটা খট্‌কা তবুও কেমন বুকে যেন বিঁধে রয়,
থেকে-থেকে সেটা কাঁটার মতন খচ্‌-খচ্‌ করে ওঠে,
মরণে 'জয় করেও মরণে সুখ নেই মনে মোটে!
ভুল পথে ছুটে খোয়ালি ও প্রাণ'—বলছে যেন কে কানে,
'মায়ের পিপাসা মেটেনা অবোধ ছেলের রক্ত-পানে,
প্রেমই সত্য একা এ জগতে—দ্বেষ-বিদ্বেষ নয়,
আসুরিক ঐ হিংসায় দেব-শক্তির অপচয়
কেইবা মিত্র? কেইবা শত্রু? আমাদেরি সব ভাই,
ভুল বুঝে যদি ভুল করে কেহ ক্ষমা তারে চাই'—
এ যে বুদ্ধের এ যে খ্রিস্টের এ যে গান্ধীর বাণী!
জীবনে যে কথা মানিনি কখনো—এখন সে কথা মানি।

(বঙ্গবানী)

অবেলায়

ছল-ছল দুনয়ানে ব্যথাভরা অভিমানে,
হৃদয়-কুসুম মম অকাতরে দলিয়া,
তীক্ষ্ণ সূচিকা-সম, বিঁধিওনা প্রিয়তম,
কথা রাখ, পায় ধরি যেওনাকো চলিয়া।

করি নাই অবহেলা ; কখন পড়েছে বেলা—
কখন ভেঙেছে মেলা ছিল নাকি স্মরণে?
পসারিনী আঁখি-জলে, মিনতি করিয়া বলে—
শূণ্য পসরা দিব কি করিয়া চরণে?

নাহি যৌবন বঁধু, অধরে অমিয় মধু,
বিজলি চমকি চোখে বুকে শর হানে কি?
আর কি মিলনে মোর, লাগে স্বপনের ঘোর!
বাজে বীণা ফোটে ফুল জ্বলে আলো প্রাণে কি?

কোথা এবে পাব হাসি, সোহাগ বচনরাশি?
ভালোবাসি বলিতেও মরি লাজে সরমে!
তুমি ভাব অনাদরে দূরে-দূরে থাকি সরে,
বোঝার কেমন করে কী বেদনা মরমে!

মনে পড়ে একদিন, ছিল কালো-রেখাহীন,
রঙিন জীবন-স্রোতে ভেসেছিল তরণী,
ছুটেছিল ভরা-পালে, আকাশ বাতাস লালে,
হয়েছিল রাঙা, রাঙা হয়েছিল ধরণী!

এখনো স্মৃতির আগে, দিবস-রজনী জাগে—
প্রেমের অমরাবতী গড়েছিনু দুটিতে,
অহরহ উৎসব, কৌতুক কলরব—
ইন্দ্রের বৈভব বাঁধা ছিল মুঠিতে।

সে স্বর্গ ধূলিসাৎ— এখন হয়েছে নাথ,
নির্মূল পারিজাত কি দে মালা গাঁথি গো!
শত সূর্যের বিভা উজল করে না দিবা,
কোথা গেল আমাদের সে মাধবী রাতি গো!

সঙ্কোচে একপাশে অবনত থাকি ত্রাসে,
অতীতের পানে ফিরে বৃথা অনুশোচনা,
মাটির প্রদীপ ধরি, তোমারে আরতি করি,
নিভে গেছে মরি-মরি সে-রূপের জ্যোছনা!

অনুখন গৃহকাজে, আর কি আমারে সাজে,
নীল শাড়ি? মল্লিকা মালতী এ অলকে?
শান্ত ও সংযত, হয়েছে বাসনা যত
আর না এ তনুলতা লাবণ্যে ঝলকে।

তবুও তোমারি আমি, জীবনে-মরনে স্বামী,
তোমারি তোমারি আমি এ কথাটি জানিও,
করি নাই অবহেলা, তুমি এলে যে অবেলা!
পড়ে আছে ঝরা মালা নেবে যদি তা নিও!

(উত্তরা)

একবার

থেকে থেকে পড়ে মনে একবার এ জীবনে
এসেছিল বসন্ত-হিল্লোল,
দক্ষিণে ফুলেল হাওয়া করেছিল আসা যাওয়া
প্রাণে মোর দিয়েছিল দোল!
ফুলে—ভরেছিল শাখি উড়ে—এসেছিল পাখি
গেয়েছিল কোয়েল পাপিয়া,
সবুজ সোনালি সব করেছিনু অনুভব
হৃদয়ের প্রতি শিরা দিয়া!
দুটি কার আঁখি কালো চোখে লেগেছিল ভালো,
আলো করি দিল ত্রিভুবন,
লাজে ভয়ে অনুরাগে স্মরণে আজো সে জাগে
নিশিদিন সদা অনুখন!
সরস পরশে কার মুঞ্জরিল চারিধার,
গুঞ্জরিল ভ্রমর-ভ্রমরী!
উর্বরিল শুষ্ক মরু ফুটিল চম্পক তরু,
অশোক বকুল মরি-মরি!

একবার এ জীবনে এসেছিল পড়ে মনে
পূর্ণিমার জোছনা-প্লাবন,
আকাশেব বাঁধ ভেঙে হু-হু করে এলো নেমে
স্নিগ্ধ শুভ্র অজস্র কিরণ!
সে আলোক-পারাবারে ডুবে গেনু একেবারে,
ডুবে গেল সৃষ্টি চরাচর,
মোহময় স্বপ্নময় মনে হল সমুদয়,
কি সুন্দর মবি কি সুন্দর!
স্বপ্নাবেশে তন্দ্রা চোখে সে প্রদীপ্ত চন্দ্রালোকে
যেন লক্ষ মণি-দীপ জ্বালা,
সরমে সঙ্কোচে লুটে কম্পমান করপুটে
কণ্ঠে মোর কে পরালো মালা!
যত কিছু ধুলো বালি সেখানে যা ছিল কালি—
সোনা হয়ে উঠিল ফুটিয়া,
কী অপূর্ব রসায়নে! বসে তাই বাতায়নে
কাঁদি আজ আঁধারে লুটিয়া!

মাঝে-মাঝে পড়ে মনে একবার এ জীবনে
এসেছিল আনন্দ উৎসব,

বসন্ত পূর্ণিমা রাতি বিস্তৃত চন্দ্রমা-ভাতি
হাসি গান গল্প কলরব!
কানে প্রাণে বাজে বাঁশি, প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশি
পেতেছিল বাসর শয়ন,
সোনার স্বপন এঁকে চোখে মোর দিল সে কে?
তপ্ত ভালে বুলালো চন্দন?
থুয়ে মুখ বক্ষোপরে গুঞ্জরিয়া মৃদুস্বরে
কে ডাকিল—'প্রিয় প্রিয়তম!'
চেয়ে দেখি নিশি ভোর, ঘুচে গেছে স্বপ্ন ঘোর—
—মুছে গেছে কুহেলিকা-সম!
নেই আলো নেই বাঁশি নেই গান নেই হাসি,
স্বর্ণবীণা গিয়াছে টুটিয়া,
একাকী এ গৃহ কোণে কাঁদিতেছি মনে-মনে
ধূলি-শয্যা আঁধারে লুটিয়া!

(বঙ্গবাণী)

বসন্তে ও বরিষায়

সে দিন বসন্ত প্রাতে হৃদয়ের বাতায়ন খুলি,
সুদূর দিগন্ত পানে কালো-কালো আঁখি দুটি তুলি
বসেছিল কৃষক বালিকা শ্যামল পল্লীর মাঠে ;
স্বর্ণরবি রশ্মি রেখা সুনির্মল সুন্দর ললাটে
পড়েছিল—স্বপ্নোজ্জ্বল যৌবনের উন্মেষের মতো!
সুরের আঘাত হানি ধরিত্রীর ভাঙি মৌনব্রত
কোকিল পাপিয়া পাখি কুহরিল চম্পকের শাখে
পল্লবের অন্তরালে—অন্তরের গূঢ় বেদনাকে
সুর ভাষা ছন্দ দিয়া ; অবসন্ন বসন্ত সমীর
যেন তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ব্যথাভরা ঝরা চামেলির
উড়াইয়া পুষ্প রেণু কুড়াইয়া কুসুমের রাশি
কিশোরীরে কানে-কানে কয়ে গেল এসে "ভালোবাসি,
বড় ভালোবাসি সখি!"—সেই সুরে উঠিল নাচিয়া
রক্তের প্রত্যেক কণা—মনে হলো প্রণয় যাচিয়া
ফিরিতেছে তারি লাগি বুঝি কোন্ দেশ-দেশান্তরে
উদ্ভ্রান্ত প্রেমিক এক-লক্ষ যুগ লক্ষ-বর্ষ ধরে!

হিল্লোলে-হিল্লোলে বায়ুভরে উড়ে এল তারি কথা?
তারি প্রেম-নিবেদন অব্যক্ত মধুর?—তনুলতা
শিহরিল পুলক কম্পনে—সে কী হর্ষ বেদনায়!

আর এক ঘন নীল আষাঢ়ের আসন্ন সন্ধ্যায়
স্বচ্ছনীড় শীর্ণরেখা জনহীন তটিনীর তীরে
(শ্যামাঙ্গিনী ধরনীর সুকোমল বক্ষ খানি চিরে
উদ্বেলিত অমৃতের ধারা) বসেছিল কৃষক রমনী,
বালিকা নহে সে আর—এখন সে হয়েছে জননী
পিতৃহীন দুরন্ত শিশুর—তাই তারে বারে-বারে
ধরে আনে, বলে—খোকা পড়ে যাবি যাসনে ওধারে!
অবোধ শোনেনা মানা চারিদিকে করে ছুটাছুটি,
জল ভারে অবনত গগনের তলে পড়ে লুটি।
তড়িৎ হানিল মেঘে জ্যোতির্ময় হিজিবিজি রেখা
চিকিমিকি ঝিকিমিকি, মা শুধালো—কি লিখেছে লেখা
আকাশের স্বর্গশিশু বল দেখি ওরে মোর খোকা
মেঘের শেলেটে কালো? ওরে ওরে তুই ভারী বোকা!
লিখেছে যে—দুষ্ট খোকা মোর শোনেনা মায়ের কথা
খালি তারে করে জ্বালাতন—প্রাণে তার দেয় ব্যথা!
এল জল যাই ঘরে চল্ ভরে নে' কলস জলে ;
চেয়ে দ্যাখ রাজহাঁস কী রকম চলে দলে-দলে
স্রোতে ভেসে ; বড় হলে তোরে আমি এনে দেবো কিনে
একটা ময়ুর ছোট, নাচবে সে বরিষার দিনে
মেঘ দেখে তোরি মতো! জননীর প্রলাপ ছাপিয়া
কাল-বোশেখীর নৃত্য অকস্মাৎ তাথিয়া-তাথিয়া
হলো শুরু অসময়ে—দুরু-দুরু কাঁপিল হৃদয়!
একি গো তান্ডব লীলা—বাতাসের একি অভিনয়!
মনে হল—দূরে, অতি দূরে—আকাশের পরপারে
অশান্ত হৃদয় এক দীর্ঘশ্বাসে দারুণ চীৎকারে
জানায় অন্তরব্যথা, ভালোবাসা তার সর্বগ্রাসী
হা-হা করে কয়ে ওঠে—"ভালোবাসি আজো ভালোবাসি"
তৃপ্তিহীন প্রেতাত্মার মতো!
আষাঢ় সন্ধ্যার সাথে
বসন্ত প্রভাত আজ বিরহের একই বেদনাতে
মিলে গেল! অশ্রুময় স্মৃতির সোনার তারে তাই
ঝঙ্কারিয়া বেজে ওঠে—সে যে নাই, ওরে সে যে নাই।

(বঙ্গবাণী)

ফুলের ঘা

দিয়েছে সে আড়ি করে—কথা কবে না,
ফেলে দে মালতী চাঁপা চামেলি হেনা,
একি সই হল বল্?
ফুলে নেই পরিমল,
চোখে খালি আসে জল,
চোখে রবে না,
দিয়েছে সে আড়ি করে—কথা কবে না।

খোঁপা খুলে দে লো চুলে কাজ কি সাজে?
পায়ে রাঙা-আলতা কি আজকে সাজে?
কাঞ্চন আভরণে
কাজ কোন আবরণে?
ব্যথা দিল অকারণে
স্মরণে বাজে!
খোঁপা খুলে দে লো চুলে কাজ কি সাজে?

নিষ্ঠুর পায় সুখ বেদনা দিয়ে,
করে খেলা একি ক্রূর আমারে নিয়ে,
মিছে ছলে বিনা দোষে
ঘা মারে আমারে ও সে,
কাঁদি অভিমানে রোষে
বিজনে গিয়ে,
নিষ্ঠুর পায় সুখ বেদনা দিয়ে!

প্রতিশোধ দেবো ভাবি মনে-মনে লো!
আর কথা কহিব না তার সনে লো!
প্রিয়তম প্রাণাধার,
সে সখি গলায় হার,
ভুলে যাই ব্যথা তার
দরশনে লো।
প্রতিশোধ দেবো ভাবি মনে-মনে লো!

খুঁটি-নাটি নিয়ে করে খিটিমিটি রে!
কেন চলি খালি পায়ে ভিজে শিশিরে?
কেন তারে প্রতি ডাকে
যখন বিদেশে থাকে,

লিখিনাকো চিঠি তাকে
চার পিঠই রে?
খুঁটিনাটি নিয়ে করে খিঠিমিটি রে!

বাঁধি কেন এলো খোঁপা? টিপ পরি না?
কেন তার বকুনিকে মোটে ডরি না?
কেন উঠি অত ভোরে
সকালে অমন কোরে?
বল্ সখি বল্ মোরে
কেন মরি না?
বাঁধি কেন এলো খোঁপা? টিপ পরি না?

অ-বুঝের শিরোমণি—কিছু না বোঝে!
কেবলি আমার সাথে কলহ খোঁজে!
দয়া-মায়া-স্নেহ-হীন,
সখি সে লো কী কঠিন!
একই ভাবে চিরদিন
কাটালো ও যে!
অ-বুঝের শিরোমণি—কিছু না বোঝে!

জাদু জানে সে কুহকী যাদু জানে লো!
ঘা মেরে আমারে ফিরে বুকে টানে লো!
পাছে মোর ঘাম ঝরে
সারা রাত পাখা করে,
বারণ করিলে পরে
নাহি মানে লো!
জাদু জানে সে কুহকী জাদু জানে লো!

তাই আমি ভাব করি তারে সাধিয়া,
চরণ ধরিয়া তার কত কাঁদিয়া!
এবার নীরবে রব,
কথা কোনো নাহি কব,
দিলে ব্যথা, ব্যথা সব
বুক বাঁধিয়া!
করিব না আর ভাব তারে সাধিয়া!

(উত্তরা)

অথরে-ক্রিটিকে

লাগে ঝমাঝম্ ভীষণদ্বন্দ্ব,
অথরে-ক্রিটিকে আলাপ বন্ধ,
এ উহারে কয় পাঁজি ও মন্দ
তীক্ষ্ণ শানিত বাক্যে ;
কহিছে ক্রিটিক বৃহৎ-বৃহৎ—
বঙ্গীয় নব সাহিত্য-রথ
ছুটিয়া চলিছে ধরিয়া বিপথ,
হাঁকাও বাঁয়ামে রাখ্‌কে!
এ ত গেল অতি ভদ্র-বচন,
কেহ আরক্ত করিয়া লোচন
উদ্ধৃত করি ডজন-ডজন
মুদ্রিত নানা উক্তি ;
গালি-বিষাক্ত শর হানি কয়—
এ লেখা আদৌ সাহিত্য নয়,
প্রতিভার এতে নাই পরিচয়,
নাইকো আর্ট কি যুক্তি!
নেত্রে লাগায়ে অনুবীক্ষণ
কেহ বা নাসিকা করে কুঞ্চন,
বলে-ফিনাইল কব সিঞ্চন
আধুনিক যত গ্রন্থে ;
কারণ উহারে ঘিরে চারিদিক
কুরুচি-ব্যাসিলি করে থিক্-থিক্,
ও-সব কেতাব কখনো অধিক
কেনে না বুদ্ধিমন্তে।
নোংরা নগ্ন অতি অকথ্য
ডাহা অশ্লীল যৌন তত্ত্ব,
ছেলেরা মেয়েরা যারা সোমত্ত
তাদের তরল চিত্তে
তুলিবে তুফান ঝড় বিপ্লব,
কথায়-কথায় চাহিবে ফ্রি-লভ্,
সমাজের আদি-বন্ধন সব
ভেঙে যাবে, এ কি মিথ্যে।
গর্জিয়া রোষে লেখক-প্রবর
বলে—হা মূর্খ রাখ কী খবর?

পশ্চিমে এর জবর-জবর
মিলবে নজির খুঁজলে,
সেথা সহস্র মুদ্রা-যন্ত্র
প্রসব করিছে বস্তুতন্ত্র,
শ্লীলতার ঐ প্রাচীন মন্ত্র
বাতিল অধুনা, বুঝলে?
লালসাই আদি—সৃষ্টির মূল,
খাঁটি বিজ্ঞান—নাহি ইথে ভুল,
মানব মনের যত ফল-ফুল
আশ্রয় করে ঐটে
গজিয়ে উঠেছে রকমে-রকমে
বিবর্তনের ক্রমিক নিয়মে,
প্রেমের স্বর্গে উঠতে, প্রথমে
ঐটি সোপান পৈঠে।
তাইত আমরা করি লুণ্ঠন
রমণী-মুখের অবগুণ্ঠন,
এঁকে দিই গালে লাল-চুম্বন,
নিপীড়ন করি বক্ষে ;
কে জানে সুবাদে বাধে কি না বাধে?
বিচলিত নই গ্লানি-পরিবাদে,
ক্ষেত্র-বিচার প্রেমের আবাদে
করিনে পারত্ পক্ষে।
আমরা নোংরা পল্লীতে ঘুরি,
বস্তিতে যেথা চলে ছোরা ছুরি,
তাদের জীবন-মৃত্যু-মাধুরী
করিয়া তন্ন-তন্ন,
গড়ি সাহিত্য সবুজ তরুণ,
লেখনী মোদের প্রখর নরুণ,—
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু ও বরুণ
আমরা, আমরা ধন্য!
চলিল এরূপে বাক্-বিতণ্ডা,
উভয় পক্ষে ষণ্ডা-ষণ্ডা
শূর বীর আসি গণ্ডা-গণ্ডা
শত্রু করিল জব্দ ;
সখীরে ডাকিয়া বীনাপাণি কন—
এ কী জঞ্জাল—একী জ্বালাতন!

কোথা থেকে উড়ে আসে অনুখন
মাছি-ভন্-ভন্ শব্দ!
সখী কয়—সখি, সেদিন খিচুড়ি
খেয়ে এঁটো পাত দিনু মোরা ছুড়ি ;
সেইগুলো সব ঝড়ে গিয়ে উড়ি
পড়িল নিম্ন বঙ্গে ;
তদবধি তাই ঘিরি অনুখন
মাছি-মশাগুলো করে ভন্-ভন্,
অলি-গুঞ্জন কোকিল-কূজন
থেমে গেছে সেই সঙ্গে!

(হসন্তিকা)

বুড়ো

আমরা বুড়ো আমরা বাতিল
তরুণ তোরা যুবার দল,
তোদের আশা তোদের ভাষা
আমরা কিসে বুঝবো বল?
মাতাল তোরা বাতাস খেয়ে
আফিং খেয়ে আমরা ঝিম্,
তপ্ত তোদের শিরার শোণিত
রক্ত মোদের ঠাণ্ডা জল!

আমরা পথে খুঁড়িয়ে হাঁটি—
লাঠির পরে ভর করে',
উল্কা-বেগে ছুটিস তোরা
কাঁপিয়ে মাটি পার জোরে,
উড়িয়ে ধুলো ছড়িয়ে বালি
লাগিয়ে ধাঁ-ধাঁ যাস তোরা
পথ ছেড়ে দে আমরা ভয়ে
একটি পাশে যাই সরে!

অতীত কালের সাক্ষী মোরা
শীর্ণতনু ক্ষীণ দেহ,
বর্তমানের ভবিষ্যতের
আমরা কেহই নয় কেহ,

বর্তমানের মালিক তোরা—
ভবিষ্যতের তোরাই সব,
জমার খাতায় আমরা খরচ—
মৃত্যু মোদের সেই শ্রেয়!

আমরা বুড়ো আমরা প্রাচীন
নবীন তোরা যুবার দল,
তোদের যত রকম-সকম
আমরা কি তা বুঝবো বল?
আমরা আর এক যুগের মানুষ—
তোরা নতুন যুগের লোক,
তোদের চোখে খেলছে হাসি
মোদের চোখে ভাসছে জল!

তোদের মনের ফুল-বাগানে
হচ্ছে নিতি ফুলের চায,
মোদের মরা মনের ক্ষেতে
কাঁটার বন আর শুকনো ঘাস,
তোদের প্রাণে বইছে মলয়
মোদের প্রাণে ছুটছে লু,
জগৎ-জোড়া সন্দেহ আর
বিশ্বগ্রাসী অবিশ্বাস!

চোখের ঠারে বলিস তোরা
ইশারায় আর ইঙ্গিতে,
চলিস ফিরিস হাসিস তোরা
অশেষ রকম ভঙ্গিতে,
তোদের ও-সব ধরণ-ধারণ
কায়দা-করণ আমরা ক'ই
বুঝতে পারি? তাই নিরালায়
বসে থাকি কোন্‌টিতে!

প্রেমের চিঠি লিখিস তোরা
রচিস কত প্রেমের গান,
প্রাণের বিনিময়ে তোরা
দেওয়া-নেওয়া করিস প্রাণ,—
গাঁথিস তোরা ফুলের মালা—
পরাস প্রিয়ার কণ্ঠেতে,
করিস কত প্রিয়ার লাগি
আয়োজন ও অনুষ্ঠান!

এ সব জিনিস আমরা কি ছাই
বুঝতে পারি বুড়োর দল?
তোদের যত রঙ্গ-ভঙ্গ
মান-অভিমান ঝগড়া-ছল!
হা মোর জীর্ণ মগজ বাসী
ছিন্ন-পক্ষ কল্পনা!
দূর অতীতে মারবি পাড়ি—
নেই পাখায় সে শক্তিবল!

ওরে অতীত সুদূর অতীত
তোর অতলের গহ্বরে,
এই জীবনের আধ-শতাব্দী
তলিয়ে গেল টপ্ করে!
হাত্‌ড়ে বেড়াই চতুর্দিকে—
মিলবে কি আর চিহ্ন তার?
বেনারসী কার ওখানা?
আমি-ই না সেই ঐ পরে—

তিরিশ বছর আগের কথা!—
থাক্ থাক্ থাক্ আর কেন?
আমি বুড়ো এমনি বুড়ো
চিরকালই—তাই জেনো!
ফুলের মালা চাঁদের আলো
এদের মর্ম বুঝবো কী?
আমার তার নামাবলি
আর তসরের জোড় এনো!

(বঙ্গবাণী)

জীবন-তরী

জীবন-তরী
চলছে মরি
অন্ধকারে,
বোঝাই ভারে।
ঠিক ঠিকানা
নাইকো জানা

ভিড়বো শেষে
কোন্ সে দেশে!
গগনতলে
আর না জ্বলে
সোনার লেখা
আলোর রেখা ;
বিশ্বগ্রাসী
মেঘের রাশি
আকাশ ছেয়ে
আসছে ধেয়ে!
ঝঞ্ঝাবায়ে
তুফান ঘায়ে
হলেম সারা
কূল কিনারা
পাইনে খুঁজে,
চক্ষু বুজে
যাচ্ছি ভেসে
কোন্ সে দেশে!

ভাবছি মনে
কী কুক্ষণে
যাত্রা শুরু ;
দুরু-দুরু
কাঁপছে হৃদয়,
ভাগ নিদয়!
আঁধার রাতি,
সঙ্গী-সাথী
নাইকো কেহ
করবে স্নেহ!
ঘূর্ণিপাকে
দুর্বিপাকে
হাঁপাই পড়ে ;
শূন্যে ওড়ে
বজ্র নিশান,
বাজে বিষাণ!
তুমুল রোলে
চিত্ত দোলে!

কুজ্ঝটিকা
প্রলয় টীকা
গগন ভালে
ঐ পরালে!

অতীত মম
চিত্রসম
চোখের আগে
আজকে জাগে!
কাদের ছেলে
পুতুল খেলে?
কে ঐ দোলে
মায়ের কোলে?
রৌদ্রে ছাতে
লাটাই হাতে
উড়িয়ে ঘুড়ি
কে দেয় তুড়ি?
বন্ধুগণে
সঙ্গোপনে
কে কয় কথা?
জানায় ব্যথা!
স্মরণ-পথে
স্বর্ণ-রথে
কে ঐ আসে
মধুর হাসে?
বধূর মতো
লজ্জানত
কণ্ঠে তারে
ফুলের হারে
কুসুম জালে
কে সাজালে!
সুখের রবি
আলোর ছবি
অস্তগত,
ভাগ্যহত!
কই সে হাসি?
কই সে বাঁশি?

কই সে গীতি?
কই সে প্রীতি?
কই সে আশা?
কেবল ভাসা
আঁধার স্রোতে!
এখন হতে
মৃত্যু মুখে
তুফান বুকে
ছুটছি খালি ;
আকাশ কালি
বজ্রভরা,—
কাঁপছে ধরা
উঠছে তেড়ে ;
দিলেম ছেড়ে
তোমার হাতে
আজকে রাতে
হে কাণ্ডারী
বোঝায় ভারি
মোর তরণী ;
প্রভাত হবে
উজল নভে
আর কি কভু
ওগো প্রভু?

(বঙ্গবাণী)

অক্ষম

জননী-ভারতী চরণে তোমার
কি দিব আনিয়া পূজা-উপহার
মরি যে লাজে!
মনের বনের অতীত তুচ্ছ—
গন্ধ-বিহীন পুষ্প-গুচ্ছ
দেওয়া কি সাজে?

মানস-সরের শ্বেত-শতদলে
সাজালো তোমার চরণ-কমলে
ভক্ত শত!
মূর্খ আমার সে প্রতিভা কই?
সংকোচে মাথা নত করে রই
গর্ব-হৃত!

কণ্ঠের সুর লেখনীর ধার,
ছন্দের লীলা কলা-বিস্তার,
কিছুই নাহি!
না আছে ভাবের ভাষার গরিমা,
কি করে তোমার আরতি করি মা,
কি গান গাহি!

অক্ষমহীন না আছে আমার
ইন্দ্রধনুর রঙের বাহার
কল্পনাতে!
তোমার ভক্ত মনীষী-বর্গ
যা দিয়ে রচিল তোমার অর্ঘ্য
নিপুন হাতে।

আমি শুধু তাই তব মুখ পানে
ব্যাকুল নেত্রে কাতর নয়ানে
চাহিয়া থাকি!
যদি তুমি কভু দৈবাৎ ভুলে
এতটুকু ঠাঁই দাও পদমুলে
ফিরাও আঁখি।

নাহি রাখি দাবি কবি-সম্মানে,
বিফলতা মোর বুকে শেল হানে
তীক্ষ্ণতম!
শঙ্কিত-চিত কম্পিত করে
ব্যর্থ-প্রয়াস দিনু পায়ে ধরে
জননী মম।

(উত্তরা)

স্মৃতি-পূজা

প্রতিভার পিরামিড—মনীষার প্রদীপ্ত ভাস্কর,
অদ্বিতীয় কর্মবীর—সৌম্য-মূর্তি বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ!
স্বদেশ-জননী বক্ষে সমুজ্জ্বল কৌস্তুভ-রতন
ছিল তুমি, করেছিলে ভারতের ভুবন ভাস্বর!

জ্ঞানের প্রদীপ হাতে ঘরে-ঘরে জ্বেলে দিলে আলো,
ভারত ও ভারতীর আদরের প্রিয় পুত্র তুমি,
বীণাপানি পুত্রহীনা, পুত্রহীনা হল মাতৃভূমি
তোমার মরণে আজ, চারিদিক অন্ধকার কালো!

নির্ভীক স্বাধীন-চিত্ত লেশগর্ব অহংকারহীন,
মহাপ্রাণ সদালাপী নিষ্ঠাবান আশ্রিতবৎসল,
লক্ষ কর্মভারে তুমি উচ্চশীর থির অচঞ্চল
যেন গিরি হিমালয় তপোমগ্ন মহাযোগাসীন!

অসংখ্য শৃগাল মাঝে তুমি ছিলে বীরেন্দ্র কেশরী,
কর্ণপাত করোনিকো কোনদিন ফেরুপাল রবে,
ক্ষমতার উচ্চ শিরে প্রতিষ্ঠিত আপন গৌরবে
করেছ দেশের কাজ চিরদিন বিধাতারে স্মরি!

স্বদেশের রীতি-নীতি পরিচ্ছদ আচার-ব্যাভার
করোনি বর্জন তিল—মূর্তিমান তুমি জাতীয়তা,
আত্মার অমিত তেজে মূর্তিমান তুমি স্বাধীনতা,
লাট কি বেলাট কারে কোনদিন করোনি কেয়ার!

সমাজের ভ্রূকুটিরে দেখে তুমি পাওনিকো ডর,
সত্য যাহা ধ্রুব যাহা তাই তুমি চলিয়াছ মেনে,
খল ও নিন্দুক বক্ষে তাচ্ছিল্যের কশাঘাত হেনে
কবে মরে গেছে তারা—তুমি শুধু মরেও অমর!

বাঙালীর একছত্র রাজা তুমি, আদরের ধন,
'তোমারি তুলনা তুমি একমাত্র এ মহীমণ্ডলে,'
তোমার স্মৃতির পূজা করিতেছি নয়নের জলে,
অন্তরের অনুরাগে করিতেছি তোমার তর্পণ!

পড়েছে হঠাৎ ডাক, যাও দেব যাও স্বর্গধামে,
কর্মক্লান্ত জীবনের পেন্‌শান্‌ ভোগ কর সেথা,
তোমার অতুল কীর্তি চিরদিন রয়ে যাবে হেথা,
ঘুচাইলে অপবাদ তুমি একা বাঙালির নামে!

(বঙ্গবাণী)

গান

নয়ন-পাতে সজল মেঘের
কাজল বুলানো।
এস ভুবন-ভুলানো!
ঝম্‌-ঝম্‌-ঝম্‌ প্রাণের তারে,
আঘাত কর বাদল ধারে,
বাজাও নূপুর ঝুমুর-ঝুমুর
নয়ন-চুলানো।
এস ভুবন-ভুলানো।

ঝিম্‌-ঝিম্‌-ঝিম্‌ ঝম্‌-ঝম্‌-ঝম্‌
নাচে কেয়া, নাচে কদম,
নাচে ময়ুর, নাচো তুমি,
হৃদয়-দুলানো!
এসো ভুবন-ভুলানো!

এসো ঘন নীল বাসে,
পা ফেলে ঐ ভিজে ঘাসে,
তড়িৎ তোমার সোনার জরীর
আঁচল ঝুলানো।
এসো ভুবন-ভুলানো!

(উত্তরা)

উড়ো জাহাজ

[প্রথম দৃশ্য— পড়বার ঘর]

(মধু, যদু আর ভোলা)

মধু। গোঁ-গোঁ-গোঁ বিষম আওয়াজ,
আসছেরে ঐ উড়ো-জাহাজ!
চল্-চল্-চল্ বেরিয়ে দেখি ছাতে
ওরে যোদো, ওরে ভুলো,
কান তো তোদের কুলো-কুলো,
তুলো দিয়ে রইলি নাকি তাতে?

যদু। তাইতো রে! তাইতো রে!
আসছে যে শব্দ রে!
আঁক কসা থাক্ তবে আজ!

ভোলা। বই কর্ বন্ধ
আসে নিঃসন্দ
বন্ বন্ শন্-শন্ উড়োন্-জাহাজ!

[দ্বিতীয় দৃশ্য— ছাত]

(মধু, যদু আব ভোলা)

মধু। দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্ চেয়ে এইদিকে আসে ধেয়ে
ঠিক যেন বাজ-পাখি চিল!

যদু। ঐ যা ঘুরে ঘুরে-ঘুরে সরে চলে গেল দূরে
তা না হলে লাগাতুম ঢিল!

ভোলা। বড় বড় দুই ডানা বাতাসেতে দেয় হানা
বল দেখি গায়ে লেখা কি?

যদু। লিপ্ লিপ্ লিপ্ লিপ্ টন্ টন্ টিপ্ টি
লিপটন টি!

মধু। আমি যদি চডতে পেতুম,
চাঁদের কাছে উড়ে যেতুম,
ধরে আনতুম চকোর পাখির ছানা!
খুকির মুখের চুমা খেতো,
চাঁদেব সুধা লাগতো তেতো,
গান শেখাতুম রকমারি নানা!

যদু। পাগল না কি? পাগল না কি?
চকোর পাখি
যায় ধরা কি?

মধু। চাঁদের সঙ্গে লুকোচুরি
মেঘের আড়াল থেকে,
খেলতে কেমন মজা রে ভাই
উড়তে এঁকে-বেঁকে!

ভোলা। যদি ওটা দৈবাৎ
হয় কুপোকাৎ
ঝপ্ করে পড়ে এসে
আমাদের ছাত?

যদু। যদি তোরে ছোঁ মেরে
তুলে নিয়ে যায়,
ফেলে দেয় একেবারে
পাহাড়ের গায়?

ভোলা। আমি কি খাবার-ঠোঙা? ওটা নাকি চিল?
যেই এসে নামা, আর অমনি না ঢিল।

যদু। একে রামে রক্ষে নেই
সুগ্রীব তার মিতে।
ওরে, ঐতে নাকি ধরেছিল
রাবণ রামের সীতে!

ভোলা। থাকতো রে যদি ভাই
উড়ো-সাইকেল
পাড়তুম গাছ থেকে
বেছে-বেছে ভালো দেখে,
পথে এলে কাক-চিল,
বাজাতুম 'বেল্'।

মধু। থাক্‌তো রে যদি ভাই,
উড়ো পানসি—
নীল রং পালতুলে, আকাশেতে ঢেউ তুলে—

যদু। মুখখানি রোদ লেগে হতো আম্‌সি!

মধু। যেতুম আমি জ্যোৎস্না রাতে
খুকী-বোনটি থাকতো সাথে,
মা ডাকতো—আয়না খোকা নেমে!
আমি তখন একটুখানি থেমে
বলতুম মাকে—মা, তুমি কী বোকা!
মা বলতো—মেঘের ভিতর ডুবে যাবি যে খোকা!

ভোলা। চক্‌মক্ বিদ্যুৎ
কড়্ কড়্ বাজ
ঝম ঝম বিষ্টি
উড়িয়ে জাহাজ

চলি যদি শন্‌-শন্‌
শিলে সাদা কন্‌-কন্‌
মজা হয় কি রকম
আকাশের মাঝ?

মধু। আমি যাবো বিয়ে করতে
উড়োন্‌-জাহাজে,
পেরিয়ে আকাশ চাঁদের দেশে
জ্যোৎস্না-সাগর মাঝে!

যদু। বরযাত্রী যাবো মোরা
রামধনুকের সাজে।

ভোলা। বউ যদি ভাই কাঁদে
উড়ো-কলের ফাঁদে
আকাশ দেখে কাঁপন আসে তার?

মধু। দু-চারটে তারা তুলে
বেঁধে দেবো কালো চুলে
গোটা কতক তুলে তাকে
গেঁথে দেবো হার!
রাঙা-হাসি লাল ঠোঁটে
দেখবি কেমন ফোটে!
চোখে জল এক ফোঁটা
রবেনাকো আর!

যদু। দ্যাখ্‌-দ্যাখ্‌-দ্যাখ্‌ চ্যাপ্টা নাকে
চশমা চোখে দিয়ে,
আসছে কে ও ছাতা মাথায়
বেতের লাঠি নিয়ে!

ভোলা! মাষ্টার মশাই! মাষ্টার মশাই!

যদু। চল্‌-চল্‌-চল্‌ পালাই সবাই।

[তৃতীয় দৃশ্য— পড়বার ঘর]
(মধু, যদু, ভোলা—বই হাতে)

মধু। হর্স মানে ঘোড়া, গ্রাস্‌ মানে ঘাস্‌

যদু। ইয়ার মানে বৎসর, মান্থ মানে মাস!
(মাষ্টার মশাই-এর প্রবেশ)

সকলে। রেন মানে বিষ্টি, বেম্বু মানে বাঁশ!
(যবনিকা পতন)

(মৌচাক)

বনের পাখি

কানের কাছে বনের পাখি ডাক দিয়ে যায় ঐ গো,
বল্‌না ও-মা কেমন করে ঘরে আটক রই গো!
জলে-ভরা কানায়-কানায়
আকাশ বুকের ব্যথা জানায়,
বাতাস ডেকে বলে আমায়—দুষ্টু ছেলে কই গো?

বন্দী-জীবন আজকে যেন চাইছে ছাড়া মুক্তি,
শুনচে নাকো কোনো বারণ বাঁধন-বাধা যুক্তি!
নেই-ঠিকানা-দেশের আলো
স্বপ্নে আমার মন ভুলালো,
কেড়ে নিল আমার চোখের শান্তি সুখের সুপ্তি।

বেলাবেলি বেরিয়ে পড়ি, মা কেন তুই আয় না,
যাব যেথা দু-চোখ যাবে—আরব, ব্রাজিল, চায়না।
দেশ-বিদেশের মনোহরণ
দেখবো গিরি বন উপবন,
তরুলতা শ্যামল শোভন—জিরাফ্ হরিণ হায়না।

মরু-দেশের হাওয়া যেথায় হান্‌চে আগুন-হল্কা,
বলবি—খোকা ওরে আমার তরমুজের এই জল খা!
বলবো আমি—বলিস কী মা,
সহিষ্ণুতার নেইকো সীমা,
উট-পাখিদের দুধ এনে দে গরম-গরম বল্‌কা।

কন্‌কনে সেই বরফদেশে বরফ নিয়ে খেলবো,
আপদ-বালাই শাল-আলোয়ান দূর করে সব ফেলবো।
ছ-মাস দিন ও রাতের দেশে
শীত যেখানে সর্বনেশে
বরফ-ক্ষেতে করবো স্কেটিং, স্লেজের গাড়ি ঠেলবো।

হিমালয়ের চড়বো চূড়ায়, নীল-নদীতে নাইবো,
ক্যাস্পিয়ান ঐ হ্রদের বুকে নৌকো আমার বাইবো!
আমেরিকার গহন বনে
ফিরবো শিকার অন্বেষনে,
গোলাপ-ক্ষেতে যেতে-যেতে ফার্‌সী গজল গাইবো!

নানান্ দেশের শিখবো ভাষা নানান্ লোকের সঙ্গে,
টুক্‌টুকে বউ করবো বিয়ে কেউ দেখেনি বঙ্গে।

নাম-না-জানা ফুলের হারে
সাজিয়ে ও-মা দিস্ গো তারে,
কাজ কি সোনার অলঙ্কারে—সোনা যে তার অঙ্গে!

উঠছে মনে অনেক কথা—মুখে কটা কই গো,
মোট কথা এই দে মা ফেলে সেলেট খাতা বই গো।
অঙ্ক কথায় কী রস আছে?
রস আছে ঐ খেজুর গাছে,
কানে-কানে বনের পাখি কয়ে গেল ঐ গো!

(মৌচাক)

নামে গরমিল

আনন্দ ঘোষের প্রথম পুত্র—শ্রীবিলাস তার নাম,
বাড়ি ছিল সেই সখের বাজারে,—মজালিস পুর গ্রাম।
বিলাসের ভাই রসিকচন্দ্র, বোনের নামটি হাসি,
হাসির মতই মধুর উজল—মা-টি আমোদিনী দাসী।
সুখময় বলে ছিল সে বন্ধু বিলাসের প্রিয় ভারী,
ইস্কুল ছেড়ে দুজনে মিলিয়া হইল আড্ডাধারী।
সকালে দুপুরে আখড়ার ঘরে তবলায় দিয়ে চাঁটি
বিলাসের মতো মজবুত আর ছিলনাকো সারা গাঁটি।
ব্যাপার বুঝিয়া বিলাসের মাতা বিলাসের দিয়ে বিয়ে
রসময়ী নামে ঘটকিনী এক ডাকে তার ঝিকে দিয়ে।

হেলে-দুলে চলে ঘটাকিনী আসি বিলাসের মায়ে কয়,
শোনো ওগো মাসি গিয়েছিনু কাশী, বিশ্বনাথের জয়।
বিলেস দাদার বিয়ে দেবে তুমি শুনিনু ঝিয়ের মুখে,
পরমা রূপসী কনে হাতে আছে—যে দেখে সে পড়ে ঝুঁকে।
শুধু তাই নয়, পাঁচটি হাজার দেবে কর্-করে গুণে।
ছুটলো গিন্নি কর্তার ঘরে এই সব কথা শুনে ;
সন্ধ্যাবেলায় আফিমের ঝোঁকে কর্তা তখন ঝিম,
দরজা জানালা সমস্ত খোলা হু-হু করে আসে হিম—
এ-কথা ও-কথা পাড়িয়া গিন্নি পাড়িল আসল কথা,
খেটে-খেটে বাত ধরেছে কোমরে,পাঁজরে বিষম ব্যথা।

শরীরও হয়েছে এমনি অপটু, কবে আছি কবে নেই—
বিলাসের বিয়ে দিলে এই বেলা শিখে নেবে সব সেই।
শুনিয়া কর্তা বলিল, গিন্নি-ভাবনার কথা বটে,
তুমি যাবে মরে আমি রবো বেঁচে এ কথা আসেনি ঘটে।
এক সের দুধ মেরে এক পোয়া পাথরের বাটি করে
তোমার মতন কে দেবে তখন মুখের সামনে ধরে?
সে যা হোক তুমি ধরেছ যখন বিলাসের বিয়ে দিতে,
আমার অমতে কিবা যায় আসে! তবে কিনা এই শীতে!

গড়ের বাদ্যি রসুন-চৌকি চর্তুদোলায় করে
টুকটুকে বউ আনিল বিলাস মহা-সমারোহে ঘরে।
বউ দেখে খুশি হলো সকলেই—বিলাসের বুকখানা
দৈর্ঘ্যে প্রস্থে হলো সাত হাত, বেড়ে গেল বাবুয়ানা।
লপেটা সেলিম পাম্প-সু জরির চড়িল তাহার পায়ে,
সিল্ক-পাঞ্জাবি আদ্দির সার্ট উড়িল তাহার গায়ে।
দু-দিন না যেতে দেখা গেল শেষে বনি ও বনা ও মিল
বরেতে কনেতে হয়না কিছুতে একরতি একতিল—
রাতদিন শুধু খিটির-মিটির ঝগড়া ও ঝাঁটি আর
উভয়ে দেখেনা উভয়ের মুখ, ঘরে তেষ্ঠানো ভার।

ছেলের বউ-এর কান্ডটা দেখে কর্তা তো ভেবে খুন—
গিন্নি ভাবেন, বুঝিকে শত্রু করেছে তুক্ কি গুণ!
কাশীর জ্যোতিষী ঠিকুজী কোষ্ঠী গণিয়া বলিল, মিল
পোড়া অদৃষ্টে পড়ে গেল ছাই, মিলিল না দুই দিল।
ভাবিয়া গিন্নি পুরোহিত ডেকে করালো চন্ডীপাঠ,
হরেক রকম পূজা-অর্চনা—জ্বলিল হোমের কাঠ।
তাঁবার সোনার কবচ নানান্ পরালো বউ-এর হাতে,
বিলাসের শালী পাঠালো মাদুলি স্বামী বস হয় যাতে।
কিছুতেই আর কিছুই হয়না ধুয়ে যায় যেন ভেসে,
সকলেই হাল-দাঁড় ছেড়ে দিল, টের পাওয়া গেল শেষে—
বিলাসের বুড়ো শ্বশুর যে ছিল নাম তার দুখিরাম,
শাশুড়ির নাম ছিল মহামায়া, বাড়ি পোড়াদহ গ্রাম ;
শ্যালকের নাম কাঙালীচরণ, বউটি অশ্রুকণা,
শালীদের নাম ছিল ছায়াময়ী, মলিনা ও উপাসনা।
সকলে তখন বলিয়া উঠিল, কি হবে মিলিলে কোষ্ঠী?
বিপরীত নাম দেখি বিলাসের শ্বশুরের গোনা-গোষ্ঠী!
শুনিয়া টোলের স্মৃতি-শিরোমণি কহিল, তাইতো, তাইতো—
আগাগোড়া নাম বদলাতে হবে—দক্ষিণে কিছু চাইতো।

(মৌচাক)

লোবো

একটা আছে ছেলে—নামটা তার লোবো,
জো নেইকো তাকে নিয়ে বোসবো কিংবা শোবো,
চুলটা দেবে ছিঁড়ে, কানটা দেবে টেনে,
পুরবে মুখে কাঁকর বালি যা পাবে তাই এনে,
আঁচড়ে কামড়ে মেরে
সর্ব অঙ্গ জ্বালিয়ে দেবে ; বকলে পরে এরে,
ঠোঁট ফুলিয়ে চাইবে মুখের পানে
দারুণ অভিমানে !

দুষ্টুমিটা লেখা—তার সে চোখে মুখে
গোলাপ কুঁড়ির মতো ঠোঁট দুটি টুক্‌টুকে,
পড়েছে এই সবে এগারো মাসে মোটে,
দাপটে আর বজ্জাতিতে সৃষ্টি কেঁপে ওঠে !
এমনি মিষ্টি হাসি—
দেখলে পরেই বলতে হবে—বড্ডো ভালোবাসি,
ঝল্‌কে ওঠে মুক্তো আবার তাতে
আড়াই-খানা দাঁতে।

নাকটা তার খাঁদা ? দেখ্‌লি সে কোন চোখে ?
শুনলে তোর ও কথা বল্‌বে পাগল লোকে,
নয়কো ঠিক বাঁশি—সেটা না হয় মানি,
ডাগর হলে দেবে যখন চশমাখানি টানি
ঐ সে নাকের পরে,
কার না তখন লোভ হবে যে তারে জামাই করে ?
এক্‌জিবিসন্‌ পাঠিয়ে দেবার ছেলে
কটা এমন মেলে ?

চাঁদকে হাত নেড়ে—ডাকে সে আয়্‌ বোলে,
চাঁদ ভাবে কোন চাঁদ ফুট্‌লো মাটির কোলে !
কখনো দ্যায় তাই—অবাক্‌ হয়ে দেখি,
যায় না বোঝা কখন তার খেয়াল হবে যে কি !
নাই মনে ভয় ডর,
আপন জনকে খুব চেনে সে—পরকে জানে পর,
মুখ-খানাতে নানান ভঙ্গি করে,
কী মাধুরী ঝরে !

নেওয়া তারে মানে কুস্তি রীতিমত,
ঝক্‌মারিটা তোমায় কইব সে আর কত?
বলবে—নিয়ে ঘোরো নয় ত কাঁধে কর,
উপর পানে ছুঁড়ে খানিক আবার লুফে ধর!
একটি দণ্ড থির
দিব্যি দেওয়া রইবে না সে কোলে চাকর ঝির!
বিকিয়ে দেবো একটা পয়সা পেলে
কে নিবি বল্ ছেলে?

বেড়াল দেখে সেটা দৌড়ে যাবে তেড়ে,
কাগজ কলম বই ছিনিয়ে নেবেই কেড়ে,
দেখলে পরে কাক, ছোট শালিক পাখি
চেঁচিয়ে তারে পাখির সুরে করবে ডাকাডাকি!
ঠাকুরদাদার সাথে
ইয়ারকি আর রঙ্গভঙ্গ খুব মজবুত তাতে!
ঘুম পেয়েছে—বুঁজবে না চোখ তবু,
দেখেছ কেউ কভু?

পরবে না সে টুপি ফেলবে খুলে মোজা,
সবই ব্যাটার বাঁকা একটা নয়কো সোজা!
ইচ্ছে করে তারে আচ্ছা করে মারি,
জাত মেরে দি খাইয়ে তারে ফাউল-চপ, কারি,
নয়তো হাওয়ার গাড়ি
চড়িয়ে উড়িয়ে দিই সেটাকে সূয্যি মামার বাড়ি!
করতে তারে চোখের আড়াল তিল
পারি না—মুস্কিল!

নরম কচি হাত দেখেছি তার গুণে—
বড় হলে হবে সেটা ডাকাত কিংবা খুনে;
কিন্তু আমি এর কাটান্ করতে পারি,
যদি মা তার রেঁধে খাওয়ায় লুচি ও তরকারি
শ্রীপঞ্চমীর দিনে
আনিয়ে কড়াই শুটি ও কপি বাজার থেকে কিনে!
হয় যদি সে আমার কথায় রাজি,
বলে ফেলুক আজি!

(যাদুঘর)

খুকু কুটু

খুকু কুটু দুটি ভাই বাস করে এক ঠাঁই—দু-জনাই মামার বাড়িতে,
ইস্‌কুলে ভিন্‌-গাঁয়ে যায় তারা হেঁটে পায়ে কখনো বা রেলের গাড়িতে,
বয়স এগারো-বারো কথা শোনেনাকো কারো, চাড় নাই একটু পড়তে,
বাড়ির সুমুখে মাঠে পা তুলে পিকক্‌ হাঁটে ক্লাসে ওঠে হড়াতে-গড়াতে,
মাতামহ মাতামহী দুধ ক্ষীর ছানা দহি খেতে দেন আদরে সাধিয়া,
দেন কিনে বোঝা-বোঝা ভাল জামা জুতো মোজা—করে হাট না পেলে কাঁদিয়া,
এইরূপে বাবুয়ানা শেখে তারা ষোল আনা—বনে যায় আদুরে গোপাল,
মাতামহী মাতামহে আকথা-কুকথা কহে—মাসীকেও পাড়ে গালাগাল।

ভায়ে-ভায়ে হাতাহাতি লেগে আছে দিন-রাতি সারাখন বসিতে-উঠিতে,
অথচ চোখের আড়ে এ-উহারে নাহি ছাড়ে এক সাথে খেলায় দুটিতে,
বেচারী বাবারে তারা ফরমাসে করে সারা—মুখে খালি এ চাই সে চাই,
যা চাই না দিলে পরে এমনি খোয়ার করে—বাবা ভাবে কোথায় পালাই!
যাত্রা কি থিয়েটার যদি হয় একবার কোনখানে তাদের পাড়াতে,
প্রবেশ না করা যায় লোক-ভিড় জনতায়—ঠাঁই নাই একটু দাঁড়াতে,
তবু তারা রাত জেগে শুনতে তা যাবে লেগে—একপাশে করে ঠিক ঠাঁই,
পর দিন ইস্‌কুলে পড়া বলা যায় ভুলে—বসে-বসে খালি তোলে হাই।

আহ্লাদে মেরে তুড়ি আকাশে ওড়ায় ঘুঁড়ি—ফুটবল নিয়ে কভু মাতে,
আছে ব্যাড্‌মিন্‌ট্‌ন তাতে কেউ কম নন্‌—কখনো বা লুডো পেড়ে পাতে,
হাউই তুবড়ি তারা—বাজি কত ছোঁড়ে তারা—ডর নেই একটু আগুনে,
পিতলের পিচ্‌কিরি নিয়ে পথে ঘুরি-ফিরি খেলে রং আবার ফাগুনে,
দুষ্টুমি পুরোপুরি আর চুরি জাম চুরি—জ্বালাতন হোলো প্রতিবাসী,
নাতিদের কারখানা বলে কোরে সাতখানা দিদিমাকে মালতীর মাসী,
ইস্‌কুলে লক্ষ্মীটি যেন ঘুঘু পক্ষীটি—বাহিরে প্রতাপ যত কিছু,
অঙ্কের ঘন্টায় জ্বর আসে মন্টায়—মুখখানি করে থাকে নিচু।

একবার কলেরায় বাবা মারা যায়-যায়—এলো তারা বাবার নিকটে,
দুটি চোখে অবিরল ঝর ঝর ঝরে জল—বুক কাঁপে বুঝি বা কি ঘটে,
এক মনে এক প্রাণে ডাকে তারা ভগবানে—হে ঠাকুর বাঁচাও, বাঁচাও,
ছেড়ে ফেলে বেশ ভূষা করে সেবা শুশ্রূষা—বলে বাবা বলো কিবা চাও ;
বালকের আহ্বান শুনিলেন ভগবান—ক্রমে বাবা উঠিল সারিয়া,
ছেলেদের কোলে কোরে প্রাণ দিলি বলে ওরে—চুমু খায় আদর করিয়া,
তাই দেখে ছেলে দুটি ক্রোড়পরে পড়ে লুটি—বলে ব্যথা দিবনাকো আর,
এবে মোর ভালো হবো ভাল কথা সবে কব ফার্স্ট হবো পড়াতে এবার।

(যাদুঘর)

কাকামণির বিয়ে

কাকামণি, কদিন আমার পড়াতে মন বসচে না আর
খালি সেটা করচে—কাকি কাকি,
কল্পনাতে একশো বারি আঁকচি ছবি আঁকচি তারি
গুনচি তার আর আসতে কদিন বাকি!

অঙ্ক দিলে মাষ্টার মশাই সাধ করে কি ভুল করি তাই?
আপনি যে গো যায় হয়ে সে ভুল,
আমার দুটি চোখের আগে কাকিমায়ের মুখটি জাগে
একগা গায়ে গয়না কানে দুল!

কাকামণি, ক্ষণে-ক্ষণে আমার যেন হচ্চে মনে
আনচো মানিক ঘরে সাগর সেঁচে,
তোমারো কি আমার মতো ফুর্তি প্রাণে হচ্চে অত
বুক-খানি কি উঠছে নেচে-নেচে?

কাকিমাগো এসো এসো আমায় তুমি ভালোবেসো,
আমি তোমায় বাসবো খুবি ভালো,
দেরি আমার সইচে না আর গুনচি মনে কবে কী বার
কবে হবে বাজনা নাচ ও আলো!

মিষ্টি মণ্ডা লুচি পোলাও দিন পনেরো চলবে ঢালাও
থিয়েটার ও বায়স্কোপের ধূম
চারিদিকে লোক থৈ-থৈ-থৈ হৈ-হৈ-হৈ-রৈ-রৈ-রৈ—
চক্ষে কারো থাকবেনাকো ঘুম ;

কাকিমাগো তুমি এলে বই খাতা ও শেলেট ফেলে
শুনবো বসে গল্প হাসি গান,
থাকবো তোমার কাছে কাছে বই পড়ার ঢের সময় আছে
সামনে ছুটি—সামার ভেকেসান!

কাকামণি ক্ষণে-ক্ষণে আর এক কথা হচ্চে মনে
তোমার মতন পোড়বো যখন 'বি-এ'
আমিও কি তোমার মতন টুক-টুকে বউ আনবো তখন
মোটর চড়ে টোপর মাথায় দিয়ে?

(মৌচাক)

আমাদের ইস্‌কুল

আমাদের ইস্‌কুল দিক্‌ভুল গ্রাম,
একতলা পাকা বাড়ি মোটা মোটা থাম ;
সামনেই খেলবার ফুটবল মাঠ,
পিছনেতে সরু ঝিল সান-বাঁধা ঘাট ;
অসংখ্য মাছ তাতে করে থৈ থৈ,
কালবোস্‌, কই, পুঁটি, মউরলা, কৈ ;
এক পাশে ছোট ক্ষেত শাক-সব্জির,
কোদালে কোপালে জোর হয় কব্জির!
ইয়া-ইয়া লাউ জগা করে লক্‌-লক্‌,
কচি শশা দেখে জিভ করে সক্‌-সক্‌!
প্যারালাল বার পোঁতা আর এক দিক,
হয় সেথা কুস্তি ও জিম্‌ন্যাস্‌টিক্‌!

নড়্‌নড়ে পায়া ভাঙা বেঞ্চিগুলো,
তার পরে পুরু তিন ইঞ্চি ধুলো ;
টেবিল চেয়ার টুল নিলামে কেনা
মান্ধাতা কোন যুগে করিয়া দেনা!
—বারনিস্‌-চটা জরা-জীর্ণ অ্যাকে
ছেলেদের উৎপাতে আর না ট্যাকে!
ছুরি দে কেটেছে কেউ, ঢেলেছে কালি,
কেউ কোসে মাস্টারে পেড়েছে গালি ;
বোর্ড যেন কাটে আল্‌কাত্‌রা মাখা,
ধার ছেঁড়া মাদুরের ঝুলছে পাখা ;
খড়্‌খড়ি পাকি ভাঙা, বেকল ঘড়ি
কে কিনেছে দিয়ে তারে নগদ কড়ি!
তিন আলমারি ঠাসা লাইব্রেরি রুম,
কেরানিটা বসে সেথা কোসে মারে ঘুম ;
ম্যাপ খড়ি সুতো দড়ি দোয়াত কলম
ছুরি কাঁচি নিব পিন হাজারো রকম
আছে সেথা ; ছেলেরাও আছে হাত-সাফ,
তেরি-মেরি কেরানি সে রেগে দ্যায় লাফ্‌!
দোর খোলা পড়ে আছে আরেকটা ঘর,
মাদুর বিছানো তাতে তক্তার পর ;
অবসর কালে সেথা শিক্ষকগণ
বিশ্রাম হেতু দ্রুত করেন গমন :

তামুক টানেন কেহ, কেহ সিগারেট,
চা পান করেন কেহ মাথা করে হেঁট।

কালীকিঙ্কর সেন হেড্‌মাস্‌টার,
ছেলেদের বলে—পড় ; নিজে ফাঁকিদার ;
কথায় কথায় তাঁর কেবল ফাইন
আমরা স্বাধীন ছেলে মানিনা আইন ;
এম-এ, বি-টি কালো মোটা ট্যারা-ট্যারা চোখ,
কাঁচা-পাকা দাড়ি মুখে ভারি ছোট লোক!
ধূর্জটি পণ্ডিত যেন সদা শিব,
সাতে পাঁচে থাকেনা বড্ডো গরীব ;
গোঁফ-ঝোলা টাক-ওলো তিনকড়ি রায়,
গাঁট্টার খুব জোর অঙ্ক করায় ;
ইতিহাস-শিক্ষক নাম স্মরজিৎ
ধূর্তের শিরোমণি জাতিতে নাপিত!
আমাদের ইস্‌কুল বড় সুন্দর,
ভালোটারি বেশি ভাগ, কম মন্দর ;
এ জগতে কোথা পাবে সবটা নিখুঁত?
দ্যাখোনা কি কালো মেঘে খেলে বিদ্যুৎ?
হেথা থেকে কত ছেলে জলপানি পায়,
শীল্ড কাপ জিতে আনে ম্যাচ খেলে প্রায় ;
কী রকম ইউনিটি সব ছেলেদের,
চালাকি করেন যিনি পান তিনি টের!
টেষ্টে আটক রাখে এই বড় দোষ,
নইলে সে বারে পাশ হত সন্তোষ ;
প্রমোশনে কড়াকড়ি—প্রশ্ন কঠিন,
ছুটি কম—পড়া বেশি—বিশ্রী রুটিন্!

মোদের দলের চাঁই পালের গোদা,
ভারি সে তুখোড় ছেলে ফাজিল—ভোঁদা!
ফন্দী নানান তার মাথায় ঘোরে,
পারেনাকো কেউ তারে গায়ের জোরে,
মাস্‌টারে ভয় করে ছেলেরা মানে,
ভালো ভালো ছবি আঁকে, গানও জানে ;
এত ইন্‌টেলিজেন্ট করেনা পড়া,
নিয়ে আছে বল খেলা কুস্তি-লড়া!

কোশ্চেন লিক্ হয়ে গেলেই ফেঁসে,
হেড্ মাস্টার ধারে তারেই এসে ;
ভয় নাই ; বলে—স্যার, আমারি এ কাজ,
মারুন সাত ঘা বেত সপাসপ্ আজ!

(মৌচাক)

মরনিং ইস্কুল

ভোর রাতে গাঁর পথে আধো আলো আঁধারে,
পিরে রেখে গোলাবাড়ি মন্দির বাঁ-ধারে,
দলে-দলে ছুটে চলে হেসে-নেচে কাহারা?
ঘোষেদের ননি মণি দুটি ভাই মা-হারা ;
চারু মতি নেপা ভূতো চলেচেও সঙ্গে,
লাল নীল রকমারি সার্ট কোট অঙ্গে,
চোখে মুখে লাগে হাওয়া—ওড়ে কালো মিশ চুল,
মরনিং ইসকুল!

ননি মণি খালি পায়ে—পরে নাই বিনামা,
সম্প্রতি উহাদের মারা গেছে কিনা মা,
চাষা খুড়ো যায় ক্ষেতে হাতে নিয়ে কাস্তে,
"দ্যাখ্ দ্যাখ্ গদা পড়ে গেল ছুটে আসতে!"
"তাইতরে, তাইতোরে হো-হো-হো হুররে!"
সারা পাড়া জেগে ওঠে কী ভীষণ সুররে!
ভাঙে ডাল পাড়ে ফল লাফ মেরে ছেঁড়ে ফুল,
মরনিং ইস্কুল!

"ভাগ্যিস মা আমারে দিল ডেকে জাগিয়ে
ঘুমতুম নইলে তো ইস্কুল না গিয়ে!"
"তবে শোন্, দাদামণি ডেকে দিল আমাকে,
সারা রাত জেগে বুড়ো হুঁকো টিকে তামাকে!"
"আমি ভাই কেটে দিয়ে মশারির দড়িটা
হুকে গুঁজে রেখেছিনু ঘুম-ভাঙা ঘড়িটা!"
"জামা টেনে ছিড়ে দিলি রাসকেল ড্যাম্ ফুল!"
মরনিং ইস্কুল !

তুই ছোঁড়া গোদা-গোদা পা দুটোকে বাড়িয়ে
পিছে হতে কেন চটি দিলি মোর মাড়িয়ে?"
"মিছে কথা! কে দেখেছে? বার কর সাক্ষী,
ঘুসি মেরে থেঁতো করে দেবো তোরনাকো কি?"
"ঝগড়ায় কাজ নেই—ঝাঁপ তোলে ময়রা,
রাস্তায় মারামারি করে গুড় বয়রা?"
পাকলো না ঝগড়াটা—হাত করে চুলবুল,
মরনিং ইস্‌কুল !

"জেলে বউ যায় ঐ হাতে নিয়ে চুবড়ি,
ওরি ঘর জ্বলে যায় পড়ে উড়ো তুবড়ি,
পা চালিয়ে চলে চল পড়ে বুঝি ঘন্টা!"
"এখনও তো ঢের দেরি, কেন উৎকণ্ঠা?"
"এই যাঃ ভুলে গেছি অঙ্কের খাতাটা
গাঁট্টায় গাঁট্টায় থাকবে না মাথাটা
(স্যার ব্যাটা) বুঝবেনা ঘুমচোখে হোলো ভুল!"
মরনিং ইস্‌কুল !

"আমিও যে আনিনিকো কি কোরবো বলতো?"
"যা হবার হবে তাই ভেবে সেই ফল তো!
বল দেখি কোন সালে জন্মেছে বুদ্ধ?"
"তুই বল কবে হয় পলাশীর যুদ্ধ?"
"তুই বল কারে কয় ব-দ্বীপ, ডেল্টা?
কোন পথ দিয়ে ছোটে বোম্বাই মেলটা?"
এ কথা সে কথা নিয়ে মজলিস্ মসগুল
মরনিং ইস্‌কুল !

"বোস পাড়া গেল ম্যাচে খেলে গোল চারটে,"
"ছি-ছি-ছি-ছি হেরে গেল কী হারই না হারটে।"
"আমাদের হাফব্যাক তবুও সে শৈল
খোঁড়া পায়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইল!"
"থাম্ থাম্ ঐ দ্যাখ শিববাবু যাচ্ছে,
আমাদের পানে ফের ফিরে ফিরে চাচ্ছে!"
"দেখলে তো বয়ে গেল!—পথে মারা সেই রুল!"
মরনিং ইস্‌কুল !

"হ্যাঁরে ভোলা তুই নাকি সুইমিং রেসেতে
নাম দিয়ে হটে এলি ভয় পেয়ে শেষেতে?
ওরে ভাই শুনলুম ও পাড়ার রায়রা

এনেছে নতুন কিনে গেরোবাজ পায়রা,
কি করে হাতানো যায় বল দেখি ফন্দি?"
চুপি-চুপি কি বল্লে আশুতোষ নন্দী ;
দু দিন না যেতে যেতে জামা হল কালি ঝুল,
মরনিং ইস্‌কুল !

"ইস্‌কুল গেট্ যে রে খোলেনিক—বন্ধ,
চলেছিস কোথা তোরা হা মূর্খ অন্ধ!"
"আয় আয় প্রাচীরের অবরোধ লঙ্ঘি!"
জয়রাম বলে লাফ দিল কটি সঙ্গী।
"ঘড়িটার কাঁটা দুটো আয় দিই নড়িয়ে,"
"খরময় দোয়াতের কালী দিই ছড়িয়ে,"
"বেঞ্চিটা কাটি আয়—খোঁড়া করে দিই টুল!"
মরনিং ইস্‌কুল !

আসে হেড মাস্‌টার—বিভীষণ মূর্তি ;
উবে গেল ছেলেদের হাসি গান ফুর্তি,
ক্রমে-ক্রমে এল বাকি শিক্ষক ছাত্র,
কেরানিও দিল দেখা—নরহরি পাত্র,
ছটা যেই বাজে বাজে পড়ে গেল নজরে
উড়ে মালি ঘন্টায় ঘা লাগালে সজোরে,
কেউ খালি তোলে হাই—কারো আঁখি ঢুল্ ঢুল্!
মরনিং ইস্‌কুল !

(মৌচাক)

শ্রীকান্ত

কেনাকাটা খাটাখাটি পারিনাক নিত্য,
খুঁজে পেতে সস্তায় রাখিলাম ভৃত্য,
শ্রীকান্ত নাম তার—আকৃতিটি খর্ব,
জল-চল জাতি বলে মনে ছিল গর্ব,
কানে কিছু ছিল খাটো—শুধু সেই জন্যে
সস্তায় পাওয়া গেল ; লুফে নিত অন্যে
দুনো দরে তা না হলে—হৃষ্ট ও পুষ্ট
ছিল তার অবয়ব—অল্পেই তুষ্ট,
নাসিকা টিকোলো খুব দেহ মসীবর্ণ,

মাদুলি দুলিত গলে—পিতল কি স্বর্ণ
সহজে যেতনা চেনা ; এনামেল পাত্রে
দেড় সের চাল খেতো দিনে আর রাত্রে ;
যাই হোক পেয়ে তারে মহাখুশি গিন্নি,
হে ঠাকুর টিকে যেন—মানিলেন সিন্নি।
বিশেষতঃ লালিত সে অতিশয় যত্নে
গৃহিনীর আদরিনী কনিষ্ঠা কন্যে।
একদিন বল্লেন শ্রীকান্তে আন্‌তে
করমচা—কেউ যেন পারেনাকো জান্‌তে,
কারণ লোভটি তাঁর ছিল অতিরিক্ত
গরম চা দু-পেয়ালা এনে দিল ভৃত্য!
মার-মার করে ধান—সংহার-মূর্তি,
তামাকু টানিতেছিনু—উবে গেল ফূর্তি ;
তেড়ে গিয়ে কহিলাম করে গলা উচ্চ
"—লোভে পাপ, পাপ মরে এত অতি তুচ্ছ
ন্যায়রত্নের মেয়ে গৃহিনী সে যুক্তি
শুনে রন চুপচাপ না করিয়া উক্তি!
একদিন রবিবার—পড়িতেছে বৃষ্টি
ঝম্-ঝম্—থম্-থম্ করিতেছে সৃষ্টি,
বন্ধুরা মিলে সব মস্‌গুল গল্পে,
বৃষ্টিটা কিছুতেই ছাড়ছেনা অল্পে,
বল্লাম—"এক আনার সাঁচি পান আনতো!"
কাঁচি শান দিয়ে এনে দাড়ালো শ্রীকান্ত!
ভাবলুম বকি তারে হয়ে অতি ক্রুদ্ধ,
হাসি এসে কণ্ঠটি করে দিল রুদ্ধ!
একদিন জামাতার আগমনে ব্যস্ত
গৃহিণী হুকুম দিল—"মাছ এনো মস্ত"
"টাকা আন্" শীগ্‌গির কহিলাম ভৃত্যে,
পাখা টান্—শুনিল সে নহে ইহা মিথ্যে,
কারণ তমনি ব্যাটা টানা পাখা টান্‌তে
লেগে গেল হুস্-হুস্—জান্‌তে না জান্‌তে,
ভাগ্যিস্ ছিল সেথা রামা—তাই রক্ষে,
নচেৎ দিতেম রেগে পদাঘাত বক্ষে ;
প্রাণ নিয়ে বেঁচে গেল—জোর তার ভাগ্য,
বকি-ঝকি মারি-ধরি নেই তার রাগ গো!

জুতো মোর ছিলনাকো একজোড়া ভিন্ন,
পথে জল কাদা খেয়ে তাও জরাজীর্ণ,
বল্লুম—"ডেকে আন্ পরেশ চামার কে"
হাজির করিল ব্যাটা নরেশ কামার কে,
সংকোচে সম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া সামনে,
"কী হুকুম"—কহিল সে শ্রীহরির নাম নে,'
"গড়ে দিতে হবে কিছু? হবে কিছু সারতে"?
কহিলাম—"শ্রীকান্তে হবে চড় মারতে"!
শ্রীকান্ত ভ্যাবাচাকা—সেও হতভম্ব,
বুঝিতে আসল কথা হল না বিলম্ব ;
ঐরূপ একবার জলধর ঘোষকে
ডেকে দিতে ডেকে আনে হলধর বোসকে!
গৃহিনী যে অতি লোভী বলিয়াছি পূর্বে,
মনে-মনে খালি ভাঁজে কিসে পেট পুরবে।
একদা হুকুম দিল—আন্ মাছ ট্যাংরা,"
এনে দিল শ্রীকান্ত খান পাঁচ খ্যাংরা!
তাই দেখে গৃহিনী তো রেগে রাঙা অগ্নি,
গালি দিল তুলে তার বাপ ভাই ভগ্নী!
শ্রীকান্ত চেয়ে রয় ছল-ছল চক্ষে,
চক্‌চক্ করে তার মাদুলিটা বক্ষে!
খেতে সাধ একবার হল তাঁর চালতা
এনে দিল শ্রীকান্ত দু-পয়সা আলতা!
এইরূপে প্রত্যহ করে ভুল ভ্রান্তি,
জীবন অসহ হল গেল সুখ-শান্তি!
একদিন রেগে উঠে হাতে দিয়ে মাইনে
বল্লুম—"বেরো ব্যাটা, তোরে আমি চাইনে!
তাই শুনে ভেউ-ভেউ জুড়ে দিল কান্না,
তারি সাথে যোগ দিল ছোট মেয়ে পান্না!
অগত্যা হার মোরে মানতেই হইল,
যেমন ছিল সে আগে তেমনই রইল।

(মৌচাক)

পণ্ডিত মূর্খ

দুষ্টুর শিরোমণি ত্রিলোচন নন্দী
মাথায় খেলিত তার রকমারি ফন্দি,
টেরি কেটে এল ক্লাসে জানুয়ারি চৌঠো
হাতে তার চট্‌পটি বাজি চার কৌটো,
সে গুলো সে মেঝে ময় দিল সব ছড়িয়ে
বেঞ্চি চেয়ার টুল চারিদিকে নড়িয়ে,
হেন কালে পণ্ডিত আসিলেন যেমনি
চটি পয়ে ফটাফট্, ফটাফট্ অমনি
বাজিগুলো ফেটে করে চারিধারে নৃত্য!
পণ্ডিত একেবারে রেগে খুন—ক্ষিপ্ত!

হেড্-মাস্‌টার বাবু অগ্নির মূর্তি
শুনে এই সংবাদ ; ছেলেদের ফুর্তি
উবে গেল ধোঁয়া হয়ে, কম্পিত বক্ষে
কহে সবে আজ আর নেই কারো রক্ষে!
ত্রিলোচন জনে-জনে সাধাসাধি কল্লে
"করিসনি মোর নাম"—ডেকে-ডেকে বল্লে।

হেড্-মাস্‌টার রোষ-কষায়িত নেত্র
হলেন হাজির ক্লাসে কর-ধৃত বেত্র,
"এখুনি কবুল করো কার এই কর্ম,
নচেৎ বেতের ঘায়ে ছিঁড়ে দেবো চর্ম।"
সক্কলে চুপ করে রহে নিস্তব্ধ,
আলপিন পতনেরো শোনা যায় শব্দ।
অবশেষে ডাকলেন ক্লাসে ফাষ্টবয়কে—
টুইনের-ছেঁড়া-সাট-পরা রামজয়কে ;
"কে করেছে তুমি জানো?—কহ ঠিক সত্য,
দেবো তারে সমুচিত ঔষধ পথ্য,
গরিবের ছেলে তুমি—পড়ো আধা মাইনে,
বুঝে-সুঝে কয়ো কথা—ঝুটো কথা চাইনে।"
"জানি স্যার"—কহে রাম দৃঢ় স্বরে জোরসে,
(ত্রিলোচন চারিদিকে দ্যাখে ফুল সর্ষে)
"বলে ফ্যালো নাম তার—নাই কোনো শঙ্কা,
বিদ্যার মন্দিরে সত্যের ডঙ্কা

বাজাও ঘা মেরে জোরে—গুড্ বয় এইতো!"
রামজয় কয়—"স্যার, অত জ্ঞান নেইতো।
বিশ্বাস-ঘাতকতা করিবার শিক্ষা
পাই নাই অবকাশ—চাই ক্ষমা ভিক্ষা;
নাম তার কোরবোনা—যাই থাক ভাগ্যে,
কাটা যাবে হাফ্‌ফিটো? যায় যদি যাক্‌গে:
আমাদেরি বন্ধু যে করেছে এ কর্ম,
তারে সঁপে দেবো মোরা— এ কেমন ধর্ম?
দীন আমি পরে আছি দরিদ্র সজ্জা,
বিশ্বাস-ঘাতকের কলঙ্ক লজ্জা,
ইহা হতে ঢের কালো, মাখবোনা অঙ্গে,
ধৃষ্টতা মার্জনা মাগি এই সঙ্গে।"

রেগে হেড্-মাস্টার আরক্ত গন্ড
বলেন—তোমারে দেবো আদর্শ দন্ড,
জরিমানা পাঁচটাকা আর পুরো মাইনে
এবং ঘা কত বেত,—বেশি আর চাইনে।
শুনে বাগ্‌দেবী মনে করিলেন দুঃখ—
লিখে পড়ে লোকে হয় এত বড় মূর্খ!

(মৌচাক)

শরতে

কে এলোরে, কে এলোরে, সোনার বরনে,
ছড়িয়ে উজল নয়ন আলো সূর্য কিরণে!
ওরে বাদল থেমেছে,
দ্যাখ্ শরৎ নেমেছে
রাঙা-রাঙা পলাশ ফুলের আলতা চরণে,
কে এলোরে, কে এলোরে, সোনার বরনে!

শিউলি-ফুলে গাঁথবো মালা আমরা বিজনে,
দীঘির জলে ভাসিয়ে ভেলা ভাসবো ক-জনে!
ওড়ে ভ্রমর-ভ্রমরী,
আয় বাজাই বাঁশরি,

উড়ছে কার ঐ জরীর আঁচল সুনীল গগনে,
কে এলোরে. কে এলোরে, সোনার বরনে!

লুট্‌বো মধু ছুট্‌বো মোরা কুসুম-চয়নে,
টুট্‌বো বাঁধন মানবোনাকো শাসন বারণে,
সেজে ইন্দ্রধনুতে
মেখে পুষ্পরেণুতে
এক চোখে জল, ফুটিয়ে হাসি আর কে নয়নে,
কে এলোরে, কে এলোরে, সোনার বরনে!

আজ জেনো জেগেই দেখবা স্বপন অলস-নয়নে,
আগমনীর বাঁশি বাজে মাতায় পবনে।
চাঁদে কিরণ উছলে,
নিখিল ভুবন উজলে,
আয় উড়ে যাই মেঘের মতন মুক্ত গগনে,
এলো শরৎ, সোনার শরৎ, সোনার বরনে!

(রং মশাল)

কালোবাবুর পড়া

সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে এল ঢং-ঢং-ঢং বাজল ছটা,
ঘরে ঘরে উঠলো জ্বলে আলো ;
নিয়ে কেতাব বগল দাবায় অতি শান্ত শিষ্টভাবে
পড়ার ঘরে পড়তে এলো কালো!
ভাবলেন বাবা ছেলে আমার জলপানিটা পাবেই পাবে,
কেউ হারাতে পারবেনাকো তারে ;
আর বছরে টেষ্টে আটক রাখলে বোকা মাস্টারেরা,
এই বছরে দেখি কেমন পারে!
খেলায় মত্ত ছেলেরা সব করতেছিল দাপাদাপি,
কাটতেছিল রকম-রকম ছড়া ;
মা বললেন—চুপ্-চুপ্-চুপ্ করিসনে গোল দোরের কাছে,
পড়ছে কালো একটা-পাশের পড়া!
ঠিক সে সময় কালোবাবু নাকে কিঞ্চিৎ নস্য টিপে
লংম্যানের এক জিয়গ্রাফি হাতে—
উস্কে আলো এলিয়ে দিল মোলাম ভাবে দেহখানা
ক্যাম্বিসের এক আরাম-কেদারাতে!

এ বইখানা সে বইখানা এমনি করে ঘণ্টাখানেক
ক্লান্ত হয়ে পড়লো অবশেষে,
তুড়ি মেরে তুল্লে সে হাই উপরি-উপরি গোটা তিনেক,
আলোটাকে কমিয়ে দিয়ে এসে!
যেই বসেছে অমনি তাহার চোখের উপর খেলে গেল
হু-হু করে বায়স্কোপের মতো,
নানান প্রকার রঙিন চিত্র দেখেনি যা জন্মে কভু,
হিসেব তাহার দেব আজি কত!
প্রথম দৃশ্য বড়ই করুণ—স্বয়ং প্রধান-শিক্ষক মশায়
বেঞ্চি পরে আসীন হাঁটু গাড়ি,
কাতর দৃষ্টি অধোমুখে টস্-টস্-টস্ অশ্রুবিন্দু
পড়েছে বেয়ে লম্বা কালো দাড়ি!
চেয়ারটি তার দখল ক'রে করে কালো উপবেশন,
চরণ দুটি টেবিল পরে থুয়ে ;
বলছে—বুঝুন মাস্টার মশাই নিলডাউনে কত মধু,
কাঠে তবু, নয়কো নেহাত ভুঁয়ে!
হঠাৎ ছবি বদলে গেল প্রকাশ হলো অন্য মূর্তি,
—মস্ত ভুঁড়ি মাথায় গাধার টুপি,
আহা গণিত শিক্ষকেরে কে করেছে এ দুর্দশা!
ছেলেরা সব কইছে চুপি-চুপি!
এবার এল নতুন দৃশ্য—দলবদ্ধ ছাত্রেরা সব
তিনহাত গভীর একটা কবর খুঁড়ে,
ইতিহাস ও বীজগণিত বই নিপুন হস্তে নিঠুর ভাবে
তাহার মধ্যে দিচ্ছে ফেলে ছুঁড়ে!
তার উপরে চাপিয়ে রাবিশ ষণ্ডা ষণ্ডা দুজন ছেলে
দিচ্ছে পুঁতে কাঁটা গাছের চারা,
পাল্টাতে চোখ দেখা গেল হাজার-হাজার পাটীগণিত,
লাগিয়ে আগুন দেখছে বাজী কারা!
দশমিকের অঙ্কগুলো ছুটছে দ্রুত আকাশ পথে,
পড়ছে ফেটে যেন তারা বাজী ;
বর্গমূলের খোঁচাগুলো তাই দেখেনা চোঁ-চোঁ দৌড়,
সবাই বলে—দূর হয়ে যা পাজি!
চোখের সামনে বিলেত দেশটা দেখ্‌তে-দেখ্‌তে তলিয়ে গেল
অপার অগাধ নীল-সাগরের জলে,
বাংলা দেশে স্বরাজীরা মহোল্লাসে করছে নৃত্য,
বাজিয়ে ভেঁপু চলছে দলে-দলে

আমেরিকার অ্যালাস্কা দেশ চলে এলো কী কৌশলে
একেবারে হিমালয়ের শিরে ;
চিনেরা সব কাটলো টিকি, কিনলো আফিম্ এক হাজার টন,
বাঁধলো বাসা ড্যানুব নদীর তীরে!
এমন সময় দোরের কড়া কড়্-কড়া-কড়্ উঠলো নড়ে,
মা ডেকে কন—ভাত খাবি আয় ওরে ;
চম্‌কে উঠে কালো ভাবে একি মজার ভোজবাজিটা
দেখছিল সে ঘন্টা তিনেক ধরে!

(মৌচাক)

পুজোর ফরমাস

চাইনা পুজোর জরির পোষাক—চাই না এবার আলপাকা,
নক্সা-কাটা রেশমি রুমাল বিলাসিতার রং মাখা;—
মোটা জামা মোটা কাপড়—তাই আমারে দিস্ কিনে,
তাঁতের বোনা হাতের সূতো—দাম যে মা তার লাখ্ টাকা।

কাজ কি বাজে বাবুয়ানি, খদ্দর তো ভদ্র বেশ ;
মহাত্মাজির ঐ তো বাণী,—পি, সি, রায়ের ঐ আদেশ।
তাঁদের কথা কোন্ মুখে মা ফেলব ঠেলে ফেলব আজ?
বিদেশী চিজ্ কিনবোনাকো, নেই কি আমার লজ্জা লেশ?

জননী আর জন্মভূমি স্বর্গ হতে শ্রেষ্ঠ ঢের ;
একটি ফোঁটা রক্ত আমার থাকবে যদিন এই দেহের—
ঐ কথাটি বুকে লেখা থাকবে সোনার অক্ষরে ;
তোমাদেরি কোলে আমার জন্ম যেন হয় মা ফের!

তোমার হাতের শাক-ভাতে-ভাত লাগে কি মা তার কাছে
পোলাও কোর্মা কোপ্তা কাবাব? হোটেলে তো ঢের আছে।
স্বদেশ-জাত সকল জিনিস তেম্‌নি লাগে মিষ্টি গো—
পাত্‌লা, পুরু, সস্তা, দামী,—দোষ-গুণ তার কে বাছে?

আর এক কথা বলতে তোমায় ভুল করেছি—মস্ত ভুল,
ঐখানেতে খেলতে আসে হাতে চাঁপা টগর ফুল,
মতি চারু দুটি ভাই-এ, বড়ই গরীব মা-হারা,—
দেখ্‌লে মায়া হয় মা তাদের মলিন মুখ আর রুক্ষ চুল।

আমারে যা দিবি কিনে তাদেরো তাই দিস্ কিনে,
মোটা জামা মোটা কাপড়—চাইনা মিছিন্ ফিন্‌ফিনে,
যত্ন আদর করবে তাদের—মুখের পানে চাইবে কে?
সংসারে কেউ নেইক তাদের বিধবা এক বোন বিনে।

দেশ ছেয়ে মা এমনিতর অনাথ ছেলে মেয়ের দল
দুখের বোঝা বইছে বুকে ফেলছে কত চোখের জল—
তাদের অশ্রু কে মুছাবে? দুঃখ তাদের বুঝবে কে?
পাইনা ভেবে কূল-কিনারা—হৃদয় শুধু হয় বিকল।

আয় দুজনে আয় করি আয় মা দুর্গারে প্রার্থনা,
দাও ঢেলে দাও ওদের প্রাণে শান্তি এবং সান্ত্বনা ;
ফুট্‌লে হাসি এদের মুখে টুট্‌বে আঁধার জগৎময়—
নই যে মোদের ব্যর্থ পূজা, কি বলিস্ মা? ব্যর্থ না?

(মৌচাক)

সামার ভেকেশান

ওরে গ্রীষ্মের ছুটি, পড়ি তোর পায় দুটি,
আয় আয় ছুটে চলে আয়!
ইস্‌কুলে প্রতিদিন আনাগোনা কী কঠিন,
সেই জানে ঠেকেছে যে দায়!
দখিনে বাতাস তুলে আয় সেজে ফলে ফুলে,
ওরে চির প্রিয়সখা তুই,
আয় আম-বন দিয়ে, জাম জামরুল নিয়ে,
হাতে করে বেল চাঁপা জুঁই!
সবুর সহেনা আর, ইস্‌কুল কারাগার,
জেলখানা সম মনে হয়,
রাস্তায় ওড়ে ধুলো, গাছে কাঁচা আমগুলো
উঁকি মেরে ইসারাতে কয়—
ওরে বোকা গাধা ছেলে, দে খাতা শেলেট ফেলে,
নিয়ে আয় ছুরি আর নুন!
কেটে খায় বাজে লোকে কি করে দেখিস চোখে?
যদি কর কচিহাতে খুন!

নিষ্ঠুর বাবা দাদা বলে—খেয়ে ছোলা আদা
রাতদিন পড় আর পড় ;
নাহি গেলে ইস্কুলে মারে চটি জুতো খুলে,
তার উপরে ফাউ কিল চড়!
বোঝেনাকো এ সময় পড়াশুনো মোটে নয়,
শুধু ডাব ঠান্ডা বরফ ;
তেতে ওঠে ঘর দ্বার, করে দ্যায় একাকার
জ্যামিতির রেখা ও হরফ!
যত কাঁদি যত সাধি "মে মাসের আধা-আধি
তার আগে হতে পারেনাকো,"—
বলে হেড্-মাস্টার পাকাদাড়ি নেড়ে তার,
বেশ বাবা সুখে বেঁচে থাকো!
প্রাণ করে আই ঢাই, পথ খুঁজে নাহি পাই,
ঘর পর সবাই সমান!
ওরে গ্রীষ্মের ছুটি, ত্বরা করে আয় ছুটি,
আশায় রেখেছি শুধু প্রাণ।

লেখাপড়া করে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই,
ছড়া গেয়ে ভোলাও শিশুকে,
মোরা জানি এম-এ, বি-এ ভাত খায় কি-কি দিয়ে,
পি-আর-এস রয়েছে কি সুখে!
তবে কেন তেড়ে মিছে লাগো আমাদের পিছে,
ছেড়ে দাও খেলে মোরা বাঁচি ;
ছেড়ে দাও গান করি, ছিপ দিয়ে মাছ ধরি,
খাই পান দিশি মিঠে সাঁচি!
সুস্থ সবল দেহ লাখো গুণে হয় শ্রেয়
লেখাপড়া যতো যাই বলো,
নিশীথে প্রদীপ জ্বালি হাড় মাস করে কালি
মিছামিছি নেই কোনো ফল ও!
পাজি জ্যাঠা ব্যাটা বলে দেবে দুই কান মলে
বাবা যদি এই সব শোনে.
মুখ বুঁজে রই তাই, যা বলে তা শুনে যাই,
মনে যা তা রয় মনে-মনে!

দারভাঙা মালদহে চল জল মন কহে
আম লুচি সেখানে প্রচুর,
না লাগিত রেল ভাড়া, বাবা নাহি দিত তাড়া,
দিত যদি ছাড়া বেকসুর!

এত সুখ এ কপালে লেখেনিকো কোনো কালে
নইলে কি বিধি হয় বাম!
নইলে কি এ সময় আটকানো কেউ রয়
দর-দর গায়ে ঝরে ঘাম!
তরমুজ তালশাঁস থাকেনাক বারোমাস,
পড়া সে তো বারোমাসই আছে,
জামরুল আনারস নয় মানুষের বশ,
বললেই ফলেনাকো গাছে!
এ কথা বোঝে না যারা অতি বড়ো হাঁদা তারা,
কথা তারা কয় কোন মুখে!
ওরে গ্রীষ্মের ছুটি, তাড়াতাড়ি আয় ছুটি,
চেয়ে দ্যাখ্ রয়েছি কি দুখে!

(মৌচাক)

চক্ চকে এক রংমশাল

আগুন নিয়ে কোরবো খেলা—ছুঁড়বো হাউই তুবড়ি মা,
কোরবো তয়ের ফুলঝুরি আর রংমশাল এক চুবড়ি মা,
রঙিন আলোর ফুলের মালা উড়িয়ে দিকে দশ দিকে—
কালো রাতের অন্তরেতে জাগিয়ে দেবো পূর্ণিমা!

পুড়বে আঙুল হাত পা কাপড়—ভয় দেখানো শুনছে কে?
প্রতিপদেই বিপদ আছে, হিসেব তাহার গুনছে কে?
খাতায় লেখাই থাকবে কেবল রঙ-বেরঙের ফরমুলা?
ঠাসবো বারুদ খোল-চুঙিতে মিলিয়ে ওজন তাই দেখে!

লাল আলোতে রাঙিয়ে আমি তুলবো তোমার মুখখানি,
দুর্গা ঠাকুর লজ্জা পাবে দেখলে তোমায় হারমানি,
করবো তোমায় এমনি করে আরতি ও অর্চনা
তুমিই যে গো দেবী আমার ঠিক জানি গো ঠিক জানি!

ফুলঝুরি নে ফুলের রাশি দেবো তোমায় অঞ্জলি,
মাপ্ কোরো মা আজ তোমারে যাই করি আর যাই বলি,
লাগ্‌বে না আঁচ একটু গায়ে, ভয় পেওনা একটুও,
দেখ্‌বে তখন খোকা তোমার কেমন তর কৌশলী!

তুবড়ি বাজি ছুঁড়বো যখন সাহস করে বুক ঠুকে
আগুন ফুলের সেই ফোয়ারায় দাঁড়িয়ে হেকো সম্মুখে,
ঝরবে বকুল শিউলি যূথী, করবে তোমায় বন্দনা,
পড়বে লুটে তোমার রাঙা চরণ তলে টুক্-টুকে!

ছুট্‌বে হাউই গগন-পথে আসবে তারার গা ছুঁয়ে,
দেখিস চেয়ে ছাইবে আকাশ কী ঝকমকে বেল জুঁই-এ!
কুড়িয়ে নিয়ে পরীর মেয়ে জরির সুতোর হার গাঁথি
পরবে খোঁপায়, স্বপ্নে তাদের গান শুনেছি কান থুয়ে!

মা শুনে কন্—"থামরে খোকা, ঢের হয়েছে বক্তৃতা,
নেই অজানা আমার পরে তোর কেমন যে ভক্তি তা!
আগুন খেলা থাকুক তোলা, নতুন তর এক বাজি
দেবো তোরে তার বদলে, নাচবি পেয়ে তাথেই তা!

এই নে খোকা দিলেম তোরে চক্-চকে এক রংমশাল,
রঙের বারুদ ঠাসলে যাতে বাজিকর শ্রীমোহনলাল,
এর আলোতে তরুণ প্রাণে ছুটবে 'সোনার ঝরনা' রে"
কইল হেসে খোকা—"মাগো, তোর হুকুমই থাক বাহাল!"

(রংমশাল)

সে

বাইরে থেকে দেখলে তারে নয় সে তেমন সুন্দরী
যেমনতর অন্য সকল মেয়ে,
প্যাড়লো ধরা প্রথম চোখে মাধুরী তার, আ-মরি,
হাসলে যখন আমার পানে চেয়ে!
দেখতে পেলুম চোখ দুটি তারা উজল এবং কালো,
প্রেমের উৎস, আলোর ঝর্না, উপচে পড়ে আলো,
কিন্তু এখন নেই অনুরাগ—বিরাগ ভরা দুই চোখে,
আমারে আর দেয়না সাড়া কভু ;
আঁখিতে তার প্রেমের আলো তেমনিতর ঝক্‌মকে
আজও আমি দেখতে যে পাই তবু ;
তাহার চোখের ভ্রূকুটিও অনেক গুণে শ্রেয়
অন্য মেয়ের রাঙা ঠোঁটে রাঙা হাসির চেয়েও।

(ভারতী)
(হার্টলি কোলরিজ)

গোপাল ও রাখাল

গোপাল বড় সুবোধ বালক পড়াশুনোয় মন ;
রাখাল খালি খেলিয়ে বেড়ায় পায়না প্রোমোসন্!
গোপাল ভাল ছেলে বলে পাড়ায় ছিল যশ,
যেমন শান্ত তেমনি শিষ্ট বয়েস সবে দশ,
মিথ্যে কথা জানতো না সে, সত্যি কথা কই
কইতো না সে, হারাতো না সেলেট-খাতা-বই
ঝগড়া-ঝাঁটি কারুর সাথে কোরতো না সে মোটে,
বাবুগিরি ছিল না তার ছেঁড়া ছিটের কোট
পরেই যেত ইস্কুলে সে, বোলতো সবাই বেশ্,
জলপানি সে পাবেই পাবে সন্দেহ নেই লেশ।
অন্য সকল ছেলের মতো মন ছিল না তার,
জীবনে সে দেখেনিকো যাত্রা থিয়েটার,
বাপের মায়েব ভারি বাধ্য মাষ্টারেরো প্রিয়,
বোলতো সবাই, গোপাল মানুষ হবে দেখে নিও।

দশ বছরের পরের কথা, চশমা চোখে হায়,
কুব্জ-পৃজ্জ নুবু-দেহ ঐ কে চলে যায়!
গদ্দরের এক চাদর গায়ে বগলে তার বই!
রাখাল ভাবে চেনা-চেনা মুখ-খানা কে ঐ!
পোড়লো মনে গাঁয়ের কথা বুক খানা তাঁর ছাঁৎ
উঠলো করে, দৌড়ে গিয়ে ধরলে দুটি হাত ;
বল্লে গোপাল, দেখিনিকো তোমায় কতকাল,
চিনতে পারা যায় না মোটে এমন তোমার হাল
কে করেছে? বদলে গেছে চেহারা ও রং ;
কলেজ ঘড়ি উঠল বেজে ঢং-ঢং-ঢং-ঢং!

গোপাল বলে, রাখাল নাকি? অনেক দিনের পর
হল দেখা কেমন আছ? বল কি খবর?
আমার কথা শুনবে কি আর? করুণ ইতিহাস,
আর বছরে পাস করেছি এম্ এ ফাষ্ট কেলাস,
শরীর খানি গেছে ভেঙে এই হয়েছে ফল,
গোলদিঘিতে বানিয়েছে ঐ মানুষ মারার কল ;
দিনের বেলা হয না খিদে, হয় না রাতে ঘুম,
শরীর সবার বড় যদি আগে তা বুঝতুম!

এই জীবনে করিনিকো খেলা দৌড়-ঝাঁপ.
কাটিয়েছি কাল কেতাব নিয়ে ঢের কবেছি পাপ,
সুদ শুদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত হচ্চে আদায় তার,
ভাল ছেলে বলে মনে নেই আর অহঙ্কার।

একটি বছর চাকরি খুঁজে জান হলো হয়রান,
উমেদারি ঢের করেছি প্রচুর তৈল দান
সাধ্য মতো ঢের করেছি এঁর ওঁর তাঁর পায়,
যদি কোথাও মাইনে-মোটা চাকরি পাওয়া যায়!
মন্দ ছেলে বলে গাঁয়ে ছিল তোমার নাম,
ছেলে বেলায় বুঝিনিকো দুষ্টুমির কী দাম,
এখন তুমি কোচ্চো কি কাজ? রয়েছে কোন খান?
এখনো কি তেমনি আছ নিয়ে বাজনা গান?
রাখাল বলে আমি এখন মিলের কন্ট্রাক্টার,
চলো চলো আমার বাড়ি দাঁড়িয়ে মোটর-কার।

(মৌচাক)

কবিতা-নাম ও প্রথম পংক্তির সূচি

নতুন-খাতা। ১৫ অগ্রান ১৩৩০ (১৯২৩)

সংযোজন :

নতুন-খাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। (১৯৪০)

সংযোজন :

নতুন-খাতা। তৃতীয় সংস্করণ। (১৯৫৩)

অগ্রন্থিত-কবিতা